একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শীতের সূর্য্য অপরাহ্ন-বেলায় ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, এবং তাহারই ঈষত্তপ্ত কিরণে শোণনদের পার্শ্ববর্ত্তী সুদূর বিস্তীর্ণ বালু-মরু ধূ ধূ করিতেছিল। এমনি সময়ে একটা বাঙলোবাটীর বারান্দায় রেলিং ধরিয়া অচলা সেই দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার নিজের জীবনের সঙ্গে ওই দগ্ধ মরুখণ্ডের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল কি না, সে অন্য কথা, কিন্তু ঐ দুটি অপলক চক্ষুর প্রতি পলকমাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইতে পারিত যে, তেমন করিয়া চাহিয়া থাকিলে দেখা কিছুই যায় না, কেবল সমস্ত সংসার একটা বিচিত্র ও বিরাট ছায়া-বাজীর মত প্রতীয়মান হয়।

দিদি?

অচলা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। যে মেয়েটি এক দিন 'রাক্ষসী' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া আরা ষ্টেশনে নামিয়া গিয়াছিল, এ সেই।

অতীত এবং কন্যা হইয়া যে দুর্ভাগিনী এই শাস্তির বোঝা তাহার রুগ্ন বৃদ্ধ পিতার অশক্ত শিরে তুলিয়া দিল, তাহাকে যে তিনি কি বলিয়া অভিশাপ দিবেন, তাহাও তাঁহার চিন্তার অতীত।

সারারাত্রির মধ্যে তিনি একবার চোখে-পাতায় করিতে পারিলেন না এবং ভোর নাগাদ তাঁহার অম্বলের ব্যথাটা আবার দেখা দিল; কিন্তু আজ যখন নিজের বলিয়া মুখ চাহিতে দুনিয়ায় আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন নির্জ্জীবের মত শয্যাশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকিতেও তাঁহার ঘৃণা বোধ হইল। এত বড় বেদনাকেও আজ তিনি শান্তমুখে লুকাইয়া অন্যদিনের মত বাহিরে আসিলেন এবং রেলওয়ে ষ্টেশনের জন্য গাড়ী ডাকিতে পাঠাইয়া তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় গুছাইয়া লইতে বেহারাকে আদেশ করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শীতের সূর্য্য অপরহ্ণ-বেলায় ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, এবং তাহারই ঈষত্তপ্ত কিরণে শোণনদের পার্শ্ববর্ত্তী সুদূর বিস্তীর্ণ বালু-মরু ধূ ধূ করিতেছিল। এমনি সময়ে একটা বাঙলোবাটীর বারান্দায় রেলিঙ ধরিয়া অচলা সেই দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার নিজের জীবনের সঙ্গে ওই দগ্ধ মরুখণ্ডের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল কি না, সে অন্য কথা, কিন্তু ঐ দুটি অপলক চক্ষুর প্রতি পলকমাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইতে পারিত যে, তেমন করিয়া চাহিয়া থাকিলে দেখা কিছুই যায় না, কেবল সমস্ত সংসার একটা বিচিত্র ও বিরাট ছায়া-বাজীর মত প্রতীয়মান হয়।

দিদি?

অচলা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। যে মেয়েটি এক দিন 'রাক্ষসী' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া আরা ষ্টেশনে নামিয়া গিয়াছিল, এ সেই।

কাছে আসিয়া অচলার উদ্‌ভ্রান্ত ও একান্ত শ্রীহীন মুখের প্রতি মুহূর্ত্ত-কাল দৃষ্টি রাখিয়া অভিমানের সুরে কহিল, আচ্ছা দিদি, সবাই দেখচে সুরেশবাবু ভাল হয়ে গেছেন, ডাক্তার বল্‌চেন, আর এক বিন্দু ভয় নেই, তবু যে দিবা-রাত্রি তোমার ভাবনা ঘোচে না, মুখে হাসি ফোটে না, এটা কি তোমার বাড়াবাড়ি নয়? আমাদেরও কর্ত্তারা আছেন, তাঁদের অসুখ-বিসুখেও আমরা ভেবে সারা হই, কিন্তু মাইরি বল্‌চি ভাই, তোমার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

অচলা মুখ ফিরাইয়া লইয়া শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল, কোন উত্তর দিল না।

মেয়েটি রাগ করিয়া বলিল, ইস্! ফোঁস ক'রে যে কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে বড়! বলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া যখন অচলার নিকট হইতে কোনপ্রকার জবাব পাইল না, তখন তাহার একখানি হাত নিজের মুঠার মধ্যে টানিয়া লইয়া অত্যন্ত করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সুরমাদিদি, সত্যি কথা ব'লো ভাই, আমাদের বাড়িতে তোমার এক দণ্ডও মন টিক্‌চে না, না? বোধ হয় খুব অসুবিধে আর কষ্ট হচ্ছে, সত্যি না?

অচলা নদীর দিকে যেমন চাহিয়া ছিল, তেমনি চাহিয়া রহিল; কিন্তু এবার উত্তর দিল, কহিল, তোমার শ্বশুর আমার যে উপকার করেছেন, সে কি এ জন্মে কখনো ভুল্‌তে পারবো ভাই!

মেয়েটি হাসিল; কহিল, ভোলবার জন্যই যেন তোমাকে আমি সাধাসাধি ক'রে বেড়াচ্চি! এবং পরক্ষণেই কৃত্রিম অনুযোগের কণ্ঠে বলিল, আর সেই জন্যেই বুঝি তখন বাবার অত ডাকাডাকিতেও সাড়া দিলে না? তুমি ভাবলে, বুড়ো যখন তখন—

অচলা একান্ত-বিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, না, এমন কখখনো হ'তে পারে না।

রাক্ষুসী জবাব দিল, পারে না বৈ কি! তবু যদি না আমি নিজে সাক্ষী থাকতুম! ঠাকুরঘর থেকে আমার কানে গেল, সুরমা? ও মা সুরমা?, এমন চার-পাঁচ বার শুনলুম, বাবা ডাকছেন তোমাকে। পূজোর সাজ কর্‌ছিলুম, এক পাশে ঠেলে রেখে ছুটে এসে দেখি, তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্চেন। সত্যি বল্‌ছি দিদি, তামাসা কর্‌ছি নে।

অচলাই শুধু মনে মনে বুঝিল, কেন বৃদ্ধের 'সুরমা' আহ্বান তাহার বিমনা-চিত্তের দ্বার খুঁজিয়া পায় নাই! তথাপি সে লজ্জার অনুতাপে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কহিল, বোধ হয় ভাই, ঘরের মধ্যে--'

রাক্ষুসী বলিল, কোথায় ঘরের মধ্যে। যাঁর জন্যে ঘর, তিনি যে তখন বাইরে বেড়াতে বেরিয়ে ছিলেন! উঠোন থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, ঠিক এমনি রেলিঙ ধ'রে দাঁড়িয়ে। বলিয়া একটু থামিয়া হাসি-মুখে বলিল, কিন্তু তুমি ত আর তোমাতে ছিলে না ভাই, যে, বুড়ো-সুড়োর ডাক শুনতে পাবে! যা ভাবছিলে, তা যদি বলি ত—

অচলা নীরবে পুনরায় নদীর পরপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, এই সকল ব্যঙ্গোক্তির উত্তর দিবার চেষ্টামাত্র করিল না। কিন্তু এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, রাক্ষুসীর নামের সহিত তাহার স্বভাবের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না; এবং নামও তাহার রাক্ষুসী নয়, বীণাপাণি। জন্মকালে মা মরিয়াছিল বলিয়া পিতামহী রাগ করিয়া এই অপবাদ দিয়াছিলেন, এবং প্রতিবেশী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর নিকট হইতে এ দুর্নাম সে গোপন রাখিতে পারে নাই।

অচলাকে অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া নির্ব্বাক হইতে দেখিয়া সে মনে মনে লজ্জা পাইল, অনুতপ্ত স্বরে বলিল, আচ্ছা, সুরমাদিদি, তোমাকে কি একটা ঠাট্টাও করবার যো নেই ভাই? আমি কি জানি নে, বাবাকে তুমি কত ভক্তি-শ্রদ্ধা কর? তাঁর কাছে ত আমরা সমস্ত শুনেচি। তিনি সকালে বেড়িয়ে আস্‌ছিলেন, আর তুমি এই অজানা জায়গায়

কাঁদতে কাঁদতে ডাক্তার খুঁজতে ছুটেছিলে। তার পরে তিনি তোমার সঙ্গে গিয়ে সরাই থেকে তোমার স্বামীকে বাড়ি নিয়ে এলেন। এ সবই ভগবানের কাজ দিদি, নইলে এ বাড়িতে যে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়বে, সে দিন গাড়ীতে এ কথা কে ভেবেছিল ? কিন্তু আমার প্রশ্নের ত জবাব হ'লো না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমাদের এখানে যে তোমার এক দণ্ডও ভাল লাগচে না, সে আমি টের পেয়েচি। কিন্তু কেন ? কি কষ্ট, কি অসুবিধে এখানে তোমাদের হচ্চে ভাই, তাই কেবল জানতে চাইচি ; বলিয়া পূর্ব্বের মত এবারও ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া হঠাৎ এই মেয়েটির মনে হইল, যে কোন কারণেই হোক, সে উত্তরের জন্য মিথ্যা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। তখন যাহাকে তাহার শ্বশুর সসম্মানে আশ্রয় দিয়াছেন এবং সে নিজে সুরমাদিদি বলিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহার মুখখানা জোর করিয়া টানিয়া ফিরাইবামাত্রই দেখিতে পাইল, তাহার দুই চক্ষের কোণ বহিয়া নিঃশব্দে অশ্রুর ধারা বহিয়া যাইতেছে ; বীণাপাণি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া শূন্য দৃষ্টি অন্যত্র সঞ্চারিত করিল।

পরদিন অপরাহ্ণ-বেলায় সদ্যপ্রাপ্ত একখানা মাসিকপত্র হইতে একটা ছোট গল্প বীণাপাণি অচলাকে পড়িয়া শুনাইতেছিল। একখানা বেতের চৌকির উপর অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া অচলা কতক বা শুনিতেছিল, কতক বা তাহার কানের মধ্যে একেবারে পৌঁছিতেছিল না, এমনি সময়ে বীণাপাণির শ্বশুর রামচরণ লাহিড়ী মহাশয় সিঁড়ি হইতে 'মা রাক্ষুসী' বলিয়া উপস্থিত হইলেন, উভয়েই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বীণাপাণি একখানা চৌকি টানিয়া বৃদ্ধের সন্নিকটে স্থাপিত করিয়া উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাবা ?

এই বৃদ্ধ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। তিনি ধীরে-সুস্থে আসন গ্রহণ করিয়া অচলার মুখের প্রতি সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,

একটা কথা আছে মা। ভট্‌চায্যিমশাই এইমাত্র এসেছিলেন, তিনি তোমাদের স্বামি-স্ত্রীর নামে সঙ্কল্প ক'রে নারায়ণকে তুলসী দিচ্ছিলেন, তা কাল শেষ হবে। তবে কাল তোমাকে মা, কষ্ট স্বীকার ক'রে একটু বেলা পর্য্যন্ত অভুক্ত থাক্‌তে হবে। তিনি আমাদের বাড়িতেই নারায়ণ এনে কাজ সমাপ্ত ক'রে যাবেন, আর কোথাও তোমাকে যেতে হবে না। কথা শুনিয়া অচলার সমস্ত মুখ একেবারে কালিবর্ণ হইয়া উঠিল। ম্লান আলোকে বৃদ্ধের তাহা নজরে পড়িল না, কিন্তু বীণাপাণির পড়িল। সে হিন্দুঘরের মেয়ে, জন্মকাল হইতে এই সংস্কারের মধ্যেই মানুষ হইয়াছে এবং পীড়িত স্বামীর কল্যাণে ইহা যে কত উৎসাহ ও আনন্দের ব্যাপার, তাহা সে সংস্কারের মতই বুঝে, কিন্তু অচলার মুখের চেহারার এই উৎকট পরিবর্ত্তনে তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তথাপি সপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবা, নারায়ণকে তুলসী দেওয়ালে ত তুমি সুরেশবাবুর জন্যে, তবে তিনি উপোস না ক'রে দিদিকে কর্‌তে হবে কেন?

বৃদ্ধ সহাস্যে কহিলেন, তিনি আর তোমার এই দিদিটি কি আলাদা মা? সুরেশবাবু ত তাঁর এ অবস্থায় উপবাস কর্‌তে পার্‌বেন না। তাই তোমার সুরমাদিদিকেই কর্‌তে হবে। শাস্ত্রে বিধি আছে মা, কোন চিন্তা নাই।

অচলা ইহারও প্রত্যুত্তরে যখন হাঁ-না কোন কথাই কহিল না, তখন তাহার এই নিরুদ্যম নীরবতা অকস্মাৎ এই শুভানুধ্যায়ী বৃদ্ধেরও যেন চোখে পড়িয়া গেল; তিনি সোজা অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, এতে কি তোমার কোন আপত্তি আছে সুরমা? বলিয়া একান্ত ও পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদের প্রত্যাশায় চাহিয়া রহিলেন।

অচলা সহসা ইহারও কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ

চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, তাঁকে বললে তিনিই করবেন বোধ হয়।

তাহার পরে সকলেই নীরব হইয়া রহিল। কথাটা যে কিরূপ বিসদৃশ, কত কটু ও নিষ্ঠুর শুনাইল, তাহা যে ব্যক্তি উচ্চারণ করিল, তাহার অপেক্ষা বোধ করি কেহই অধিক অনুভব করিল না, কিন্তু শুধু অন্তর্যামী ভিন্ন সে কথা আর কেহ জানিতে পারিল না।

বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, তবে তাই হবে, বলিয়া ধীরে ধীরে নিচে নামিয়া গেলেন। ভৃত্য আলো দিয়া গেল, কিন্তু দুজনেই সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মাসিকপত্রের সেই অতবড় উত্তেজক ও বলশালী গল্পের বাকিটুকু শেষ করিবার মত জোরও কাহারও মধ্যে রহিল না।

বাহিরে অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহাই ভেদ করিয়া পরপারের ধূসর সৈকতভূমি এক হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত এই দুটি ক্ষুব্ধ, মৌন, লজ্জিত নারীর চক্ষের উপর স্বপ্নের মত ভাসিতে লাগিল।

এই ভাবেও হয় ত আরও বহুক্ষণ কাটিতে পারিত, কিন্তু কি ভাবিয়া বীণাপাণি সহসা তাহার চৌকিটা অচলার পাশে টানিয়া আনিল এবং নিজের ডান হাতখানি সখীর কোলের উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া চুপি চুপি কহিল, ও-পারের ওই চরটার পানে চেয়ে চেয়ে আমার কি মনে হচ্ছিল জান দিদি? মনে হচ্ছিল যেন ঠিক তুমি। যেন অম্‌নি অন্ধকার দিয়ে ঘেরা একটুখানি—ও কি, এমন শিউরে উঠলে কেন ভাই?

অচলা মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক থাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, হঠাৎ কেমন যেন শীত ক'রে উঠল ভাই।

বীণাপাণি উঠিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে একখানা গরম কাপড় আনিয়া অচলার সর্ব্বাঙ্গ সযত্নে ঢাকিয়া দিয়া স্বস্থানে বসিল, কহিল,

একটা কথা তোমাকে ভারি জিজ্ঞেসা করতে ইচ্ছে হয় দিদি, কিন্তু কেমন যেন লজ্জা করে। যদি রাগ না কর ত—

অজানা আশঙ্কায় অচলার বুকের ভিতরটা দুলিতে লাগিল। পাছে বেশি কথা বলিতে গেলে গলা কাঁপিয়া যায়, এই ভয়ে সে শুধু কেবল একটা না বলিয়াই স্থির হইল।

বীণাপাণি আদর করিয়া তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়া বলিতে লাগিল, এখন যেন তুমি আমার দিদি, আমি তোমার ছোট বোন। কিন্তু সে দিন গাড়ীতে ত আমি তোমার কেউ ছিলাম না, তবে কেন নিজের পরিচয় আমার কাছ থেকে অমন ক'রে লুকোতে চেয়েছিলে? যিনি স্বামী, তাঁকে বল্‌লে কেউ নয়—বল্‌লে, পীড়িত স্বামী অন্য কামরায়, তাঁকে নিয়ে জব্বলপুরে যাচ্ছ, কিন্তু আমাকে ঠকাতে পার নি। আমি ঠিক চিনেছিলাম, উনি তোমার কে। আবার বল্‌লে, তোমরা ব্রাহ্ম, বলিয়া একবার সে একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, কিন্তু এখন দেখছি, তোমার কর্ত্তাটির পৈতের গোছা দেখলে, বিষ্ণুপুরের পাচক ঠাকুরের দল পর্য্যন্ত লজ্জা পেতে পারে। আচ্ছা ভাই, কেন এত মিথ্যা কথা বলেছিলে বল ত?

অচলা জোর করিয়া একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, যদি না বলি?

বীণাপাণি কহিল, তা হ'লে আমিই বল্‌ব। কিন্তু আগে বল, যদি ঠিক কথাটি বল্‌তে পারি, কি আমাকে দেবে?

অচলার বুকের মধ্যে রক্ত-চলাচল যেন বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইল। তাহার মুখের উপরে যে মৃত্যু-পাণ্ডুরতা ঘনাইয়া আসিল, বাতির ক্ষীণ আলোকে বীণাপাণির তাহা চোখে পড়িল কি না, বলা কঠিন, কিন্তু সে মুখ টিপিয়া আবার একটুখানি হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, কিছু দাও আর না দাও, যদি সত্যি কথাটি বল্‌তে পারি, আমাকে কি খাওয়াবে বল অচলাদিদি?

অচলার নিজের নামটা নিজের কানে জলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রবেশ করিল এবং পরক্ষণ হইতেই সে একপ্রকার অর্দ্ধচেতনে, অর্দ্ধ-অচেতনের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

বীণাপাণি কহিতে লাগিল, আমাদের দুই বোনের কিন্তু তত দোষ নেই ভাই, দোষ যত আমাদের কর্ত্তা দুটির। একজন জ্বরের ঘোরে তোমার সত্যি নামটি প্রকাশ ক'রে দিলেন, আর অপরটি তাই থেকে তোমার সত্যি পরিচয়টি ভেবে ভেবে বার ক'রে আনলেন।

অচলা প্রাণপণ বলে তাহার বিক্ষুব্ধ বক্ষকে সংযত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি পরিচয়টি কি শুনি?

বীণাপাণি বলিল, সত্যি হোক্ আর নেই হোক ভাই, বুদ্ধি যে তাঁর আছে, সে কিন্তু তোমাকে মানতেই হবে। তিনি একদিন রাত্রে হঠাৎ এসে বল্লেন, তোমার অচলাদিদির কাণ্ডটা কি জানো গো? তিনি ঘর থেকে পালিয়ে এসেছেন। আমি রাগ ক'রে বল্লুম, যাও, চালাকি কর্‌তে হবে না। এ কথা দিদির কানে গেলে ইহজন্মে আর তিনি তোমার মুখ দেখবেন না।

অচলা চেয়ারের হাতায় দুই মুঠা কঠিন করিয়া বসিয়া রহিল।

বীণাপাণি কহিতে লাগিল, তিনি বল্লেন, মুখ আমার তিনি দেখুন, আর নাই দেখুন, এ কথা যে সত্য, সে আমি দিব্যি ক'রে বল্‌তে পারি। জা-ননদের সঙ্গে ঝগড়া করেই হোক্, আর শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে বনিবনাও না হওয়াতেই হোক্, স্বামী নিয়ে তিনি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। সুরেশবাবুর ত ভাব-গতিক দেখে মনে হয়, তোমার দিদি তাঁকে সমুদ্রে ডুবতে হুকুম করলেও তাঁর না বলার শক্তি নাই। তার পরে যেখানে হোক্ একটা ছদ্মনামে অজ্ঞাতবাসে দুটিতে থাক্‌বেন, যতদিন না বুড়ো-বুড়ী পৃথিবী খুঁজে সেধে-কেঁদে তাঁদের বৌ-বেটাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এই যদি না আসল ঘটনা হয় ত তুমি আমাকে—

আমি বল্‌লুম, আচ্ছা, তাই যেন হ'লো, কিন্তু গাড়ীতে আমার মত একটা অপরিচিত মুখ্যু মেয়েমানুষের কাছে মিথ্যে বল্‌বার দিদির কি এমন গরজ হয়েছিল? কর্ত্তা তাতে হেসে জবাব দিলেন, তোমার দিদিটি যদি তোমার মত বুদ্ধিমতী হতেন, তা হ'লে হয় ত কোন গরজই হ'ত না। কিন্তু তা তিনি মোটেই নয়। যাই শুন্‌লেন, তোমার বাড়ি ডিহরীতে, তুমি দুদিন পরে ডিহরীতেই যাবে, তখনই তিনি অচলার বদলে সুরমা, ডিহরীর বদলে জব্বলপুর-যাত্রী এবং হিন্দুর বদলে ব্রাহ্ম-মহিলা হয়ে উঠলেন। এটা তোমার মাথায় ঢুক্‌ল না রাক্কুসী, যাঁরা টিকিট কিনে জব্বলপুর যাত্রা ক'রে বেরিয়েছেন, তাঁরা হঠাৎ গাড়ী বদল ক'রে এদিকেই বা ফির্‌বেন কেন, আর পীড়িত স্বামী নিয়ে কোন বাঙালীর বাড়িতে না উঠে ওই অতদূরে হিন্দুস্থানীপল্লীতে, একটা ভাঙা সরাইয়ের মধ্যে গিয়েই বা হাজির হবেন কেন? বলিতে বলিতেই বীণাপাণি অকস্মাৎ পার্শ্বে হেলিয়া অচলার গলা জড়াইয়া ধরিল এবং স্নেহে প্রেমে বিগলিত হইয়া তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, বল না দিদি, কি হয়েছিল। আমি কোন দিন কাউকে কোন কথা বল্‌ব না—এই তোমাকে ছুঁয়ে আজ আমি দিব্যি কর্‌চি।

বীণাপাণির মুখে তাহাদের সম্বন্ধে এই সত্য আবিষ্কারের মিথ্যা ইতিহাস শুনিয়া অচলার সমস্ত দেহটা যেন এক খণ্ড অচেতন পদার্থের মত সখীর আলিঙ্গনের মধ্যে ঢলিয়া পড়িল। ইহজীবনের চরম লজ্জা মূর্ত্তি ধরিয়া এক-পা এক-পা করিয়া যে কোথায় অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তাহা সে চাহিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু সে যখন অত্যন্ত অকস্মাৎ অচিন্তনীয়-রূপে মুখ ফিরাইয়া আর এক পথে চলিয়া গেল, তাহাকে স্পর্শমাত্র করিল না, তখন এই বিপুল সৌভাগ্যকে বহন করিবার মত শক্তি আর তাহাতে ছিল না। শুধু দুই চক্ষের অবিশ্রান্ত অশ্রুপ্রবাহ ব্যতীত বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কোথাও জীবনের কোন লক্ষণ আর তাহার মধ্যে অনুভূত হইল না।

এমন কতক্ষণ কাটিল। বীণাপাণি আপন অঞ্চলে বার বার করিয়া অচলার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া সস্নেহে করুণস্বরে কহিল সুরমাদিদি, তুমি বয়সে বড় হ'লেও ছোটবোনের কথাটা রাখো ভাই, এইবার বাড়ি ফিরে যাও। আমি বল্‌চি, এ যাত্রা তোমাদের সুযাত্রা নয়। অনেক দুঃখে হাতের নোয়াটা যদি বজায় রয়েই গেছে দিদি, তখন অভিমান ক'রে আর গুরুজনদের দুঃখ দিয়ো না, আর তাঁদের ভাবিয়ো না। হেঁট হয়ে শ্বশুর-ঘরে ফিরে যেতে কোন লজ্জা, কোন অগৌরব নেই দিদি।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে পুনরায় কহিল, চুপ ক'রে রইলে যে ভাই? যাবে না? মা-বাপের ওপর রাগ ক'রে বাড়ি ছেড়ে সুরেশবাবু কখনো ভাল নেই। তোমার মুখ থেকে এ কথা শুন্‌লে তিনি খুসিই হবেন, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বল্‌চি।

অচলা চোখ মুছিয়া এইবার সোজা হইয়া বসিল। চাহিয়া দেখিল, বীণাপাণি তেমনি উৎসুক মুখে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। প্রথমটা উত্তর দিতে তাহার অতিশয় লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু শুদ্ধ মাত্র নির্ব্বাক্ রহিয়াই যে ওই মেয়েটির কাছে মুক্তি পাওয়া যাইবে না, তাহাতে যখন আর কোন সংশয় রহিল না, তখন সমস্ত সংকোচ জোর করিয়া পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমাদের বাড়ি ফিরে যাবার কোন পথ নাই বীণা।

বীণাপাণি বিশ্বাস করিল না। কহিল, কেন পথ নেই? তোমাকে আমি বেশি দিন জানি নে সত্যি, কিন্তু যতটুকু জানি, তাতে সমস্ত পৃথিবীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দিব্যি ক'রে বল্‌তে পারি, তুমি এমন কাজ কখনো করতে পারো না দিদি, যার জন্যে কেউ তোমার কোন দিকের পথ বন্ধ কর্‌তে পারে। আচ্ছা, তোমার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা ব'লে দাও, আমরা ত পরশু সকালের গাড়ীতে বাড়ি যাচ্ছি, বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আমি নিজে তোমাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হব, দেখি বুড়ো-বুড়ি আমাকে

কি জবাব দেন। তোমার যাঁরা শ্বশুর-শাশুড়ী, তাঁরা আমারও তাই—তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে আমার কোন লজ্জা নেই।

অচলা চকিত হইয়া কহিল, তোমরা পরশু দেশে যাবে, এ কথা ত শুনি নি? এখানে কে কে থাক্‌বেন?

বীণাপাণি কহিল, কেউ না, শুধু চাকর-দরয়ান্ বাড়ি পাহারা দেবে। আমার জাঠ-শাশুড়ী অনেক দিন থেকেই শয্যাগত, তাঁর প্রাণের আশা আর নেই—তিনি সকলকেই একবার দেখতে চেয়েছেন।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শ্বশুরবাড়িটি কোথায়?

বীণাপাণি বলিল, কল্‌কাতার পটলডাঙ্গায়।

পটলডাঙ্গার নাম শুনিয়া অচলার মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে কহিল, বীণা, তা হ'লে আমাদেরও এ বাড়ি ছেড়ে কালই যেতে হয়। এখানে থাকা ত আর চলে না।

বীণাপাণি হাসিয়া উঠিল। বলিল, তাই বুঝি তোমাদের বাড়ি ফেরবার জন্যে এত সাধা-সাধি করচি? এতক্ষণে বুঝি আমার কথার তুমি এই অর্থ করলে। না দিদি, আমার ঘাট হয়েছে, তোমাকে কোথাও যেতে আর কখনো আমি বল্‌ব না, যত দিন ইচ্ছে এই কুঁড়ে ঘরে তোমরা বাস কর, আমাদের কারও আপত্তি নেই।

কিন্তু এই সদয় নিমন্ত্রণের অচলা কোন উত্তরই দিতে পারিল না। মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের যাওয়া কি সত্যই স্থির হয়ে গেছে?

বীণাপাণি কহিল, স্থির বই কি। আজ আমাদের গাড়ি পর্য্যন্ত রিজার্ভ করা হয়েচে। বাবার ঘরে যদি একবার উঁকি মারো ত দেখতে পাবে বোধ হয়, পোনর আনা জিনিসপত্রই বাঁধাছাঁদা ঠিকঠাক।

দাসী আসিয়া দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া কহিল, বৌমা, মা একবার তোমাকে রান্নাঘরে ডাকচেন।

যাই, বলিয়া সে একটু হাসিয়া সহসা আর একবার দুই বাহু দিয়া অচলার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া কানে কানে কহিল, এত দিন লোকের ভিড়ে অনেক মুস্কিলেই তোমাদের দিন কেটেছে। এবার খালি বাড়ি—কেউ কোথাও নেই—আপদ-বালাই আমিও দূর হয়ে যাবো—এবার বুঝলে না ভাই দিদিমণিটি? বলিয়া সখীর কপোলের উপর দুটি আঙুলের একটু চাপ দিয়াই দ্রুতবেগে দাসীর অনুসরণ করিয়া চলিয়া গেল।

এক টুকরা আনন্দ, খানিকটা দক্ষিণা হাওয়ার মত এই সৌভাগ্যবতী তরুণী লঘুপদে দৃষ্টির বাহিরে অপসৃত হইয়া গেল, কিন্তু তাহার কানে কানে বলা শেষ কথা দুটি অচলা দুই কানের মধ্যে লইয়া সেইখানে পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আজিকার রাত্রি এবং কল্যকার দিনটা মাত্র বাকি। তাহার পরে আর কোন বাধা, কোন বিঘ্ন নাই—এই নির্জ্জন নীরব পুরীর মধ্যে—কাছে এবং দূরে, তাহার যতদূর দৃষ্টি যায়—ভবিষ্যতের মধ্যে চোখ মেলিয়া দেখিল—কেবল একাকী এবং কেবলমাত্র সুরেশ ব্যতীত আর কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই জনহীন পুরীর মধ্যে কেবলমাত্র সুরেশকে লইয়া জীবনযাপন করিতে হইবে এবং সেই দুর্দ্দিন প্রতি মুহূর্ত্তে আসন্ন হইয়া আসিতেছে। বাধা নাই, ব্যবধান নাই, লজ্জা নাই—আজ নয় কাল বলিয়া একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করিবার পর্য্যন্ত সুযোগ মিলিবে না।

বীণাপাণি বলিয়াছিল, সুরমাদিদি, শ্বশুর-ঘর আপনার ঘর, সেখানে হেঁট হয়ে যেতে মেয়েমানুষের কোন সরম নেই।

হায় রে, হায়! তাহার কে আছে, আর কি নাই, সে জমা খরচের

হিসাব তাহার অন্তর্যামী ভিন্ন আর কে রাখিয়াছে! তথাপি আজও তাহার আপনার স্বামী আছে এবং আপনার বলিতে সেই তাহাদের পোড়াভিটাটা এখনও পৃথিবীর অঙ্ক হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। আজিও সে একটা নিমিষের তরেও তাহার মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারে!

আবদ্ধ পশুর চোখের উপর হইতে যতক্ষণ না এই বাহিরের ফাঁকটা একেবারে আবৃত হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেমন সে একই স্থানে বারংবার মাথা কুটিয়া মরিতে থাকে, ঠিক তেমনি করিয়াই তাহার অবাধ্য মনের প্রচণ্ড কামনা তাহার বক্ষের মধ্যে হাহাকার করিয়া বাহিরের জন্য পথ খুঁজিয়া মরিতে লাগিল। পার্শ্বের ঘরে সুরেশ নিরুদ্বেগে নিদ্রিত, মধ্যের দরজাটা ঈষৎ উন্মুক্ত এবং তাহারই এ-ধারে মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া আপনার আপাদ-মস্তক কম্বলে ঢাকিয়া হিন্দুস্থানী দাসী অকাতরে ঘুমাইতেছে। সমস্ত বাটীর মধ্যে কেহ যে জাগিয়া আছে, তাহার আভাস-মাত্র নাই—শুধু সে-ই যেন অগ্নি-শয্যার উপরে দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। অনেক দিন এই পালঙ্কের উপরেই তাহার পার্শ্বে বীণাপাণি শয়ন করিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার স্বামী উপস্থিত, সে তাহার নিজের ঘরে শুইতে গিয়াছে, এবং পাছে এই চিন্তার সূত্র ধরিয়া নিজের বিক্ষিপ্ত পীড়িত চিত্ত অকস্মাৎ তাহাদেরই অবরুদ্ধ কক্ষের সুষুপ্ত পর্য্যঙ্কের প্রতি দৃষ্টি হানিয়া হিংসায়, অপমানে, লজ্জার অণু-পরমাণুতে বিদীর্ণ হইয়া মরে, এই ভয়ে সে যেন আপনাকে আপনি প্রচণ্ড শক্তিতে টানিয়া ফিরাইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত দেহটা তার তীব্র তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পার্শ্বের কোন একটা ঘরের ঘড়ীতে দুইটা বাজিল। গায়ের গরম কাপড়খানা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিতেই অনুভব করিল, এই শীতের রাত্রেও তাহার কপালে-মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়াছে। তখন শয্যা ছাড়িয়া মাথার দিকের জানালাটা খুলিয়া দিতেই দেখিতে পাইল, কৃষ্ণ-

পক্ষের অষ্টমীর খণ্ড-চন্দ্র ঠিক সম্মুখেই দেখা দিয়াছে, এবং তাহারই স্নিগ্ধ মৃদু কিরণে শোণের নীলজল বহুদূর পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে গভীর রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস তাহার তপ্ত ললাটের উপর স্নেহের হাত বুলাইয়া দিল এবং সেইখানে সেই জানালার উপরে সে তাহার অদৃষ্টের শেষ সমস্যা লইয়া বসিয়া পড়িল।

এই কথাটা অচলা নিশ্চয় বুঝিয়াছিল যে, তাহার এই অভিশপ্ত, হতভাগ্য জীবনের যাহা কিছু সত্য, সমস্তটাই লোকের কাছে শুধু কেবল একটা অদ্ভুত উপন্যাসের মত শুনাইবে এবং যে দিন হইতে এই কাহিনীর প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে যত মিথ্যা এ জীবনে সত্যের মুখোস পরিয়া দেখা দিয়া গিয়াছে, তাহাদের একটি একটি করিয়া মনে করিয়া ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং যে ভাগ্য-বিধাতা তাহার যৌবনের প্রথম আনন্দটিকে মিথ্যা দিয়া এমন বিকৃত, এমন উপহাসের বস্তু করিয়া জগতের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিতে লেশমাত্র মমতা বোধ করিল না, সেই নির্ম্মম নিষ্ঠুরকে সে যদি শিশুকাল হইতে ভগবান বলিয়া ভাবিতে শিক্ষা পাইয়া থাকে ত সে শিক্ষা তাহার একেবারে ব্যর্থ, একেবারে নিরর্থক হইয়াছে। সে চোখ মুছিতে মুছিতে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, হে ঈশ্বর! তোমার এতবড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই দুর্ভাগিনীর জীবনটা ভিন্ন কৌতুক করিয়া আমোদ করিবার আর কি ছাই কিছুই ছিল না!

মনে মনে কহিল, কোথায় ছিলাম আমি এবং কোথায় ছিল সুরেশ। ব্রাহ্ম-পরিবারের ছায়া মাড়াইতেও যাহার ঘৃণা ও বিদ্বেষের অবধি ছিল না, ভাগ্যের পরিহাসে আজ সেই লোকেরই কি আসক্তির আর আদি-অন্ত রহিল না! যাহাকে সে কোন দিন ভালবাসে নাই, সেই তাহার প্রাণাধিক, শুধু এই মিথ্যাটাই কি সবাই জানিয়া রাখিল? আর যাহা সত্য, সে কি কোথাও কাহারো কাছেই আশ্রয় পাইল না? আবার সেই

মিথ্যাটা কি তাহার নিজের মুখ দিয়াই প্রচার হওয়ার এত প্রয়োজন ছিল? অদৃষ্টের এত বড় বিড়ম্বনা কাহার ভাগ্যে কবে ঘটিয়াছে? স্বামীকে সে অনেক দুঃখেই পাইয়াছিল, কিন্তু সে সহিল না—তাহার চরম দুর্দ্দশার বোঝা বহিয়া অকস্মাৎ এক দিন সুরেশ গিয়া অভিসম্পাতের মত তাহাদের দেশের বাটীতে উপস্থিত হইল। তাহার সুখের নীড় দগ্ধ হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাগ্যটাও যে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, এ কথা বুঝিতে আর যখন বাকি রহিল না, তখন আবার কেন তাহার পীড়িত স্বামীকে তাহারই ক্রোড়ের উপরে আনিয়া দেওয়া হইল! যাহাকে সে একেবারে হারাইতে বসিয়াছিল, সেবার ভিতর দিয়া আবার তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ফিরাইয়া দেওয়াই যদি বিধাতার সঙ্কল্প ছিল, তবে আজ কেন তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশা, লাঞ্ছনা-অপমানের আর কুলকিনারা নাই?

অচলা দুই হাত যোড় করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, জগদীশ্বর! রোগমুক্ত স্বামীর স্নেহাশীর্ব্বাদে সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নিঃশেষ হইয়াছে বলিয়াই যদি এক দিন আমাকে বিশ্বাস করিতে দিয়াছিলে, তবে এত বড় দুর্গতির মধ্যে আবার ঠেলিয়া দিলে কিসের জন্য? সে যে সঙ্কোচ মানে নাই, এত কাণ্ডের পরেও সুরেশকে সঙ্গে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, জগতে এ অপরাধের আর ক্ষালন হইবে না, কলঙ্কের এ দাগ আর মুছিবে না—কিন্তু অন্তর্যামী, আমার অদৃষ্টে তুমিও কি ভুল বুঝিলে? এই বুকের ভিতরটায় চিরদিন কি রহিয়াছে, সে কি তোমার চোখেও ধরা পড়িল না।

পিতার চিন্তা, স্বামীর চিন্তা সে যেন প্রাণপণ বলে দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া রাখিয়া দিত, আজও সকল ভাবনাকে সে কাছে ঘেঁসিতে দিল না; কিন্তু তাহার মৃণালের কথাগুলা মনে পড়িল, আর মনে পড়িল পিসিমাকে। আসিবার কালে স্নেহার্দ্র করুণ-কণ্ঠে সতী-সাধ্বী বলিয়া তিনি যত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, সেই সব। তাহার সম্বন্ধে আজ

মনোভাব কল্পনা করিতে গিয়া অকস্মাৎ মর্মান্তিক আঘাতে কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত বোধশক্তি তাহার যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং দেহ-মনের সেই অশক্ত-অভিভূত অবস্থায় জানালার গায়ের উপর মাথা রাখিয়া বোধ হয় অজ্ঞাতসারে চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, এমন সময় পিছনে মৃদু পদশব্দে চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, খালি-গায়ে খালি-পায়ে সুরেশ দাঁড়াইয়া আছে। মুহূর্তের উত্তেজনায় হয় ত সে কিছু বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠ-রোধ করিয়া দিল। ইহাকে দমন করিয়া কথা কহিতে বোধ হয় আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না, তাই পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া সে তেমনি করিয়াই গরাদের উপর মাথা রাখিল; কিন্তু যে অশ্রু এতক্ষণ তাহার চোখ দিয়া বিন্দুতে বিন্দুতে পড়িতেছিল, সে যেন অকস্মাৎ কূল ভাঙ্গিয়া উন্মত্ত-ধারায় ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কোথাও কোন শব্দ নাই, রাত্রির গভীর নীরবতা গৃহের ভিতরে-বাহিরে বিরাজ করিতে লাগিল। পিছনে দাঁড়াইয়া সুরেশ পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্তব্ধ—সহসা তাহার সমস্ত দেহটা বাতাসে বাঁশপাতার মত কাঁপিতে লাগিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই সে দুই হাত বাড়াইয়া অচলার মাথাটা টানিয়া আনিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

অচলা আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া আঁচলে চোখ মুছিল, কিন্তু অতি বড় বিস্ময় এই যে, যে লোকটা তাহার এত বড় দুঃখের মূল, তাহার এই ব্যবহারে আজ অচলার উৎকট ঘৃণা বোধ হইল না, বরঞ্চ মৃদু কণ্ঠে কহিল, তুমি এ-ঘরে এসেচ কেন?

সুরেশ চুপ করিয়া রহিল। বোধ করি কণ্ঠস্বরের অভাবেই সে জবাব দিতে পারিল না।

অচলা ধীরে ধীরে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, শীতে তোমার হাত কাঁপচে, যাও, খালি-গায়ে আর দাঁড়িয়ে থেকো না—ঘরে গিয়ে শুয়ে পড় গে।

সুরেশের চোখ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার গলা কাঁপিতে লাগিল—অচলার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, তা হ'লে তুমিও আমার ঘরে এসো।

অচলা মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া শুধু কহিল, না, আজ নয়। এই বলিয়া ধীরে ধীরে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইল।

এই শান্ত সংযত প্রত্যাখানের মধ্যে ঠিক কি ছিল, তাহা নিশ্চয় বুঝিতে না পারিয়া সুরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অচলা তাহার প্রতি না চাহিয়াই পুনশ্চ কহিল, আমি জেগে আছি জান্‌তে পেরে কি তুমি এ-ঘরে ঢুকেছিলে?

সুরেশ আহত হইয়া বলিল, নইলে কি তোমাকে ঘুমন্ত জেনেই ঢুকেচি, এই তুমি আশা কর?

আশা? অচলা মুখ ফিরাইয়া একটুখানি হাসিল। এই তীক্ষ্ণ কঠিন হাসি দীপের অত্যন্ত ক্ষীণ আলোকেও সুরেশের চক্ষু এড়াইল না। সে হাসি যেন স্পষ্ট কথা কহিয়া বলিল, ওরে কাপুরুষ! নিদ্রিত রমণীর কক্ষে যে চোরের মত প্রবেশ করিতে নাই, পুরুষের এ মহত্ব কি তুমি আজও দাবী কর? কিন্তু মুখে কোন কথাই কহিল না। ক্ষণেক পরে গবাক্ষ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, তোমার শরীর ভাল নেই, আর জেগো না—যাও, শোও গে। বলিয়া সে ধীরে ধীরে বিছানায় আসিয়া গায়ের কম্বলটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আড়ষ্টভাবে সুরেশ সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, তার পরে নিঃশব্দ পদক্ষেপে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দুই-এক জন দাস-দাসী ব্যতীত দিন পাঁচ-ছয় হইল, বাটীর সকলেই কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। কেবল যাওয়া ঘটে নাই কর্তার। কি একটা জরুরি কাজের অজুহাতে তিনি শেষ সময়ে পিছাইয়া গিয়াছিলেন। এ কয়দিন রামচরণবাবু নিজের কাজ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, বড় একটা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত না। হঠাৎ আজ প্রত্যূষেই তিনি সাড়া দিয়া উপরের বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সুরমার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শীতের দিনের এমন প্রভাতে তখন পর্যন্ত কেহ শয্যাত্যাগ করিয়া উঠে নাই, আহ্বান শুনিয়া অচলা শশব্যস্তে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষণেক পরেই সুরেশও আর একটা দরজা খুলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিল। এই সদ্য নিদ্রোত্থিত দম্পতিকে বিভিন্ন কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া এই বৃদ্ধের প্রসন্ন দৃষ্টি যে সহসা বিস্ময়ে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল, তাহা সুরেশ দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু অচলার চক্ষে প্রচ্ছন্ন রহিল না।

রামবাবু সুরেশের দিকে চাহিয়া একটু অনুতাপের সহিত কহিলেন, তাই ত সুরেশবাবু, হাঁকা-হাঁকি ক'রে অসময়ে আপনার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলুম, বড় অন্যায় হয়ে গেল।

সুরেশ হাসিয়া বলিল, অন্যায় কিছুই নয়। তার কারণ আমি জেগেই ছিলুম, বাইরে থেকে ডেকে কেন, ঢাক পিটেও আমার ঘরের শান্তিভঙ্গ করতে পারতেন না! কিন্তু এত ভোরেই যে?

বৃদ্ধ অচলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আজ আমার সুরমা মায়ের ওপর একটু উপদ্রব করবার আবশ্যক হয়ে পড়েছে, বলিয়া এবার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া হাসিমুখে বলিলেন, আমার পাল্‌কী প্রস্তুত, এখুনি বার হতে হবে, বোধ করি দুটো-তিনটের আগে আর ফিরতে পারব

না ; এই বুড়োটার জন্মে আজ চারটি ডাল-ভাত ফুটিয়ে রেখো মা, অত বেলায় এসে যেন না আর আগুন-তাতে যেতে হয়।

এই পরম নিষ্ঠাবান্ নিরামিষাহারী ব্রাহ্মণ স্ত্রী এবং পুত্রবধূ ভিন্ন আর কাহারও হাতে কখন আহার করেন না। তাঁহার রান্নাঘরটিও একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এমন কি, সকলের সে ঘরে যাওয়ার পর্য্যন্ত অধিকার ছিল না ; এবং স্বপাক আহার তাঁহার মাঝে মাঝে অভ্যাস ছিল বলিয়াই মেয়েরা বাড়ি ছাড়িয়া দেশে যাইতে পারিয়াছিল। এ কয়দিন তাঁহার সেই ব্যবস্থাই চলিয়াছিল, কিন্তু আজ অকস্মাৎ এই অজ্ঞাত অপরিচিত মেয়েটির উপর ভার দেওয়ার প্রস্তাবে সে বিস্ময়ে, এবং সকলের চেয়ে বেশি ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

রামবাবু সেই ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে কহিলেন, তুমি ভাবচ মা, এ বুড়ো আজ বলে কি! রান্না-খাওয়া নিয়ে যার এত বাচ-বিচার, অত হাঙ্গামা, তার আজ হ'লো কি? তা হোক্। রাক্ষসীর হাতে খেতে যখন আপত্তি হয় না, তখন তুমিই বা দুটো ডাল-ভাত ফুটিয়ে দিলে অপ্রবৃত্তি হবে কেন? আর হোক ভাল, না হোক ভাল, মা, অতখানি বেলায় ফিরে এসে হাঁড়ি ঠেলতে যেতে পারব না। বলিয়া অচলার নিরুত্তর মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ সহাস্যে কহিলেন, তুমি নিশ্চয় মনে মনে ভাবছ, এ বুড়োটার মধ্যে হঠাৎ যদি এত বড় ঔদার্য্যই জন্মে থাকে তবে আমাকে কষ্ট না দিয়ে হিন্দুস্থানী বামুনঠাকুরের হাতে খেলেই ত হ'তো। না গো, মা, তা হ'তো না। আজও এ বুড়োর তেম্নি গোঁড়ামি, তেমনি কুসংস্কার আছে—ম'রে গেলেও ঐ সন্ধ্যা-গায়ত্রীহীন হিন্দুস্থানী 'মহারাজে'র অন্ন আমার গলা দিয়ে গল্‌বে না। আর আমার রাক্ষুসী মাকে আর তোমাকে এরই মধ্যে একেবারে এক করে নিতে পেরেচি, সেও সত্য নয়, কিন্তু যতই

দেখচি, আমার মনে হচ্চে এই মা জননীটিও যদি এক দিন রেঁধে দেন, সে যে আমার অন্নপূর্ণার অন্ন হবে না, এ আমি কোন মতেই মানব না। কিন্তু আর ত দেরি করতে পারি নে মা, বাকি যেটুকু বল্‌বার রইল, সে টুকু খেতে খেতেই বল্‌ব। আর সেই বলাই তখন সব চেয়ে সত্যিকার বলা হবে। বলিয়া বৃদ্ধ চলিবার উপক্রম করিতেই অচলা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কি বলিবে, তাহা স্থির করিতে না করিতে যে কথাটা সকলের পূর্ব্বে মুখে আসিয়া পড়িল, তাহাই বলিয়া ফেলিল, কহিল, কিন্তু আমি ত ভাল রাঁধতে জানি নে। আমার রান্না আপনার চ পছন্দ হবে না।

বৃদ্ধ রামবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন, এই কথাটা আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বল মা?

অচলা কহিল, সকলেই কি রাঁধতে জানে?

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, সকলেই জানে, তাই কি আমি বল্‌চি?

অচলা এ কথার হঠাৎ কোন প্রত্যুত্তর করিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিল। কিন্তু সুরেশের পক্ষে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। অচলার বিবর্ণ মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া সে তাহার বেদনা বুঝিল। এই বৃদ্ধের সংস্কার, তাহার হিন্দু আচার ভাল হোক, মন্দ হোক, সত্য হোক, মিথ্যা হোক, তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়ানোর মধ্যে যে কদর্য্য প্রতারণা লুক্কায়িত রহিয়াছে, সে কথা যে অচলার অগোচর নাই, এবং এই ভদ্র নারীর হৃদয়ের বিবেক যে কিছুতেই এই গোপন কথার গভীর দুষ্কৃতি হইতে আপনাকে অব্যাহতি দিতেছে না, তা তাহার শ্রীহীন পাণ্ডুর মুখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া সে আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মুখ-হাত ধোয়ার অছিলায় দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিয়া গেল।

তা হ'লে আমি চল্‌লুম, বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে রামচরণবাবুও সুরেশের

অনুসরণ করিলেন। মুহূর্তকালমাত্র অচলা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পরেই নিজেকে জোর করিয়া সচেতন করিয়া তুলিয়া ডাকিল, একবার শুনুন—

বৃদ্ধ ফিরিয়া দেখিলেন, সুরমা কি যেন বলিতে চাহিয়াও নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। তখন কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিলেন, আর একটা কথা তোমাকে জানাবার আছে মা। তোমার সঙ্কোচ যখন কোনমতেই কাটতে চাইছে না, তখন—কি জানো সুরমা, ছেলে-বেলায় আমি ছিলাম পাড়ার মেজদা। তোমার বাপের চেয়ে হয় ত বয়সে ছোটও হব না! তা হ'লে আমাকে কেন মেজজ্যাঠামশাই ব'লে ডেকো না মা।

এই বৃদ্ধ যে তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, অচলা তাহা জানিত। ভালবাসার এই প্রকাশ্যতায় তাহার চোখের কোণে যেন জল আসিয়া পড়িল। তাই সে শুধু নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করিলেন, আর কিছু বল্‌বে?

অচলা তেমনি নীরবে ক্ষণকাল মাটীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া এইবার বোধ হয় সে নিজের সমস্ত শক্তিই এক করিয়া শুধু অস্ফুটে বলিল, কিন্তু আমার বাবা ব্রাহ্ম ছিলেন।

রামচরণবাবু হঠাৎ চমকিয়া গেলেন। কহিলেন, সত্যিকারের, না পাঁচ জন কল্‌কাতায় এসে দুদিন সখ ক'রে যেমন হয় তেমনি? তারা ব্রাহ্মদের দলে ব'সে হিঁদুদের কোসে গালাগালি দেয়—তেমন গাল সত্যিকারের ব্রাহ্মরা কখনো মুখে আন্‌তেও পারে না—তার পরে ঘরে ফিরে সমাজে দাঁড়িয়ে সেই ব্রাহ্মদের নাম ক'রে আবার এম্‌নি গালি-গালাজ করে যে, তেমন মধুর বচন হিঁদুদের চোদ্দপুরুষও কখনো উচ্চারণ কর্‌তে পারে না! বলি, তেমনি ত মা? তা হয় ত আমার এতটুকু আপত্তি নেই।

অচলার চোখ মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, সে কেবলমাত্র কহিল, না, তিনি সত্যিকার ব্রাহ্ম।

উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ যেন একটু দমিয়া গেলেন। কিন্তু একটু পরেই প্রফুল্লমুখে বলিলেন, তা হলেনই বা বাবা ব্রাহ্ম, মেয়ে ত আর তাঁর খাতক নয় যে, এখন ভয় কর্‌তে হবে। বরঞ্চ যাঁর সঙ্গে তুমি ধর্ম্ম ভাগ ক'রে নিয়েছ মা, তিনি যখন হিন্দু, তাঁর গলায় যখন যজ্ঞোপবীত শোভা পাচ্চে, তিনি যখন ওই সুতো ক'গাছার এখনো অপমান করেন নি, তখন বাপের কর্ম্ম ত তোমাকে স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু তুমি যত ফন্দিই কর না সুরমা, বুড়ো-জ্যাঠামশাইকে আজ আর ফাঁকি দিতে পার্‌চ না। আজ তোমাকে রেঁধে ভাত দিতেই হবে। তাই বাপের শিক্ষার গুণে সে দিন উপোস করতে চাও নি বটে? আজ তার সুদ-শুদ্ধ উসুল ক'রে তবে ছাড়বো। বলিয়া তিনি পুনরায় চলিয়া যান দেখিয়া অচলা এতক্ষণ পরে তাহার অভিভূত ভাবটাকে এক নিমেষে অতিক্রম করিয়া গেল। সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, আচ্ছা জ্যাঠামশাই, আমি ব্রাহ্ম-মহিলা হ'লে আপনি আমার হাতে খাবেন না?

বৃদ্ধ বলিলেন, না! কিন্তু সে ত তুমি নও, সে ত তুমি হ'তে পারো না।

অচলা প্রশ্ন করিল, কিন্তু তাও যদি হ'তো, তা হ'লে কি শুধু আমার ধর্ম্মমতটা আলাদা বলেই আমি আপনার কাছে অস্পৃশ্য হয়ে যেতুম?

বৃদ্ধ বলিলেন, অস্পৃশ্য হবে কেন মা, অস্পৃশ্য নয়। কিন্তু তোমার হাতে খেতে পারতাম না।

এ সম্বন্ধে আজ তাহার অনেক কথাই জানা প্রয়োজন। তাই সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল, কেন পার্‌তেন না, সে কি ঘৃণায়?

বৃদ্ধ সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল একদৃষ্টে মেয়েটির মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

অচলা সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়াছিল, বলিল, জ্যাঠামশাই, আপনার মায়া-দয়া যে কত বড়, তার অনেক সাক্ষী এ পৃথিবীতে আছে জানি, কিন্তু আমাদের চেয়ে বড় সাক্ষী আর কেউ নেই। তবে আপনার মত মানুষের মন যে কেমন ক'রে এত অনুদার হ'তে পারে, তাই আমি ভেবে পাই নে। আপনি কি ক'রে মানুষকে এমন ঘৃণা করতে পারেন?

বৃদ্ধ অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আমি ঘৃণা করি? কাকে মা? কখন্ মা?

অচলা বলিল, যার হাতের ছোঁয়া আপনার অস্পৃশ্য, সেই আপনার ঘৃণার পাত্র—তাকেই আপনি মনে মনে ঘৃণা করেন। আর ঘৃণা যে করেন, তাও দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে ভুলে গেছেন। আমাদের ওই হিন্দুস্থানী চাকরটার কথা ছেড়ে দিন, পাচকটার হাতের রান্নাও যে কোনমতেই আপনার গলা দিয়ে গলবে না, সেও আপনি নিজের মুখেই প্রকাশ করেছেন। এতে দেশের কত ক্ষতি, কত অবনতি হয়েচে, সে ত—

বৃদ্ধ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, অচলার উত্তেজনাও লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাহার কথা হঠাৎ শেষ হইলে একটু হাসিয়া বলিলেন, মা, ঘৃণা আমরা কোন মানুষকেই করি নে। যে নালিশ তুমি করলে, সে নালিশ সাহেবেরা করে—তাদের কাছে তোমার বাবার শেখা—আর তাঁর কাছে তুমি শিখেচ। নইলে মানুষ যে ভগবান, এ জ্ঞান কেবল তাদের নয়, আমাদেরও ছিল, আজও আছে।

এই সময় নিচে হইতে একটা অস্পষ্ট কোলাহল শুনা যাইতেছিল; বৃদ্ধ সে দিকে এক মুহূর্ত্ত কান পাতিয়া কহিলেন, সুরমা, খাওয়া জিনিসটা যাদের মধ্যে মস্ত বড় জিনিস, মস্ত ঘটা-পটার ব্যাপার, তাদের সঙ্গে আমাদের মিল হবে না। আমাদের ভাতে-ভাত খাওয়াটা তুচ্ছ বস্তু,

সেটুকুর আজ একটু যোগাড় ক'রে রেখো—মুখে দিতে দিতে তখন আলোচনা করা যাবে, ঘৃণাটা আমরা কাকে কত করি এবং দেশের অবনতি তাতে কতখানি হচ্চে—কিন্তু গোলমাল বাড়চে—আর নয় মা, আমি চল্‌লুম। বলিয়া তিনি একটু দ্রুতবেগে নামিয়া গেলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায় অপরাহ্ণ-বেলায় ভোজন সমাধা করিয়া রামবাবু তৃপ্তি ও প্রাচুর্য্যের একটা সশব্দ উদ্গার ছাড়িয়া যখন গাত্রোত্থান করিতে গেলেন, তখন অচলা অনেক কষ্টে একটুখানি হাসিয়া বলিল, কিন্তু জ্যাঠামশাই, যে দিন জান্‌তে পারবেন, আজ আপনার জাত গেছে, সে দিন কিন্তু রাগ কর্‌তে পার্‌বেন না, তা ব'লে দিচ্চি।

বৃদ্ধ সস্নেহে মৃদু-হাস্যে ঘাড়টা একটু নাড়িয়া কহিলেন, আচ্ছা মা, তাই হবে, বলিয়া আচমন করিতে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার খড়মের খট্ খট্ শব্দ যতক্ষণ পর্য্যন্ত শোনা গেল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অচলা সমস্ত দৃষ্টি দিয়া যেন ওই আওয়াজটাকেই অনুসরণ করিতে লাগিল, তার পর কখন্ যে সে শব্দ মিলাইল, কখন্ যে বাহিরের সংসার তাহার চেতনা হইতে বিলুপ্ত হইয়া তাহাকে পাথর করিয়া দিল, সে টেরও পাইল না।

অনেক দিনের হিন্দুস্থানী দাসীটি বাঙলা কথার সঙ্গে বাঙালীর আচার-ব্যবহার কায়দা-কানুনও কতকটা আয়ত্ত করিয়াছিল, সে কি একটা কাজে এ দিকে আসিয়া বহু-মার বসিয়া থাকার ভঙ্গী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং বয়োজ্যেষ্ঠার অধিকারে তাহার শেখা-বাঙলার তর্জ্জন শব্দে বেলার দিকে অচলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ খাওয়া-দাওয়ার কোন প্রয়োজন আছে, না এমন ভাবে চুপ-চাপ বসিয়া থাকিলেই চলিবে?

অচলা চমকিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল, বেলা আর নাই, শীতের সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। একটা দীপ্তিহীন নিষ্প্রভতা শ্রান্তির মত আকাশের সর্ব্বাঙ্গে ভরিয়া আসিয়াছে, লজ্জা পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাসিয়া কহিল, আমি যে একেবারে সন্ধ্যার পরেই খাব ব'লে ঠিক করেচি লালুর মা। আজ ক্ষিদে-তেষ্টা এতটুকু নেই।

লালুর মা বিস্মিত হইয়া কহিল, বড়বাবুর খাওয়া হয়ে গেলেই তুমি খাবে, একটু আগেই যে বল্‌লে বহু-মা?

নাঃ—একেবারে রাত্রিতেই খাবো, বলিয়া আর বেশি বাদানুবাদের অবসর না দিয়াই অচলা ত্বরিতপদে উপরে চলিয়া গেল।

একটু সময় পাইলেই সে উপরের বারান্দায় রেলিঙের পার্শ্বে চৌকি টানিয়া লইয়া নদীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিত। আজকার রাত্রেও সেইরূপ বসিয়াছিল, হঠাৎ রামবাবুর চটিজুতার শব্দ পাইয়া অচলা ফিরিয়া দেখিল, বৃদ্ধ একেবারে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি হাতের হুঁকাটা এককোণে ঠেস দিয়া রাখিয়া আর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সেই কথাটার একটা মীমাংসা কর্‌তে এলাম সুরমা, তোমার ব্রহ্মজ্ঞানী বাবাটি ঠিক, না এই বুড়ো জ্যাঠামশায়ের কথাটি ঠিক, তর্কটার যা হোক্ একটা নিষ্পত্তি না ক'রে আজ আর নিচে যাচ্চি নে।

অচলা বুঝিল, এ সেই জাতি-ভেদের প্রশ্ন, শ্রান্তস্বরে বলিল, আমি তর্কের কি-জানি জ্যাঠামশাই!

রামবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ওরে বাস্ রে, তুমি কি সোজা লোকের বেটী না কি মা! তবে কথাটা না কি একেবারে মিথ্যে, তাই যা রক্ষা, নইলে ও-বেলায় ত হেরে গিয়েছিলাম আর কি!

অচলার কোন বিষয় লইয়াই আলোচনা করিবার মত মনের অবস্থা নয়; সে এই তর্ক-যুদ্ধ হইতে আত্মরক্ষার একটুখানি ফাঁক দেখিতে

পাইয়া কহিল, তা হ'লে আর তর্ক কি জ্যাঠামশাই! আপনারই ত জিত হয়েছে! একটুকু থামিয়া বলিল, যে হেরে গেছে, তাকে আবার দুবার ক'রে হারিয়ে লাভ কি আপনার?

রামবাবু তৎক্ষণাৎ কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। তাঁহার বয়স অনেক হইয়াছে, সংসারে তিনি অনেক জিনিস দেখিয়াছেন, সুতরাং এই অবসন্ন কণ্ঠস্বরও যেমন তাঁহার অগোচর রহিল না, এই মেয়েটি যে সুখে নাই, ইহার মনের মধ্যে কি যে একটা ভয়ানক বেদনা পাঁজার আগুনের মত অহর্নিশি জ্বলিতেছে, ইহাও তেমনি এই শ্রান্ত-পাণ্ডুর মুখের উপরে আর একবার স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া হঠাৎ একটা হাসিবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত স্নেহের সহিত বলিলেন, নাঃ—ছুতো খাট্‌ল না মা! বুড়ো মানুষ, বকতে ভালবাসি—সন্ধ্যা-বেলায় একলাটি প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে, তাই ভাবলাম, মিথ্যে-টিথ্যে ব'লে মাকে একটু রাগিয়ে দিয়ে দুটো গল্প করি গে, কিন্তু ছল ধরা প'ড়ে গেল। বলিয়া তিনি ঝুঁকিয়া পড়িয়া হুঁকাটার জন্য একবার হাতটা বাড়াইয়া দিলেন।

তিনি যে যাইবার জন্য এটি সংগ্রহ করিতেছেন, অচলা তাহা বুঝিল এবং নিচে গিয়া একাকী এই বৃদ্ধের যে অনেক দুঃখেই সময় কাটিবে, তাহা উপলব্ধি করিয়া তাহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। তাই সে চকিতের ন্যায় চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া নিজেই তাহা তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধের প্রসারিত হস্তে দিতে দিতে বলিল, আপনি যত খুসি তামাক খেতে চান, এইখানে ব'সে খান, কিন্তু এখন উঠে যেতে আপনাকে আমি কিছুতে দেব না।

বৃদ্ধ হুঁকা হাতে লইয়া হাসিয়া বলিলেন, ওরে বাপ রে, একদম অতখানি রাশ ঢিলে দিয়ো না মা, আখের সাম্‌লাতে পারবে না! আমার মুখ বুজে তামাক খাওয়া যে কি ব্যাপার, তা ত দেখ নি! তার চেয়ে বরঞ্চ এর ফাঁকে আধটু বলতে দাও যে—

মানুষের দম আট্‌কে না যেতে পায়, না জ্যাঠামশাই? আচ্ছা, তাই ভাল। কিন্তু কি নিয়ে বকুনি সুরু করবেন বলুন ত?

রামবাবু মুখ হইতে একগাল ধূঁয়া উপরের দিকে মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন, তবেই মুস্কিলে ফেল্‌লে মা। মহা-বক্তার লোককেও প্রশ্ন করলে তার মুখ বন্ধ হয়ে আসে যে!

আচ্ছা জ্যাঠামশাই, কোন দিন যদি জান্‌তে পারেন, জোর ক'রে যার হাতে আজ ভাত খেয়েছেন, তার চেয়ে নিচ, তার চেয়ে ঘৃণিত পৃথিবীতে আর কেউ নেই, তখন কি করবেন? প্রায়শ্চিত্ত? আর, শাস্ত্রে যদি তার বিধি পর্য্যন্ত না থাকে, তা হ'লে?

বৃদ্ধ বলিলেন, তা হ'লে ত ল্যাঠা চুকেই গেল মা, প্রায়শ্চিত্ত আর করতে হবে না।

কিন্তু আমার উপর তখন কি রকম ঘৃণাই না আপনার হবে!

কখন্ মা?

যখন টের পাবেন, আমার একটা জাত পর্য্যন্ত নেই।

রামবাবু হুঁকাটা মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া সেই অস্পষ্ট আলোকেই ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমাদের এই কথাটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি নে মা। আর 'তোমাদের' বলি কেন, জানো সুরমা, আমার নিজের ছেলের মুখ থেকেও এ নালিশ শুনেচি। সে ত স্পষ্টই বলে, এই খাওয়া-ছোঁওয়ার বাচবিচার থেকেই সমস্ত দেশটা ক্রমাগত সর্ব্বনাশের দিকে তলিয়ে যাচ্চে। কারণ এর মূলে আছে ঘৃণা, এবং ঘৃণার ভেতর দিয়ে কোন বড় ফল পাওয়া যায় না।

অচলা মনে মনে অতিশয় বিস্মিত হইল। এ বাড়িতেও যে এ সকল আলোচনা কোন অবকাশ দিয়া পথ পাইতে পারে, এ তাহার ধারণাই ছিল না। কহিল, কথাটা কি তবে মিথ্যে?

রামবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, মিথ্যে কি না, সে জবাব নাই দিলাম মা। কিন্তু সত্যি নয়। শাস্ত্রের বিধিনিয়ম মেনে চলি, এইমাত্র। যারা আরও একটু বেশী যায়—এই যেমন আমার গুরুদেব, তিনি নিজে রেঁধে খান, মেয়েকে পর্য্যন্ত হাত দিতে দেন না। তাই থেকে কি এই স্থির করা যায়, তিনি তাঁর একমাত্র সন্তানকেও ঘৃণা করেন।

অচলা জবাব দিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিল।

বৃদ্ধ হুঁকাটায় আর গোটা-কতক টান দিয়া বলিলেন, মা, যৌবনে আমি অনেক দেশ ঘুরে বেড়িয়েচি। কত বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত আর কত রকমের লোক, কত রকমের আচার ব্যবহার, সে সব নাম হয় ত তোমরা জান না—কোথাও খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার আছে, কোথাও বা তার আভ্যাস পর্য্যন্ত শোনে নি, তবু ত মা, তারা চিরদিন তেমনি অসভ্য, তেমনি ছোট। বলিয়া দগ্ধ হুঁকাটায় পুনরায় গোটা-দুই নিষ্ফল টান দিয়া বৃদ্ধ শেষবারের মত সেটাকে থামের কোণে ঠেস্ দিয়া রাখিলেন। অচলা যেমন নিঃশব্দে বসিয়াছিল, তেমনি নীরবেই বসিয়া রহিল।

রামবাবু নিজেও খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, আসল কথা কি জানো সুরমা, তোমরা সাহেবদের কাছে পাঠ নিয়েছ। তারা উন্নত, তারা রাজা, তারা ধনী। তাদের মধ্যে যদি পা উঁচু ক'রে হাতে চলার ব্যবস্থা থাকত, তোমরা বল্‌তে ঠিক অম্‌নি করে চলতে না শিখলে আর উন্নতির কোন আশা-ভরসাই নেই।

এই সকল তর্ক-যুক্তি অচলা বাঙলা দৈনিক কাগজে অনেক পড়িয়াছে, তাই কোন কথা না বলিয়া শুধু একটু হাসিল। হাসিটুকু বৃদ্ধ দেখিলেন, কিন্তু যেন দেখিতে পান নাই, এইভাবে নিজের পুনরাবৃত্তিস্বরূপ কহিতে লাগিলেন, শ্রীধাম শ্রীক্ষেত্রে যখন যাই, তখন জানা অজানা কত লোকের মধ্যে গিয়েই না পড়ি। ছোঁয়াছুঁইর বিচার সেখানে নেই, করবার

কথাও কথনো মনে হয় না। কিন্তু ঘৃণার মধ্যে এর জন্ম হ'লে কি এত সহজে সে কাজ পেরে উঠতাম! এই ত আমি কারও হাতেই প্রায় খাই নি, কিন্তু পথের অতিবড় দীনদুঃখীকেও যে কথনো মনে মনে ঘৃণা করেচি—

অচলা ব্যগ্র ব্যাকুল-কণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, আমি কি আপনাকে জানি নে জ্যাঠামশাই? এত দয়া সংসারে আর কার আছে?

দয়া নয় মা, দয়া নয়—ভালবাসা। তাদেরই আমি যেন বেশি ভালবাসি। কিন্তু আসল কথা কি জানো মা, একটা জাতই বা কি, আর একটা মানুষই বা কি, ধীরে ধীরে যখন সে হীন হয়ে যায়, তখন সবচেয়ে তুচ্ছ জিনিসটার ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে সে সান্ত্বনা লাভ করে। মনে করে, এই সহজ বাধাটুকু সামলে নিয়েই সে রাতারাতি বড় হয়ে উঠবে। আমাদেরও ঠিক সেই ভাব। কিন্তু যেটা কঠিন, যেটা মূল শিকড়—

কথাটা শেষ করিবার আর সময় পাইলেন না। সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইতেই সুরেশকে দেখিতে পাইয়া একেবারেই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, আচ্ছা সুরেশবাবু, আপনি ত হিন্দু, আপনি ত আমাদের জাতিভেদ মানেন?

সুরেশ থতমত খাইয়া গেল—এ আবার কি প্রশ্ন! যে চোরা-বালির উপর দিয়া তাহারা পথ চলিয়াছে, তাহাকে প্রতি হাত যাচাই না করিয়া হঠাৎ পা বাড়াইলে যে কোন্ অতলের মধ্যে তলাইয়া যাইবে, তাহার ত স্থিরতাই নাই। এখানে সত্যটাই সত্য কি না সাবধানে হিসাব করিতে হয়। তাই সে ভয়ে ভয়ে কাছে আসিয়া একবার অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মুখ দেখিতে পাইল না। তখন শুষ্ক একটু হাসিয়া দ্বিধা-জড়িত স্বরে কহিল, আমরা কি, সে ত আপনি বেশ জানেন রামবাবু।

রামবাবু কহিলেন, বেশ জানি বলেই ত জানতাম। কিন্তু আপনার গৃহিণীটি যে একেবারে আগাগোড়া ওলট্-পালট্ ক'রে দিতে চাচ্চেন। বল্‌চেন, জাতি-ভেদের মত এত বড় অন্যায়, এত বড় সর্ব্বনাশকে তিনি কিছুতেই স্বীকার কর্‌তে পারেন না, ম্লেচ্ছর অন্ন আহার কর্‌তেও তাঁর আপত্তি নেই এবং এ শিক্ষা জন্মকাল থেকে তাঁর ব্রাহ্ম বাবার কাছেই পেয়েছেন। ওঁর হাতে খেয়ে আজ আমার জাত গেছে কি না এবং একটা প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন কিনা, এতক্ষণ সেই কথাই হচ্ছিল। আপনি কি বলেন?

সুরেশ নির্ব্বাক্! অচলার মেজাজ তাহার অবিদিতও নয় এবং সেখানে বিদ্রোহের অগ্নি যে অহরহ জ্বলিয়াই আছে, এ খবরও তাহার নূতন নয়! কিন্তু সেই আগুন আজ অকস্মাৎ যে কি জন্য এবং কোথা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, ইহাই অনুমান করিতে না পারিয়া সে আশঙ্কায় ও উদ্বেগে শুষ্ক হইয়া উঠিল; কিন্তু ক্ষণেক পরেই আত্মসংবরণ করিয়া পূর্ব্বের মত আবার একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবার চেষ্টাটা শুধু হাসিকে আচ্ছন্ন করিয়া মুখখানাকে বিকৃত করিল মাত্র।

সুরেশ বলিল, উনি আপনাকে তামাসা কর্‌চেন।

রামবাবু গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, উচিত না হ'লেও এ কথা ভাবতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু স্বামীর কল্যাণেও যখন হিন্দু ঘরের মেয়ে তাঁর কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে চাইলেন না—তুলসী দেওয়ার দিনটাতেও কিছুতে উপবাস কর্‌লেন না—ভাল, এ যদি তামাসা হয় ত কিছু কঠিন তামাসা বটে! আচ্ছা সুরেশবাবু, বিবাহ ত আপনার হিন্দু মতেই হয়েছিল?

সুরেশ কহিল, হ্যাঁ।

বৃদ্ধ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, তা আমি জানি। অচলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, যদিচ তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার

আছে মা, কিন্তু তোমার বাবার ব্রাহ্ম হওয়ায় আর কোন দুঃখ নাই। এমন ব্রাহ্ম আমি অনেক জানি, যাঁরা সমাজে গিয়েও চোখ বোজেন, অল্প-স্বল্প অনাচারও করেন, কিন্তু মেয়ের বিয়ের বেলা আর হিসাবের গোল করেন না। যাক্, আমার একটা ভাবনা দূর হ'ল।

কিন্তু তাঁহার অপেক্ষাও অনেক বেশি ভাবনা দূর হইয়া গেল সুরেশের। সে তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি ঠিক বলেছেন রামবাবু, আজকাল এই দলের লোকই বেশি। তাঁরা—

হঠাৎ উভয়েই চমকিয়া উঠিল। কথার মাঝখানেই অচলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ঠিক যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সে সুরেশের মুখের উপর দুই চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, এত অপরাধের পরেও তোমার অপরাধ বাড়াতে লজ্জা হয় না? আবার তা আমারই মুখের উপরে? তুমি জানো, এ সব মিথ্যে? তুমি জানো, বাবা ঠক নন, তিনি মনে জ্ঞানে যথার্থ ই ব্রাহ্ম সমাজের। তুমি জানো, তিনি—, বলিতে বলিতেই সে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুরেশ প্রথমটা থতমত খাইল, কিন্তু ঘাড় ফিরাইয়া বৃদ্ধের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের প্রতি চাহিয়া অকস্মাৎ সেও যেন জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, মিছে কথা কিসের? তোমার বাবা কি হিন্দু-ঘরে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী ছিলেন না? তুমিও সত্যি কথা বলো!

অচলা আর প্রত্যুত্তর দিল না। বোধ হয় মুহূর্ত্তকাল নিঃশব্দে থাকিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইল, তার পরে ধীরে ধীরে বলিল, সে কথা আজ আমাকে জিজ্ঞাসা করচ কেন? তার হেতু কি সংসারে সকলের চেয়ে বেশি তুমি নিজেই জানো না? তুমি ঠিক জানো, আমি কি, আমার বাবা কি, কিন্তু এই নিয়ে তোমার সঙ্গে বচসা করতে আমার শুধু যে প্রবৃত্তি হয় না তাই নয় আমার লজ্জা করে। তোমার যা ইচ্ছে হয়, ওঁকে বানিয়ে

বল, কিন্তু আমি শুনতে চাই নে। বল, আমি চললুম। বলিয়া সে এক-রকম দ্রুতপদেই পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণের নিমিত্ত উভয়েই যেন নিশ্চল পাথরের মত হইয়া গেল।

বৃদ্ধ বোধ করি নিতান্তই মনের ভুলে একবার তাঁর হুঁকাটার জন্য হাত বাড়াইলেন, কিন্তু তখনি হাতটা টানিয়া লইয়া একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া, একবার কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, আজকাল শরীরটা কেমন আছে সুরেশবাবু?

সুরেশ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, চকিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, বেশ আছে; বলিয়াই বোধ হয় সত্য কথাটা স্মরণ হইল, কহিল, বুকের এইখানটায় একটুখানি ব্যথা—কি জানি কাল থেকে আবার বাড়ল না—

রামবাবু বলিলেন, তবেই দেখুন দেখি সুরেশবাবু, এই ঠাণ্ডায় এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি আপনার বাইরে ঘুড়ে বেড়ান ভাল?

ঠিক ঘুরে বেড়াই নি রামবাবু! সেই বাড়িটার জন্যে আজ দুহাজার টাকা বায়না দিয়ে এলুম।

রামবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া শেষে বলিলেন, নদীর উপর বাড়িটি ভালই। কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করতেন, আমি হয় ত নিষেধ করতাম। সে দিন কথায় কথায় যেন বুঝেছিলাম, সুরমার এখানে বাস করার একান্ত অনিচ্ছা। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁর মত নিয়েছেন, না কেবল নিজের ইচ্ছেতেই কিনে বসলেন?

সুরেশ এ প্রশ্নের জবাব না দিয়া শুধু কহিল, অনিচ্ছার বিশেষ কোন হেতু দেখি নে। তা ছাড়া বাস করবার মত কিছু কিছু আসবাব-পত্রও কলকাতা থেকে আনতে দিয়েছি খুব সম্ভব কাল-পরশুর মধ্যেই এসে পড়বে।

রামবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সহসা কি ভাবিয়া ডাক দিয়া উঠিলেন, সুরমা!

অচলা সাড়া দিল না, কিন্তু ঘরের ভিতর হইতে নীরবে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে তাহার চৌকিতে আসিয়া বসিল। বৃদ্ধ স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, মা, তোমার স্বামী যে আমাদের দেশে মস্ত বড় বাড়ি কিনে ফেল্‌লেন। এই বুড়ো জ্যাঠামশাইকে আর ত ফেলে চ'লে যেতে তুমি পারবে না মা।

অচলা চুপ করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ পুনশ্চ কহিলেন, শুধু বাড়ি আর আস্‌বাবপত্র নয়, আমি জানি, গাড়ী-ঘোড়াও আস্‌চে। আর তার চেয়েও বেশি জানি, সমস্তই কেবল তোমারি জন্যে। বলিয়া তিনি সহাস্যে একবার সুরেশ ও একবার অচলার মুখের প্রতি চাহিলেন। কিন্তু সেই গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ হইতে আনন্দের এতটুকু চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। এই অস্পষ্ট আলোকে হয় ত ইহা অপরের ঠিক লক্ষ্য না পাইতেও পারিত, কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি বৃদ্ধের চক্ষু তাহা এড়াইল না। তথাপি তিনি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু মা, তোমার মতটা—

অচলা এইবার কথা কহিল, বলিল, আমার মতের ত আবশ্যক নেই জ্যাঠামশাই।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, সে কি একটা কথা মা। তুমিই ত সব, তোমার ইচ্ছাতেই ত—

অচলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না জ্যাঠামশাই, না, আমার ইচ্ছায় কিছুই আসে যায় না। আপনি সব কথা বুঝবেন না, আপনাকে বোঝাতেও আমি পারব না—কিন্তু আর আমাকে দরকার না থাকে ত আমি যাই—

বৃদ্ধের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না এবং তাহার আবশ্যকও হয় ইল না, সহসা হিন্দুস্থানী দাসী একটা কড়ায় এক কড়া আগুন লইয়া

উপস্থিত হইবামাত্র সকলের দৃষ্টি তাহারই উপর গিয়া পড়িল। রামবাবু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন; সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, আমি বেহারাটাকে আন্‌তে হুকুম দিয়েছিলুম, সে আবার, আর একজনকে হুকুম দিয়েছে দেখ্‌ছি। আমার এই ব্যথাটায় একটু—

অগ্নির প্রয়োজনের আর বিশদ ব্যাখ্যা করিতে হইল না, কিন্তু তাহার জন্য ত আর এক জন চাই। রামবাবু অচলার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সে নিমিষে মুখ ফিরাইয়া লইয়া শ্রান্ত কণ্ঠে বলিল, আমার ভারি ঘুম পেয়েছে জ্যাঠামশাই, আমি চল্‌লুম। বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা-মাত্র না করিয়া চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই তাহার কপাট রুদ্ধ হওয়ার শব্দ আসিয়া পৌঁছিল।

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং দাসীর হাত হইতে আগুনের মালসাটা নিজের হাতে লইয়া বলিলেন, তা হ'লে চলুন সুরেশবাবু—

আপনি?

হাঁ, আমিই। এ নূতন নয়, এ কাজ এ জীবনে অনেক হয়ে গেছে; বলিয়া এক প্রকার জোর করিয়াই তাহাকে তাহার ঘরে টানিয়া লইয়া গেলেন এবং মালসাটা ঘরের মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া তাহার শুষ্ক ম্লান মুখের প্রতি ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া আর্দ্র-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, না সুরেশবাবু, না, এ কোনমতেই চল্‌তে পারে না—কোনমতেই না। আমি নিশ্চয় জান্‌চি, কি একটা হয়েছে—আমি একবার আপনার; কিন্তু থাক্‌ সে কথা—যদি প্রয়োজন হয় ত এ বুড়ো আর একবার—, বলিয়া তিনি সহসা নীরব হইলেন।

সুরেশ একটি কথাও কহিতে পারিল না। কিন্তু ছেলেমানুষের মত প্রথমটা তাহার ওষ্ঠাধর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল, তার পর চোখের জল গোপন করিতে মুখ ফিরাইল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

একটা কোচের উপর সুরেশ চক্ষু মুদিয়া শুইয়া ছিল এবং সন্নিকটে একখানা চৌকি টানিয়া বৃদ্ধ রামবাবু তাহার পীড়িত বক্ষে অগ্নির উত্তাপ দিতেছিল, এমন সময়ে উভয়েই দ্বার খোলার শব্দে চাহিয়া দেখিলেন, অচলা প্রবেশ করিতেছে। সে বিনা আড়ম্বরে কহিল, রাত অনেক হয়েছে জ্যাঠামশাই, আপনি শুতে যান।

সেই জন্যেই ত অপেক্ষা ক'রে আছি মা, বলিয়া বৃদ্ধ চট্‌ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, এবং সুরেশকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এতক্ষণ দুজনেরই শুধু কেবল বিড়ম্বনা ভোগ হ'ল বৈ ত নয়! এ সব কাজ কি আমরা পারি? অচলার প্রতি চেয়ারটা ঈষৎ অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, যার কর্ম্ম তাকেই সাজে মা, এই নাও, ব'সো—আমি একটু হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচি। বলিয়া বৃদ্ধ বিপুল শ্রান্তির ভারে মস্ত একটা হাই তুলিয়া গোটা-দুই তুড়ি দিয়া হুঁকাটা তুলিয়া লইলেন, এবং ঘরের বাহির হইয়া সাবধানে দরজা বন্ধ করিতে করিতে সহাস্যে কহিলেন, ঢুলতে ঢুলতে যে হাত-পা পুড়িয়ে বসি নি, সেই ভাগ্য, কি বলেন সুরেশবাবু?

সুরেশ কোন কথা কহিল না, শুধু নিমীলিত নেত্রের উপর দুই হাত যুক্ত করিয়া একটা নমস্কার করিল।

অচলা নীরবে তাঁহার পরিত্যক্ত আসনটি অধিকার করিয়া বসিল এবং সেক দিবার ফ্লানেলটা উত্তপ্ত করিতে করিতে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আবার ব্যথা হ'লো কেন? কোন্‌খানটায় বোধ হচ্ছে?

সুরেশ চোখ মেলিল না, উত্তর দিল না, শুধু হাত তুলিয়া বক্ষের বাম দিক্‌টা নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। আবার সমস্ত নিস্তব্ধ। সে এম্‌নি যে, মনে হইতে লাগিল, বুঝিবা এই নির্ব্বাক অভিনয়ের শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত এম্‌নি নীরবেই সমাপ্ত হইবে। কিন্তু সেরূপ ঘটিল না।

সহসা অচলার ফ্লানেলশুদ্ধ হাতখানা সুরেশ তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। অচলার মুখের উপর উদ্বেগের কোন চিহ্ন প্রকাশ পাইল না, সে ইহাই যেন প্রত্যাশা করিতেছিল, কেবল কহিল, ছাড়ো, তারও একটু সেক দিয়ে দিই।

সুরেশ হাত ছাড়িয়া দিল, কিন্তু চক্ষের পলকে উঠিয়া বসিয়া দুই ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া অচলাকে তাহার আসন হইতে টানিয়া আনিয়া নিজের বুকের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া ফেলিল। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যেমন মনে হইয়াছিল এই আবেগ-উচ্ছ্বাসহীন নাটকের পরিসমাপ্তি হয় ত এমনি নিস্পন্দ মৌনতার ভিতর দিয়াই ঘটিবে, কিন্তু নিমেষ না গত হইতেই আবার বোধ হইতে লাগিল, এই উন্মত্ত নির্লজ্জতার বুঝি সীমা নাই, শেষ নাই, সর্ব্বদিক, সর্ব্বকাল ব্যাপিয়াই এই মত্ততা চিরদিন বুঝি এমনি অনন্ত ও অক্ষয় হইয়া রহিবে—কোন দিন কোন যুগেও ইহার আর বিরাম মিলিবে না, বিচ্ছেদ ঘটিবে না।

অচলা বাধা দিল না, জোর করিল না; মনে হইল, ইহার জন্যও সে প্রস্তুত হইয়াই ছিল, শুধু কেবল তাহার শান্ত মুখখানা একেবারে পাথরের মত শীতল ও কঠোর হইয়া উঠিল। সুরেশের চৈতন্য ছিল না—বোধ হয় সৃষ্টির কঠিনতম তমিস্রায় তাহার দুই চক্ষু একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, না হইলে এ মুখ-চুম্বন করার লজ্জা ও অপমান আজ তাহার কাছে ধরা পড়িতেও পারিত। ধরা পড়িল না সত্য কিন্তু শুদ্ধমাত্র শ্রান্তিতেই বোধ করি এই উন্মাদ যখন স্থির হইয়া আসিল, তখন অচলা ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া আপনার জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

আরও ক্ষণকাল দুজনেরই যখন চুপ করিয়া কাটিল, তখন সুরেশ অকস্মাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, অচলা, এমন করে আর

আমাদের কত দিন কাটবে? বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই কহিতে লাগিল, তোমার কষ্ট আমি জানি, কিন্তু আমার দুঃখটাও একবার ভেবে দেখ। আমি যে গেলুম।

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়াই অচলা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এখানে বাড়ি কিনেছ?

সুরেশ বিপুল আগ্রহে বলিয়া উঠিল, সে ত তোমারই জন্য অচলা।

অচলা ইহার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, আসবাব-পত্র, গাড়ী-ঘোড়া তাও কি কিনতে পাঠিয়েচ?

সুরেশ তেমনি করিয়াই উত্তর দিল, কিন্তু সমস্তই ত তোমারই জন্যে।

অচলা নীরব হইয়া রহিল। এ সকলে তাহার কি প্রয়োজন, এ সকল সে চায় কি না—ওই লোকটার কাছে এ প্রশ্ন করার মত নিজের প্রতি বিদ্রূপ আর কি আছে? তাই এ সম্বন্ধে আর কোন কথা না কহিয়া মৌন হইয়া রহিল। মুহূর্তকয়েক পরে জিজ্ঞাসা করিল, রামবাবুর কাছে কি তুমি আমার বাবার নাম করেচ। বাড়ি কোথায় বলেচ।

সুরেশ বলিল, না।

আর কি সেক দেবার দরকার আছে।

না।

তা হ'লে এখন আমি চললুম। আমার বড় ঘুম পাচ্চে। বলিয়া অচলা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আগুনের পাত্রটা সরাইয়া রাখিয়া ঘরের বাহির হইয়া কপাট বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেই সুরেশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, আজ আর একটা কথা ব'লে যাও অচলা। তুমি কি আর কোথাও যেতে চাও? সত্যি বলো?

অচলা কহিল, সে কোথায়?

সুরেশ বলিল, যেখানে হোক। যেখানে আমাদের কেউ চেনে না কেউ জানে না—তেমন কোন দেশে। সে দেশ যত—

আগ্রহে, আবেশে সুরেশের কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল, অচলা তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু নিজে সে একান্ত স্বাভাবিক ও সরল গলায় আস্তে আস্তে জবাব দিল, এ দেশেও ত আমাদের কেউ চিন্‌ত না। আজও ত আমাদের কেউ চেনে না।

সুরেশ উৎসাহ পাইয়া বলিতে গেল, কিন্তু ক্রমশঃ—

অচলা বাধা দিয়া কহিল, ক্রমশঃ জান্‌তে পারবে? খুব সম্ভব পারবে, কিন্তু সে সম্ভাবনা ত অন্য দেশেও আছে।

সুরেশ উল্লাসে চঞ্চল হইয়া বলিতে লাগিল, তা হ'লে এখানেই স্থির। এখানেই তোমার সম্মতি আছে, বল অচলা? একবার স্পষ্ট ক'রে বলে দাও—, বলিতে বলিতে কিসে যেন তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। কিন্তু ব্যগ্র পদ মেঝের উপর দিয়াই সে সহসা স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া দেখিল, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া অচলা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

কয়েক দিন হইতে আকাশে মেঘের আনাগোনা সুরু হইয়া এক ঝড় বৃষ্টির সূচনা করিতেছিল। সুরেশের নূতন বাটীতে অপর্য্যাপ্ত আসবাব ও সাজ সরঞ্জাম কলিকাতা হইতে আসিয়া গাদা হইয়া পড়িয়া আছে; তাহাদিগকে সাজাইয়া-গুছাইয়া লইবার দিকে কোন পক্ষেরই কোন গা নাই। একযোড়া বড় ঘোড়া ও একখানা অতিশয় দামী গাড়ী পরশু আসিয়া পর্য্যন্ত কোন্ একটা আস্তাবলে সহিস-কোচ্‌মানের জিম্মায় রহিয়াছে, কেহই খোঁজ লয় না। দিনগুলা যেমন তেমন করিয়া কাটিয়া চলিয়াছে, এমন সময় একদিন দুপুর-বেলায় বৃদ্ধ রামবাবু এক হাতে হুঁকা এবং অপর হাতে একখানি নীলরঙের চিঠি লইয়া উপস্থিত হইলেন। অচলা রেলিঙের পার্শ্বে বেতের সোফার উপর অর্দ্ধশায়িত-ভাবে পড়িয়া একখানা বাঙলা মাসিকের বিজ্ঞাপন পড়িতেছিল, জ্যাঠামশাইকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। রামবাবু চিঠিখানা অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, এই নাও সুরমা, তোমার রাক্ষুসীর পত্র। সে

তাহাকেই অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধ রামবাবু যখন সম্মুখের আসন গ্রহণ করিয়া বসিলেন তখন সমস্তটাই অদ্ভুত স্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল। তাহার আচ্ছন্ন দৃষ্টি গাড়ীর যে অংশটার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিল তাহাই বোধ হইল, এ কেবল বহুমূল্য নয়, এ শুধু ধনবানের অর্থের দম্ভ নয়, ইহার প্রতি বিন্দুটি যেন কাহার সীমাহীন প্রেম দিয়া গড়া।

কঠিন পাথরের রাস্তার উপর চার ঘোড়া খুরের প্রতিধ্বনি তুলিয়া জুড়ি ছুটিল, কিন্তু অচলার কানের মধ্যে তাহা শুধু অস্পষ্ট হইয়া প্রবেশ করিল। তাহার সমস্ত অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয় হয় ত শেষ পর্য্যন্ত এমন অভিভূত হইয়াই থাকিত, কিন্তু সহসা রামবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া উঠিল। তিনি সম্মুখের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, মা, ওই তোমার বাড়ি দেখা যায়। লোকজন দাসদাসী সবই নিযুক্ত করা হয়ে গেছে, মোটামুটি সাজানো-গোছানোর কাজও বোধ করি এতক্ষণে অনেক এগিয়ে এলো, শুধু তোমাদের শোবার ঘরটিতে মা, আমি কাউকে হাত দিতে মানা করে দিয়েছি। তাঁর যাবার সময় ব'লে দিলাম, সুরেশবাবু, বাড়ির আর যেখানে যা খুসি করুন গে, আমি গ্রাহ্য করি নে, শুধু মায়ের ঘরটিতে কাজ ক'রে মায়ের আমার কাজ বাড়িয়ে দেবেন না। এই বলিয়া বৃদ্ধ একখানি সলজ্জ হাসিমুখের আশায় চোখ তুলিয়াই একেবারে চুপ করিয়া গেলেন।

তিনি কেন যে এমন করিয়া থামিয়া গেলেন, অচলা তাহা সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিল, তাই যতক্ষণ না গাড়ী নূতন বাঙলার দরজায় আসিয়া পৌঁছিল, ততক্ষণ সে তাহার শুষ্ক বিবর্ণ মুখখানা বাহিরের দিকে ফিরাইয়া এই বৃদ্ধের বিস্মিত দৃষ্টি গোপন করিয়া রাখিল।

গাড়ীর শব্দে সুরেশ বাহিরে আসিল, দাসদাসীরাও কাজ ফেলিয়া অন্তরাল হইতে সভয়ে তাহাদের নূতন গৃহিণীকে দেখিতে আসিল; কিন্তু সে মুখের প্রতি চাহিয়া কেহই কোন উৎসাহ পাইল না।

রামবাবুর সঙ্গে সঙ্গে অচলা নীরবে নামিয়া আসিল, সুরেশের প্রতি একবার সে মুখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিল না; তার পরে তিন জনেই নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এই নূতন বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার ভিতরে-বাহিরে উপরে-নিচে কোথাও যে আনন্দের লেশমাত্র আভাস আছে, তাহা ক্ষণকালের নিমিত্ত কোন দিকে চাহিয়া কাহার চক্ষে পড়িল না।

ষড়্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কিন্তু ইহার মধ্যে ভুল যে কত বড় ছিল, তাহাও প্রকাশ পাইতে বিলম্ব ঘটিল না। বাটী সাজাইবার কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া এই সকল অত্যন্ত মহার্ঘ্য ও অপর্য্যাপ্ত উপকরণরাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া তাই সকল চিন্তাকে ছাপাইয়া একটি চিন্তা সকলের মনে বার বার ঘা দিতে লাগিল যে, যাহার টাকা আছে সে খরচ করিয়াছে, এ একটা পুরাতন কথা বটে; কিন্তু এ ত শুধু তাই নয়। এ যেন একজনকে আরাম ও আনন্দ দিবার জন্য আর একজনের ব্যাকুলতার অন্ত নাই। কাজের ভিড়ের মধ্যে, জিনিসপত্র নাড়ানাড়ির মধ্যে সাধারণ কথাবার্ত্তা অনেক হইল, চোখাচোখি অনেকবার হইল, কিন্তু সকলের ভিতর হইতেই একটা অনুচ্চারিত বাক্য, অপ্রকাশ্য ইঙ্গিত রহিয়া রহিয়া কেবল এই দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে লাগিল।

বাড়িটার ধোয়া-মোছার কাজ শেষ হয় নাই। সুতরাং ইহাকে কতকটা বাসোপযোগী করিয়া লইতেই সারা বেলাটা গেল। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হইয়া তিনজনেই যখন বাড়ি ফিরিবার জন্য গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন, তখন রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে। একটা বাতাস উঠিয়া সুমুখের কতকটা আকাশ স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছিল, শুধু মাঝে মাঝে একটা ধূসর-

রঙের খণ্ড মেঘ এক দিগন্ত হইতে আসিয়া নদী পার হইয়া আর এক দিগন্তে ভাসিয়া চলিয়াছিল এবং তাহারই ফাঁকে ফাঁকে কভু উজ্জ্বল, কভু ম্লান জ্যোৎস্নার ধারা যেন সপ্তমীর বাঁকা চাঁদ হইতে চারিদিকের প্রান্তর ও গাছ-পালার উপর ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। এই সৌন্দর্য্য দুচক্ষু ভরিয়া গ্রহণ করিতে বৃদ্ধ রামবাবু জানালার বাহিরে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু যাহারা বৃদ্ধ নয়, প্রকৃতির সমস্ত রস, সমস্ত মাধুর্য্য উপভোগ করিবারই যাহাদের বয়স, তাহারাই কেবল গাড়ীর দুই-গদী-আঁটা কোণে মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

অনেক দিন পূর্ব্বেকার একটা স্মৃতি অচলার মনের মধ্যে একেবারে ঝাপসা হইয়া গিয়াছিল, অনেক দিন পরে আজ আবার তাহাই মনে পড়িতে লাগিল—যে দিন সুরেশের কলিকাতার বাটী হইতে তাহারা এমনি এক সন্ধ্যা-বেলায় এমনি গাড়ী করিয়াই ফিরিতেছিল। যে দিন তাহার সম্পদ ও সম্ভোগের বিপুল আয়োজন মহিমের নিকট হইতে তাহার অতৃপ্ত মনটাকে বহুদূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। যে দিন এই সুরেশের হাতেই আত্মসমর্পণ করা একান্ত অসঙ্গত বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় নাই—বহু কাল পরে কেন যে সহসা আজ সেই কথাটাই স্মরণ হইল, ভাবিতে গিয়া নিজের অন্তরের নিগূঢ় ছবিটা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া যেন লজ্জার ঝড় বহিতে লাগিল।

লজ্জা!, লজ্জা! লজ্জা! এই গাড়ী, ওই বাড়ি ও তাহার কত কি আয়োজন সমস্তই তাহার—সমস্তই তাহার স্বামীর আদরের উপহার বলিয়া এক দিন সবাই জানিল; আবার একদিন আসিবে, যখন সবাই জানিবে ইহাতে তাহার সত্যকার অধিকার কাণা-কড়ির ছিল না—ইহার আগা-গোড়াই মিথ্যা! সে দিন লজ্জা সে রাখিবে কোথায়? অথচ আজিকার জন্য এ কথা কিছুতেই মিথ্যা নয় যে, ইহার সবটুকুই শুদ্ধ মাত্র তাহারই

পূজার নিমিত্ত সযত্নে আহরিত হইয়াছে এবং ইহার আগাগোড়াই স্নেহ দিয়া, প্রেম দিয়া, আদর দিয়া মণ্ডিত! এই যে মস্ত জুড়ি দিগ্বিদিক্ কাঁপাইয়া তাহাকে বহন করিয়া ছুটিয়াছে, ইহার সুকোমল স্পর্শের সুখ, ইহার নিস্তরঙ্গ অবাধ গতির আনন্দ—সমস্তই আজ তাহার! আজ যে কেবল তাহারই মুখ চাহিয়া ওই অগণিত দাস-দাসী আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে!

দেখিতে দেখিতে তাহার মনের মধ্য দিয়া লোভ ও ত্যাগ, লজ্জা ও গৌরব ঠিক যেন গঙ্গা-যমুনার মতই পাশাপাশি বহিতে লাগিল এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত ইহার কোনটাকে সে স্বীকার করিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি বাটী পৌঁছিয়া বৃদ্ধ রামবাবু তাঁহার সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিতে চলিয়া গেলে, সে যখন অকস্মাৎ শ্রান্তি ও মাথা-ব্যথার দোহাই দিয়া অত্যন্ত অসময়ে দ্রুতপদে গিয়া নিজের ঘরের কবাট রুদ্ধ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিল, তখন একমাত্র লজ্জা ও অপমানই যেন তাহাকে গিলিয়া ফেলিতে চাহিল। পিতার লজ্জা, স্বামীর লজ্জা, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের লজ্জা, সকলের সমবেত লজ্জাটাই কেবল চোখের উপর অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়া অপর সকল দুঃখকেই আবৃত করিয়া দিল। শুদ্ধ মাত্র এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল, এ ফাঁকি একদিন যখন ধরা পড়িবে, তখন মুখখানা লুকাইবার জায়গা পাইবে সে কোথায়?

অথচ যে সমাজ ও সংস্কারের মধ্যে সে শিশুকাল হইতে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে অজিনের শয্যা বা তরুমূলবাস কোনটাকেই কাহাকেও কামনার বস্তু বলিতে সে শুনে নাই। সেখানে প্রত্যেক চলা-ফেরা, মেলা-মেশা, আহার-বিহারের মধ্যে বিলাসিতার প্রতি বিরাগ নয়, অনুরাগকেই উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হইয়া উঠিতে দেখিয়াছে; যেখানে হিন্দুধর্ম্মের কোন আদর্শের সহিতই তাহার পরিচয় ঘটিতে পায় নাই—পরলোকের আশায় ইহলোকের সমস্ত সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত

করার নিষ্ঠুর নিষ্ঠাকে সে কোন দিন দেখিতে পায় নাই ; সে দেখিয়াছে, শুধু পরের অনুকরণে গঠিত ঘরের সমাজটাকে। যাহার প্রত্যেক নর-নারীই সংসারের আকণ্ঠ পিপাসায় দিনের পর দিন কেবল শুষ্ক হইয়াই উঠিয়াছে।

তাই এই নিরালা শয্যার মধ্যে চোখ বুজিয়া সে ঐশ্বর্য্য জিনিসটাকে কিছুই না বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না এবং চাই না, প্রয়োজন নাই, এ কথাতেও মন তাহার কোনমতেই সায় দিল না। তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কার ইহার কোনটাকেই তুচ্ছ করিবার পক্ষে অনুকূল নয়, অথচ গ্লানিতেও সমস্ত হৃদয় কাল হইয়া উঠিয়াছে। তাই যত সম্পদ, যত উপকরণ—এই দেহটাকে সর্ব্ব প্রকারে সুখে রাখিবার যত বিবিধ আয়োজন—আজ অযাচিত তাহার পদতলে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহার দুর্নিবার মোহ তাহাকে অবিশ্রান্ত এক হাতে টানিতে এবং অন্য হাতে ফেলিতে লাগিল।

অথচ দুঃখের স্বপ্নের মধ্যে যেমন একটা অপরিস্ফুট মুক্তির চেতনা সঞ্চারণ করে, তেমনি এই বোধটাও তাহার একেবারে তিরোহিত হয় নাই যে, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ যাহা ফাঁকি, ইহাই একদিন সত্য হইয়া উঠিবার পথে কোন বাধাই ছিল না। এই সুরেশই তাহার স্বামী হইতে পারিত, এবং কোন এক ভবিষ্যতে ইহা একেবারেই অস[illegible], এমন কথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না।

তাহাদের অনুরূপ সকল সমাজেই বিধবার আবার বিবাহ হয়, হিন্দু-নারীর মত কেবল একটিমাত্র লোকের কাছেই পত্নীত্বের বন্ধন ইহকাল ও পরকাল ব্যাপিয়া বহন করিয়া ফিরিবার অলঙ্ঘ্য অনুশাসন তাহাদের মানিতে হয় না ; তাই জীবনে-মরণে শুধু কেবল একজনকেই অনন্যগতি বলিয়া ভাবনা করিবার মত অবরুদ্ধ মন তাহার কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। সেই মন এক স্বামীর জীবিতকালেই অপরকে স্বামী বলিতে

অপরাধের ভারে যতই কেন মা পীড়িত, লজ্জা ও অপমানের জ্বালায় যতই না জ্বলিতে থাকুক, ধর্ম্ম ও পরকালের গদা তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিবার ভয় দেখাইতে পারিল না।

বন্ধ দরজায় ঘা দিয়া রামবাবু ডাকিয়া বলিলেন, জলস্পর্শ না ক'রে শুয়ে পড়লে মা, শরীরটা কি খুব খারাপ বোধ হচ্ছে?

অচলার চিন্তার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। হঠাৎ মনে হইল, এ যেন তাহার বাবার গলা। রাগ করিয়া অসময়ে শুইয়া পড়িলে ঠিক এমনি উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে তিনি কবাটের বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেন।

এই চিন্তাটাকে সে কিছুতেই ঠাঁই দিত না, কিন্তু এই স্নেহের আহ্বানকে সে ঠেকাইতে পারিল না, চক্ষের নিমিষে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সাড়া দিল, এবং দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই বৃদ্ধ ব্যক্তি এত দিনে অত ঘনিষ্ঠতা সত্বেও বরাবর একটা দূরত্ব রক্ষা করিয়াই চলিতেন; এ বাটীতে ইহাদের আজ শেষ দিন মনে করিয়াই বোধ হয় এক নিমিষে এই ব্যবধান অতিক্রম করিয়া গেলেন। এক হাত অচলার কাঁধের উপর রাখিয়া, অন্য হাতে তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া মুহূর্ত্ত পরেই সহাস্যে বলিলেন, বুড়ো জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দুষ্টামী মা? কিছু হয় নি, এসো, বলিয়া হাত ধরিয়া আনিয়া বারান্দার একটা চেয়ারের উপর বসাইয়া দিলেন।

অদূরে আর একটা চৌকির উপর সুরেশ বসিয়াছিল; সে মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়াই আবার মাথা হেঁট করিল। কথা ছিল, রাত্রে ধীরে-সুস্থে বসিয়া সারাদিনের কাজ-কর্ম্মের একটা আলোচনা করা হইবে, সে সেই জন্যই শুধু একাকী বসিয়া রামবাবুর ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার প্রতিই চাহিয়া বৃদ্ধ একটু হাসিয়া কহিলেন, সুরেশবাবু, আপনার ঘরের লক্ষ্মীটি ত কোন্ এক বিলিতি বাপের মেয়ে

—দিন-ক্ষণ পাঁজি-পুঁথি মানেন না। তখন আপনি নিজে মানুন, না মানুন, বিশেষ যায় আসে না—কিন্তু আমার এই তিনকুড়ি বছরের কু-সংস্কার ত যাবার নয়। কাল প্রহর-দেড়েকের ভেতরেই একটা শুভক্ষণ আছে—

সুরেশ ইঙ্গিতটা হঠাৎ বুঝিতে না পারিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইয়াই প্রশ্ন করিল, কিসের শুভক্ষণ?

রামবাবু ঠিক সোজা উত্তরটা দিতে পারিলেন না। একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, এর পরে কিন্তু সপ্তাহ-খানেকের মধ্যে পাঁজিতে আর দিন খুঁজে পেলাম না—তাই ভাবছিলাম—

কথাটা এবার সুরেশ বুঝিল বটে, কিন্তু হাঁ-না কোন প্রকার জবাব দিতে না পারিয়া সভয়ে, গোপনে একবার মুখ তুলিয়া অচলার প্রতি চাহিতে গিয়া আর চোখ নামাইতে পারিল না, দেখিল, সে দুটি স্থির দৃষ্টি তাহারই উপর নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে।

অচলা শান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, কাল সকালেই ত আমরা ও-বাড়ি যেতে পারি?

বিস্ময়াভিভূত সুরেশের মুখে এই সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর কিছুতেই বাহির হইল না। সে শুধু অনিশ্চিত কণ্ঠে কোনমতে এই কথাটাই বলিতে চাহিল যে, সে বাড়ি এখনও সম্পূর্ণ বাস করিবার মত হয় নাই। তাহার মেঝেগুলা হয় ত এখনও ভিজা, নূতন দেওয়ালগুলা হয় ত এখনও কাঁচা—হয় ত অচলার কোন একটা অসুখ-বিসুখ, না হয় ত তাহার—

কিন্তু আপত্তির তালিকাটা শেষ হইতে পাইল না। অচলা একটু যেন হাসিয়াই বলিল, তা হোক্ গে। যে দুর্দ্দিনে শিয়াল-কুকুর পর্য্যন্ত তার ঘর ছাড়তে চায় না, সে দিনেও যদি আমাকে অজানা জায়গায় গাছতলায় টেনে আনতে পেরে থাকো ত একটু ভিজে মেঝে কি একটু কাঁচা

দেয়ালের ভয়ে তোমাকে আমার জন্যে ভেবে সারা হ'তে হবে না! সে দিন যার মরণ হয় নি সে আজও বেঁচে থাক্‌বে!

রামবাবুর দিকে ফিরিয়া কহিল, আপনি একটুও ভাববেন না জ্যাঠামশাই। আমরা কাল সকালেই যেতে পারবো। আপনার ঋণ আমি জন্ম-জন্মান্তরেও শোধ কর্‌তে পারবো না জ্যাঠামশাই, আমরা কালই বিদায় হবো। বলিতে বলিতেই সে কাঁদিয়া ছুটিয়া পলাইয়া নিজের ঘরে গিয়া কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

বৃদ্ধ রামবাবু ঠিক যেন বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার বিহ্বল ব্যাকুল দৃষ্টি একবার সুরেশের আনত মুখের প্রতি, একবার ওই অবরুদ্ধ দ্বারের প্রতি চাহিয়া কেবলই এই বিফল প্রশ্ন করিতে লাগিল, এ কি হইল? কেন হইল? কেমন করিয়া সম্ভব হইল? কিন্তু অন্তর্যামী ভিন্ন এই মর্ম্মান্তিক অভিমানের আর কে উত্তর দিবে।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাত হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সেই মলিন আকাশতলে সমস্ত সংসারটাই কেমন এক প্রকার বিষণ্ণ ম্লান দেখাইতেছিল। সজ্জিত গাড়ী দ্বারে দাঁড়াইয়া; কিছু কিছু তোরঙ্গ, বিছানা প্রভৃতি তাহার মাথায় তোলা হইয়াছে; পাঁজির শুভমুহূর্ত্তে অচলা নিচে নামিয়া আসিল এবং গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে রামবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিতেই তিনি জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া বলিলেন, মা, বুড়োমানুষের মা হওয়া অনেক ল্যাঠা। একটু পায়ের ধুলো নিয়ে, আর মাইল-দুই তফাতে পালিয়েই পরিত্রাণ পাবে যেন মনে ক'রো না।

অচলা সজল চক্ষু দুটি তুলিয়া আস্তে আস্তে কহিল, আমি ত তা চাই নে জ্যাঠামশাই।

এই করুণ কথাটুকু শুনিয়া বৃদ্ধের চোখেও জল আসিয়া পড়িল। তাহার হঠাৎ মনে হইল, এই অপরিচিত মেয়েটি আবার যেন পরিচয়ের বাহিরে কত দূরেই না সরিয়া যাইতেছে। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, সে কি আমি জানি নে মা। নইলে স্বামী নিয়ে আপনার ঘরে যাচ্চো, চোখে আবার জল আসবে কেন? কিন্তু তবুও ত আট্‌কাতে পারলাম না। বলিয়া হাত দিয়া এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া আবার হাসিয়া কহিলেন, কাছে ছিলে, রাত্রি দিন উপদ্রব কর্‌তাম, এখন সেইটে পেরে উঠবো না বটে, কিন্তু এর সুদশুদ্ধ তুলে নিতেও ত্রুটি হবে না, তাও কিন্তু তুমি দেখে নিয়ো।

সুরেশ পিছনে ছিল, সে আজ এই প্রথম যথার্থ ভক্তিভরে বৃদ্ধের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিলে তিনি চুপি চুপি বলিলেন, আমার এখানে আপনি সুখে ছিলেন না, সে আমি জানি সুরেশবাবু। নিজের গৃহে এবার এইটেই যেন দূর হয়, আমি কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি।

সুরেশ কোন কথাই কহিল না, কেবল আর একবার হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল।

রামবাবু আর এক দফা আশীর্ব্বাদ করিয়া উচ্চৈস্বরে জানাইয়া দিলেন যে, তিনিও একখানা এক্কা আনিতে বলিয়া দিয়াছেন। হয় ত বা বেলা পড়িতে-না-পড়িতেই গিয়া হাজির হইবেন, কিন্তু তখন রাগ করিলে চলিবে না। এই বলিয়া পরিহাস করিতে গিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৌন হইলেন।

গাড়ী চলিয়া গেলে তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ ভালই হইল যে, ইহারা সময় থাকিতে চলিয়া গেল। এখানে শুধু যে স্থানাভাব, তাই নয়, তাঁহার বিধবা ভগিনীটির স্বভাবটিও তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। অপরের নাড়ীর খবর জানিতে তাহার কৌতূহলের অবধি নাই। সে আসিয়াই সুরমাকে কঠিন পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইবে, এবং

তাহার ফল আর যাহাই হোক, আহ্লাদ করিবার বস্তু হইবে না। এই মেয়েটির কিছুই না জানিয়াও তিনি জানিয়াছিলেন, সে সত্যসত্যই ভদ্র মহিলা। কোন একটা সুবিধার খাতিরেই সে কিছুতেই মিথ্যা বলিতে পারিবে না—সে যে ব্রাহ্ম-পিতার কন্যা, সে যে নিজেও ছোঁয়া-ছুঁয়ি ঠাকুরদেবতা মানে না, ইহার কোনটাই গোপন করিবে না। তখন এ বাটীতে যে বিপ্লব বাধিয়া যাইবে, তাহা কল্পনা করিতেও হৃৎকম্প হয়। কিন্তু ইহা ত গেল তাঁহার নিজের সুখ-সুবিধার কথা। আরও একটা ব্যাপার ছিল, যাহাকে তিনি নিজের কাছেও স্পষ্ট করিয়া লইতে চাহিতেন না। তাঁহার মেয়ে ছিল না, কিন্তু প্রথম সন্তান তাঁহার কন্যা হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আজ সে বাঁচিয়া থাকিলে অচলার জননী হইতে পারিত, সুতরাং বয়স বা চেহারার সাদৃশ্য কিছুই ছিল না। কিন্তু সেই ক্ষুধাটা যে তাঁহার কত বড় ছিল, তাহা সেই অচেনা মেয়েটিকে যে দিন পথে পথে কাঁদিয়া চিকিৎসকের অনুসন্ধান করিতে দেখিয়াছিলেন, সেই দিনই টের পাইয়াছিলেন। সে দিন মনে হইয়াছিল, সে বহুদিনের হারানো সন্তানটিকে যেন হঠাৎ খুঁজিয়া পাইয়াছেন; এবং তখন হইতে সে ক্ষমতা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অন্তরেও অনুভব করিতেন সত্য, কিন্তু কি যেন একটা গভীর রহস্য এই মেয়েটিকে ঘেরিয়া তাহাদের অগোচরে আছে; তাই থাক্—যাহা চোখের আড়ালে আছে, তাহা আড়ালেই থাকুক, চেষ্টা করিয়া তাহাকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া আর কাজ নাই।

এক দিন রাক্ষুসী একটুমাত্র আভাস দিয়াছিল যে, বোধ হয় ভিতরে একটা পারিবারিক বিবাদ আছে—বোধ হয় কলহ করিয়াই সুরেশবাবু স্ত্রী লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ যে দিন অচলা আপনাকে ব্রাহ্মমহিলা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল, অথচ সুরেশের কণ্ঠে ইতিপূর্ব্বেই যজ্ঞোপবীত দেখা গিয়াছিল, সে দিন বৃদ্ধ চমকিত হইয়াছিলেন, আঘাত

পাইয়াছিলেন, কিন্তু মনে মনে এই গুপ্ত রহস্যের যেন একটা হেতু খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন ; সে দিন নিশ্চয়ই মনে হইয়াছিল, সুরেশ ব্রাহ্মঘরে বিবাহ করিয়াই এই বিপত্তি ঘটাইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ এই বিশ্বাসই তাঁহার মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

এই বৃদ্ধ লোকটি সত্যই হিন্দু ছিলেন, তাই হিন্দুধর্ম্মের নিষ্ঠাকেই তিনি পাইয়াছিলেন, ইহার নিষ্ঠুরতাকে পান নাই। ব্রাহ্মণ-সন্তান সুরেশের এই দুর্গতি না ঘটিলেই তিনি খুসী হইতেন, কিন্তু এই যে ভালবাসার বিবাহ, এই যে আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদ, এই যে লুকোচুরি, ইহার সৌন্দর্য্য, ইহার মাধুর্য্য ভিতরে ভিতরে তাঁহাকে ভারি মুগ্ধ করিত। ইহাকে না জানিয়া প্রশ্রয় দিতে যেন সমস্ত মন তাঁহার রসে ডুবিয়া যাইত। তাই যখনই এই দুটি বিদ্রোহী প্রণয়ীর প্রণয়-অভিমান তাঁহার কাছে মাঝে মাঝে মনোমালিন্যের আকারে প্রকাশ পাইত, তখন অতিশয় ব্যথার সহিত তাঁহার এই কথাটাই মনে হইত, পরগৃহের অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সঙ্কুচিত গণ্ডীর মধ্যে যে মিলন কেবল ঠোকাঠুকি খাইতেছে, তাহাই হয় ত নিজের বাটীর স্বাধীন ও প্রশস্ত অবকাশে সংসারের অসংখ্য কাজে ও অকাজে শান্তি ও সামঞ্জস্যে স্থিতিলাভ করিবে।

তাঁহার স্নানের সময় হইয়াছিল, গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া নদীর পথে অগ্রসর হইয়া চলিতে চলিতে মনে মনে হাসিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, মা, যাবার সময় এই বুড়োটার উপর বড় অভিমান করেই গেলে। ভাবলে, আপনার লোকের খাতিরে জ্যাঠামশাই আমাদের বাড়িতে জায়গা দিলে না! কিন্তু দু-চার দিন পরে যে দিন গিয়ে দেখতে পাবো, চোখেমুখে হাসি আর আঁটচে না, সে দিন এর শোধ নেব। সে দিন বল্‌ব, এই বুড়োটার মাথার দিব্বি রইল মা, সত্যি ক'রে বল দেখি, আগেকার রাগের মাত্রাটা এখন কতখানি আছে? দেখ্‌ব বেটী কি জবাব দেয়! বলিয়া প্রশান্ত নির্ম্মল হাস্যে তাঁহার সমস্ত মুখ

উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; তিনি মনে মনে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সুরমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কাজের ছুতা করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই থালায় সন্দেশ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া মুখ অসম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিতে লাগিল, আমার হাতের তৈরি এই মিষ্টি যদি না খান্ জ্যাঠামশাই ত সত্যিসত্যিই ভারি ঝগড়া হয়ে যাবে!

স্নানান্তে জলে দাঁড়াইয়া গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করার মাঝে মাঝেও মেয়েটার সেই হাসি লুকাইবার চেষ্টাকে শাক দিয়া মাছ ঢাকার সঙ্গে তুলনা করিয়া বুড়ার ভারি হাসি পাইতে লাগিল এবং অন্তরের মধ্যে যে ক্ষোভ গতরাত্রি হইতে নিরন্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল, তাহা সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া ফিরিবার পথেই কল্পনার স্নিগ্ধ বর্ষণে জুড়াইয়া জল হইয়া গেল।

কাল সকালেই সকলে পৌঁছিবেন, তার আসিয়াছে। সঙ্গে রাজকুমার নাতি এবং রাজবধূ ভাগিনেয়ীর সংস্রবে সম্ভবতঃ লোকজন কিছু বেশি আসিবে। আজ তাঁহার বাটীতে কাজ কম ছিল না। উপরন্তু আকাশের গতিকও ভাল ছিল না। কিন্তু পাছে জল আসিয়া পড়ে, পাছে যাওয়ার বিঘ্ন ঘটে, এই ভয়ে রামবাবু বেলা পড়িতে-না-পড়িতে একা ভাড়া করিয়া, বক্‌শিশের আশা দিয়া দ্রুত হাঁকাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পথেই জোলো হাওয়ার সাক্ষাৎ মিলিল এবং এ-বাটীতে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন, তখন কিছু কিছু বর্ষণও সুরু হইয়াছে।

অচলা বাহির হইয়া কহিল, এই দুর্য্যোগের মধ্যে আজ আবার কেন এলেন জ্যাঠামশাই? আর একটু হ'লেই ত ভিজে যেতেন।

তাহার মুখে বা কণ্ঠস্বরে ভাবী আনন্দের চিহ্নমাত্র না দেখিয়া বুড়ার মন দমিয়া গেল। এ জন্য তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না— কে যেন তাঁহার কল্পনার মালাটাকে একটানে ছিঁড়িয়া দিল। তথাপি

মুখের উৎসাহ বজায় রাখিয়া কহিলেন, ওরে বাস্ রে, তা হ'লে কি আর রক্ষা ছিল ; জলে ভেজাটাকে সামলাতে পারব, কিন্তু ত্যজ্যপুত্র হয়ে চিরটা কাল কে থাকবে মা ?

এই দুর্ব্বোধ মেয়েটাকে বুড়া কোন দিনই বেশ ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ কাল রাত্রির ব্যবহারে ত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার আজিকার আচরণে যেন একেবারে দিশাহারা আত্মহারা হইয়া গেলেন। সে যে কোন কালে, কোন কারণেই ওরূপ করিতে পারে, তেমন স্বপ্ন দেখাও যেন অসম্ভব। কথা ত মাত্র এইটুকু। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা ঠিক পাগল হইয়া গিয়া একেবারে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বুকের উপর উপুড় হইয়া হুহুস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, জ্যাঠামশাই, কেন আমাকে আপনি এত ভালবাসেন—আমি যে লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশে যাচ্চি।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ কোন কথা কহিতে পারিলেন না, শুধু এক হাতে তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া রাখিয়া অন্য হাতে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার স্নেহার্দ্র চিত্ত সেই সব সামাজিক অননুমোদিত বিবাহের কথা, আত্মীয়স্বজন, হয় ত বা বাপ-মায়ের সহিত বিদ্রোহ-বিচ্ছেদের কথা, বিবাদ করিয়া গৃহত্যাগের কথা—এই সকল পুরাতন, পরিচিত ও বহুবারের অভ্যস্ত ধারা ধরিয়াই যাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই আর একটা নূতন খাদ খনন করিবার কল্পনামাত্র করিল না। এমনি করিয়া এই নির্ব্বাক বৃদ্ধ ও রোরুদ্যমানা তরুণী বহুক্ষণ একভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পরে চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন, এতে আর লজ্জা কি মা! তুমি আমার মেয়ে, তুমি আমার সেই সতীলক্ষ্মী মা, অনেক কাল আগে কেবল দুদিনের জন্যে আমার কোলে এসেই চ'লে গিয়েছিলে—মায়া কাটাতে না পেরে আবার বাপের বুকে ফিরে এসেছ—আমি যে তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম সুরমা।

বলিয়া তাহাকে নিকটবর্ত্তী একটা চেয়ারে বসাইয়া নানারকমে পুনঃপুনঃ এই কথাটাই বুঝাইতে লাগিলেন যে, ইহাতে কোন লজ্জা, কোন সরম নাই। যুগে যুগে চিরদিনই ইহা হইয়া আসিতেছে। যিনি সতী, যিনি স্বয়ং আদ্যাশক্তি, তিনিও একবার স্বামীর ঘর করিতে বাঁপ-মা আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গেই ঝগড়া করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। আবার সব হইবে, সব ফিরিয়া পাইবে, আজ যাহারা বিমুখ, আবার তাহারা মুখ ফিরাইবে, আবার তাহাদের পুত্র-পুত্রবধূকে যত্নে তুলিয়া লইবে। দেখ দেখি মা, আমার এ আশীর্ব্বাদ কখনো নিষ্ফল হইবে না।

এম্‌নি কত-কি বৃদ্ধ মনের আবেগে বকিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহাতে সার যাহা ছিল, তাহা থাক্, কিন্তু তাহার ভারে যেন শ্রোতাটির আনত মাথাটি ধীরে ধীরে ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিল। চাপিয়া বৃষ্টি আসিয়াছিল। এম্‌নি সময়ে দেখিতে পাওয়া গেল, সুরেশ ভিজিয়া কাদা মাখিয়া কোথা হইতে হন্ হন্ করিয়া বাড়ি ঢুকিতেছে। দেখিবামাত্রই অচলা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া বৃষ্টির জল হাত বাড়াইয়া লইয়া অশ্রুজলের সমস্ত চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল। রামবাবু বুঝিলেন, সুরমা যে জন্যই হৌক, চোখের জলের ইতিহাসটা স্বামীর কাছে গোপন রাখিতে চায়।

সে উপরে উঠিয়া রামবাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কথাবার্ত্তা পরে হবে সুরেশবাবু, আমি পালাই নি। আপনি কাপড় ছেড়ে আসুন।

সুরেশ হাসিয়া কহিল, এ কিছুই না। বলিয়া একটা চৌকি টানিয়া বসিবার উদ্যোগ করিতেছিল, অচলা মুখ তুলিয়া চাহিল—জ্যাঠামশায়ের কথাটা শুনতে দোষ কি? এক মাস হয় নি তুমি অত বড় অসুখ থেকে উঠেছ—বার বার আমাকে আর কত শাস্তি দিতে চাও?

তাহার বাক্য ও চাহনির মধ্যে এত বড় ব্যবধান ছিল যে, দুজনেই বিস্মিত হইলেন, কিন্তু এই বিস্ময়ের স্রোতটা বহিতে লাগিল ঠিক বিপরীত মুখে। সুরেশ কোন জবাব না দিয়া নীরবে আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল আর রামবাবু বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

সেই বাহিরে বারিপাতের আর বিরাম নাই; রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, বৃষ্টির প্রকোপ যেন ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বহুদিনের আকর্ষণে ধরিত্রী শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল; মনে হইতে লাগিল, তাহার সমস্ত দীনতা, সমস্ত অভাব আজিকার এই রাত্রির মধ্যেই পরিপূর্ণ করিয়া দিতে বিধাতা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

রামবাবুর উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া অচলা আস্তে আস্তে বলিল, ফিরে যেতে বড় কষ্ট হবে জ্যাঠামশাই, আজ রাত্তিরেই কি না গেলে নয়? তিনি হাসিলেন, মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া কহিলেন, কষ্টের জন্য না হোক্, এই দুর্যোগে এই নূতন জায়গায় তোমাদের ছেড়ে আমি যেতাম না। কিন্তু কাল সকালেই যে ওঁরা সব আস্‌বেন, রাত্রির মধ্যেই আমার ত ফিরে না গেলেই নয় সুরমা। কিন্তু মনে হচ্চে, এ রকম থাক্‌বে না, ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ক'মে আসবে। আমি এই সময়টুকু অপেক্ষা ক'রে দেখি।

এই প্রসঙ্গে কাল যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁদের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া আলোচনা সংসারের দিকে, সমাজের দিকে, ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য ইহলোক পরলোক কত দিকেই না ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িল। উভয়ে এম্‌নি মগ্ন হইয়া রহিলেন যে, সময় কতক্ষণ কাটিল, রাত্রি কত হইল, কাহারও চোখেও পড়িল না। বাহিরে গর্জ্জন ও বর্ষণ উত্তরোত্তর কিরূপ নিবিড়, অন্ধকার কত দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও কেহ দৃষ্টিপাত করিল না। এই বৃদ্ধের মধ্যে যে জ্ঞান, যে ভূয়োদর্শন, যে ভক্তি সঞ্চিত ছিল, তাঁহার পরম স্নেহের পাত্রীটির কাছে তাহা অবাধে উৎসারিত হইতে পাইয়া এই কেবলমাত্র দুটি লোকের নিরালা সভাটিকে যেন

মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দিল। অচলার শুধু এই চেতনাটুকু অবশিষ্ট রহিল যে, সে এমন একটি লোকের হৃদয়ের সত্য অনুভূতির খবর পাইতেছে, যিনি নিষ্পাপ, যাঁহার স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধা সে একান্তভাবেই লাভ করিয়াছে।

হঠাৎ পদশব্দে চকিত হইয়া উভয়েই পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে। সে কহিল, মা, রাত অনেক হয়েছে, প্রায় বারোটা বাজে—আপনার খাবার কি দিয়ে যাবে?

অচলা চমকিয়া কহিল, বারোটা বাজে? বাবু?

তিনি এইমাত্র খেয়ে শুতে গেছেন।

সে যে সেই গিয়াছে, আর আসে নাই, ইহা শুধু এখনই চোখে পড়িল। অচলা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, শোবার ঘরের পর্দ্দার ফাঁক দিয়া আলো দেখা যাইতেছে। রামবাবু ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে মা, বড় অন্যায় হয়েছে। তোমাকে এমন ধ'রে রাখলাম যে, তাঁর খাওয়া হ'ল কি না, তুমি চোখে দেখতেও পেলে না। এখন যাও মা তুমি খেতে—

অচলা এ সকল কথায় বোধ হয় কান দিল না। ভৃত্যকে প্রশ্ন করিল, কোচমান গাড়ী জুতে ঠিক সময়ে আনে নি কেন?

ভৃত্য কহিল, নূতন ঘোড়া, এই ঝড়-জল অন্ধকারে বার কর্‌তে তার সাহস হয় না।

তা হ'লে আর কোন গাড়ী আনা হয় নি কেন?

ভৃত্য চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার অর্থ অপরাধ স্বীকার করা নয়, বরঞ্চ প্রতিবাদ করা যে, এ হুকুম ত তাহারা পায় নাই।

রামবাবু উৎকণ্ঠার পরিবর্ত্তে লজ্জা পাইয়াই ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, গাড়ীর আবশ্যক নেই—না গেলেও ক্ষতি নেই—কেবল প্রত্যূষে ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হ'তে পারলেই চলবে। আমি রাত্রে কিছুই

খাই নে, আমার সে ঝঞ্ঝাটও নেই—শুধু তুমি দুটি খেয়ে নিয়ে শুতে যাও মা, কথায় কথায় বড্ড রাত হয়ে গেছে—বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। এই বলিয়া একরকম জোর করিয়াই তাহাকে নিচে খাইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং মিনিট-পনের পরে সে উপরে ফিরিয়া আসিতেই ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়া বলিতে লাগিলেন, আর এক মিনিট দেরি নয় মা, তুমি শুতে যাও। আমি এই বসবার ঘরের কোচখানার উপর দিব্যি শুতে পারব, আমার কোন কষ্ট, কোন অসুবিধা হবে না—শুধু তুমি শুতে যাও সুরমা, আমি দেখি।

বৃদ্ধের সনির্ব্বন্ধ আবেদন ও নিবেদন এবং পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা অচলাকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। যে মিথ্যা সম্মান, প্রীতি ও শ্রদ্ধা সে তাহার এই নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষা পিতৃব্যসম বৃদ্ধের নিকট হইতে এতকাল শুধু প্রতারণার দ্বারাই পাইয়া আসিয়াছে, সেই লোভই এই তাহার একান্ত দুঃসময়ে কণ্ঠরোধ করিয়া অপ্রতিহত বলে সুরেশের এই নির্জ্জন শয়ন-মন্দিরের দিকে ঠেলিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, এমনি এক ঝড়-জল-দুর্দ্দিনের রাত্রিই একদিন তাহাকে স্বামিহারা করিয়াছিল, আজ আবার তেমনি এক দুর্দ্দিনের দুরতিক্রম্য অভিশাপ তাহাকে চিরদিনের মত সীমাহীন অন্ধকারে ডুবাইতে উদ্যত হইয়াছে। কাল অসহ্য অপমানে, লজ্জার গভীরতম পঙ্কে তাহার আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া যাইবে, ইহা সে চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, কিন্তু তবুও আজিকার মত ওই মিথ্যাটাই জয়মাল্য করিয়া তাহাকে কোনমতেই সত্য প্রকাশ করিতে দিল না। আজ জীবনের এই চরম মুহূর্ত্তে অভিমান ও মোহই তাহার চিরজয়ী হইয়া রহিল। সে বাধা দিল না, কথা কহিল না, একবার পিছনে চাহিয়াও দেখিল না—নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সুরেশের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

বাহিরের মত্ত প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল, প্রগাঢ়

অন্ধকারে বিদ্যুৎ তেমনি হাসিয়া হাসিয়া উঠিতে লাগিল, সারারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।

নূতন স্থানে রামবাবুর সুনিদ্রা হয় নাই, বিশেষতঃ মনের মধ্যে চিন্তা থাকায় অতি প্রত্যুষেই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বৃষ্টি থামিয়াছে বটে, কিন্তু ঘোর কাটে নাই। চাকরেরা কেহ উঠিয়াছে কি না, দেখিবার জন্য বারান্দার এক প্রান্তে আসিয়া হঠাৎ চমকিয়া গেলেন। কে যেন টেবিলে মাথা পাতিয়া চেয়ারে বসিয়া আছে। কাছে আসিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, সুরমা, তুমি যে? এত ভোরে উঠেছ কেন মা?

সুরমা একবারমাত্র মুখ তুলিয়াই আবার তেমনি করিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিল। তাহার মুখ মড়ার মত শাদা, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা এবং কালো পাথরের গা দিয়া যেমন ঝরণার ধারা নামিয়া আসে, ঠিক তেমনি দুই চোখের কোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে!

বৃদ্ধ শুধু একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া একদৃষ্টে ওই অর্দ্ধমৃত নারী-দেহের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথাই তাঁহার কণ্ঠ ভেদিয়া বাহির হইতে পারিল না।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সকাল-বেলা দুটিখানি গরম মুড়ি দিয়া চা খাওয়া শেষ করিয়া কেদার-বাবু একটা পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি লইতে মৃণাল ঘরে ঢুকিতেই কহিলেন মা, তোমার এই গরম মুড়ি আর পাথরের বাটির চা'র ভেতরে যে কি অমৃত আছে জানি নে, কিন্তু এই একটা মাসের মধ্যে আর নড়তে পারলুম না।

অচলার সম্পর্কে মৃণাল তাঁহাকে বাবা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়া-

ছিল। কহিল, কেন তুমি পালাবার জন্যে এত ব্যস্ত হও বাবা, তোমার এ—আমি কি সেবা করতে জানি নে?

তোমার এ মেয়ে কি—এই কথাটাই মৃণাল অসাবধানে বলিতে গিয়াছিল; কিন্তু চাপিয়া গিয়া অন্য প্রকারে তাহা প্রকাশ করিল। তাই বোধ করি, এ ইঙ্গিত কেদারবাবু বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিলেন না। কিন্তু কণ্ঠস্বর তাঁহার সহসা করুণ হইয়া উঠিল, বলিলেন, কৈ আর পালাতে ব্যস্ত হই মা! তোমার তৈরি চা, তোমার হাতের রান্না, তোমার এই মাটীর ঘরখানি ছেড়ে আমার স্বর্গে যেতেও ইচ্ছা করে না। ওই ছোট্ট জানালার ধারটিতে ব'সে আমি কত দিন ভাবি মৃণাল, আর দুটো বৎসর যদি ভগবানের দয়ায় বাঁচতে পাই ত কল্‌কাতার মধ্যে থেকে সারাজীবন ধ'রে যত ক্ষতি নিজে করেচি, তার সবটুকু পূরণ ক'রে নেব। আর সেই মূলধনটুকু হাতে নিয়েই যেন এক দিন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি।

কত বড় বেদনার ভিতর দিয়া তিনি এই কথাগুলি বলিলেন, এবং কিরূপ মর্ম্মান্তিক লজ্জায় কলিকাতার আজন্ম পরিচিত পল্লী ও বাসভবন ছাড়িয়া, চিরদিনের আশ্রিত-সমাজ ত্যাগ করিয়া এই বনের মধ্যে পর্ণ-কুটীরে বাকি দিনগুলা কাটাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন, মৃণাল তাহা বুঝিল, এবং সেই জন্যই কোন উত্তর না দিয়া চায়ের বাটিটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

এইখানে একটু গোড়ার কথা প্রকাশ করিয়া বলা আবশ্যক। প্রায় মাস-খানেক হইল, কেদারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং সেই অবধি আর ফিরিতে পারেন নাই। মহিমের অসুখের সময় সুরেশের কলিকাতার বাটীতে এই বিধবা মেয়েটির সহিত তিনি প্রথম পরিচিত হন, কিন্তু এখানে তাহার নিজের বাটীতে আসিয়া যে পরিচয় ইহার পাইলেন, তাহাতে তাহার সমস্ত দেহ-মন যেন সোনার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া গেল।

এই বন্ধন হইতেই বৃদ্ধ কোনমতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ অন্যত্র কত কাজই না তাঁহার বাকি পড়িয়া আছে!

মহিমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই! তাঁহার আসার সংবাদ পাইয়াই সে ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যায়। যাবার সময় মৃণাল ধরিয়া রাখিতে টানাটানি করে নাই, কারণ শিশুকাল হইতে সেজদার সংযম ও সহিষ্ণুতার প্রতি, বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি তাহার এত অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, সে নিশ্চয় বুঝিয়াছিল, অচলার সহিত দেখা করা এখন উচিত নয় বলিয়াই কেবল মহিম এমন করিয়া পলায়ন করিতেছে। সে মনে করিয়াছিল, তাহার পত্র পাইয়াই কেদারবাবু কন্যা-জামাতার একটা মিট্‌মাট্‌ করিয়া দিতে এরূপ তাড়াতাড়ি করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। কিন্তু আসিলেন তিনি একাকী।

আজিও পরিষ্কার কিছুই হয় নাই, শুধু সংশয়ের বোঝায় উত্তরোত্তর ভারাক্রান্ত দিনগুলি একটির পর একটি করিয়া নীরবে বহিয়াছে। কেবল উপরের দিকে চাহিয়া একটু বুঝা গিয়াছে যে আকাশে দুর্ভেদ্য মেঘের স্তর যদি কোন দিন কাটে ত কাটিতে পারে, কিন্তু তাহার পিছনে অন্ধকারই সঞ্চিত হইয়া আছে, চাঁদের জ্যোৎস্না নাই।

সুরেশের পিসিমা নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া মৃণালকে পত্র লিখিয়াছেন, সে পত্র কেদারবাবুর হাতে পড়িয়াছে। মহিম কোন একটা বড় জমিদার-সরকারে গৃহ-শিক্ষকের কর্ম্ম লইয়াছে জানাইয়া যে সংবাদ দিয়াছে, সে চিঠিখানিও তিনি বার বার করিয়া পাঠ করিয়াছেন, কোথাও কোন পক্ষ হইতে তাঁহার কন্যার উল্লেখমাত্র নাই, তথাপি চিঠি দুখানির প্রতি ছত্র, প্রত্যেক বর্ণ দুর্ভাগ্য পিতার কর্ণে কেবল একটা কথাই একশবার করিয়া বলিয়াছে, যাহাকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিবার মত শক্তিই তাঁহার নাই।

অচলা শুধু যে তাঁহার একমাত্র সন্তান, তাই নয়; শিশুকালে যখন

তাহার মা মরে, তখন হইতে তিনিই জননীর স্থান অধিকার করিয়া বুকে করিয়া এই মেয়েটিকে মানুষ করিয়া এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন। সেই মেয়ের গভীর অকল্যাণের শঙ্কায় তাঁহার শরীর দিন দিন শীর্ণ এবং তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ কালি হইয়া আসিতেছিল, অথচ অমঙ্গল যে পথ ইঙ্গিত করিতেছিল, সে পথ পিতার পক্ষেই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অবরুদ্ধ।

গ্রামের দুই-চারি জন বৃদ্ধ প্রতিবেশী মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিত, কিন্তু তিনি নিজে কখনও সঙ্কোচে কাহারও গৃহে যাইতেন না। মৃণাল অনুরোধ করিলে হাসিয়া বলিতেন, কাজ কি মা! আমার মত ম্লেচ্ছের কারও বাড়ি না যাওয়াই ত ভাল।

মৃণাল কহিত, তা হ'লে তাঁরাই বা আসবেন কেন? বৃদ্ধ এ কথার আর কোন জবাব না দিয়া ছাতাটি মাথায় দিয়া মাঠের পথে বাহির হইয়া পড়িতেন। সেখানে চাষীদের সঙ্গে তিনি যাচিয়া আলাপ করিতেন। তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা, গৃহস্থালীর কথা, ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্যের কথা—এম্নি কত কি আলোচনা করিতে বেলা বাড়িয়া উঠিলে তবে ঘরে ফিরিতেন। প্রত্যহ সকালে চা খাওয়ার পরে এই ছিল তাঁর কাজ।

জন্মকাল হইতে তাঁহারা চিরদিন কলিকাতাবাসী। সহরের বাহিরে যে অসংখ্য পল্লীগ্রাম, তাহার সহিত যোগসূত্র তাঁহাদের বহুপুরুষ পূর্ব্বেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—আত্মীয়-কুটুম্বও ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছে, অতএব অধিকাংশ নাগরিকের ন্যায় তিনিও যে কিছুই না জানিয়াও ইহাদের সম্বন্ধে বিবিধ অদ্ভুত ধারণা পোষণ করিবেন, তাহাও বিচিত্র নয়! যে অশিক্ষিত অগণিত কৃষিজীবী সুদূর পল্লীতেই সারা-জীবন কাটাইয়া দেয়, সহরের মুখ দেখা যাদের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে, তাহাদিগকে তিনি এক প্রকার পশু বলিয়াই জানিতেন এবং এই সমাজ-টাকেও বন্য-সমাজ বলিয়াই বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ দুর্ভাগ্য

যখন তাহার তীক্ষ্ণ বিষ-দাঁত ফুটো তাঁহার মর্ম্মের মাঝখানি বিদ্ধ করিয়া সমস্ত মনটাকে নিজের সমাজ হইতে বিমুখ করিয়া দিল, তখন যতই এই সকল লেখা-পড়া-বিহীন পল্লীবাসী দরিদ্র কৃষকদের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই এক দিকে যেমন তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল, অন্য দিকে তেমনিই তাঁহার আপনার সমাজ, তাহার আচার ও আচরণ, তাহার শিক্ষা ও সংস্কার, তাহার ধর্ম্ম, তাহার সভ্যতা, তাহার বিধি-বিধান সমস্তর বিরুদ্ধেই তাঁহার অন্তর বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

তিনি স্পষ্টই দেখিতে লাগিলেন, ইহারা লেখাপড়া না জানা সত্বেও অশিক্ষিত নয়। বহুযুগের প্রাচীন সভ্যতা আজিও ইহাদের সমাজের অস্থিমজ্জায় মিশিয়া আছে। নীতির মোটা কথাগুলা ইহারা জানে। কোন ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই ইহাদের বিদ্বেষ নাই, কারণ জগতের সকল ধর্ম্মই যে মূলে এক এবং তেত্রিশকোটী দেব-দেবীকে অমান্য না করিয়াও যে একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করা যায়, এই জ্ঞান তাহাদের আছে এবং কাহারও অপেক্ষাই কম নাই। হিন্দুর ভগবান ও মুসলমানের আল্লাই যে একই বস্তু, এ সত্যও তাহাদের অবিদিত নাই।

তাঁহার মন লজ্জা পাইয়া বার বার বলিতে থাকে, ইহারা কিসে আমাদের চেয়ে ছোট? ইহাদের চেয়ে কোন্ কথা আমি বেশি জানি? কিসের জন্য ইহাদের সমাজ, ইহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া আমরা দূরে চলিয়া গিয়াছি? আর সে দূর এতবড় দূর যে, এই সব আপন জনের কাছে আজ একেবারে ম্লেচ্ছ হইয়া উঠিয়াছি।

এমনি ধারা মন লইয়া যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, তখন বেলা প্রায় দশটা। মৃণাল আসিয়া বলিল, কাল তোমার শরীর ভাল ছিল না বাবা, আজ যেন আবার পুকুরে স্নান করতে যেয়ো না! তোমার জন্যে আমি গরম-জল ক'রে রেখেছি।

একেবারে ক'রে রেখেচ ? বলিয়া কেদারবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

স্নানান্তে মৃণাল আহ্নিক করিতে বসিয়াছিল, তাঁহার সাড়া পাইয়া এইমাত্র উঠিয়া আসিয়াছে। ভিজা চুল পিঠের উপর ছড়ান, পরণে পট্টবস্ত্র, মুখখানি প্রসন্ন, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া যেন অত্যন্ত নির্ম্মল শুচিতা বিরাজ করিতেছে—তাহার প্রতি চোখ রাখিয়া বৃদ্ধ পুনশ্চ বলিলেন, এ কষ্ট কেন করতে গেলে মা, এর ত দরকার ছিল না। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আমি ত কল্‌কাতার মানুষ, কলের জলই আমার চিরকালের অভ্যাস। কিন্তু তুমি আমাকে এমন আশ্রয় দিয়েছ মৃণাল যে, তোমার এঁদো পুকুরটা পর্য্যন্ত আমার খাতির না ক'রে পারে নি। ওর জলে আমার কোন দিন অসুখ করে না—আমি পুকুরেই নাইতে যাবো মা।

মৃণাল মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবা, সে হ'তে পারবে না। কাল তোমার অসুখ করছিল, আমি ঠিক জানি, আমি জল নিয়ে আসি গে—তুমি তেল মাখতে বসো। বলিয়া সে যাইবার উদ্যোগ করিতেই কেদারবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, সে যেন হ'লো, কিন্তু আজ এই কথাটা আমাকে বল দেখি মৃণাল, পরকে এমন সেবা করার বিদ্যাটা তুমি এটুক বয়সের মধ্যে কার কাছে কেমন ক'রে শিখলে? এমনটি যে আর আমি কোথাও দেখি নি মা।

লজ্জায় মৃণালের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, কিন্তু তুমি কি আমার পর বাবা ?

কেদারবাবু বলিলেন, না, পর নই—আমি তোমার ছেলে। কিন্তু এমন এড়িয়ে গেলেও চলবে না, জবাব আজ দিয়ে তবে যেতে পাবে।

মৃণাল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তেম্নি সলজ্জ হাসিমুখেই উত্তর দিল, এ আর কি এমন শক্ত কাজ যে, চেষ্টা ক'রে শিখতে হবে? এ ত

আমাদের জন্মকাল থেকেই শেখা হয়ে থাকে। কিন্তু তোমার জল যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে বাবা—

তা যাক্, বলিয়া কেদারবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, ঠিক এই কথা-টাই আমি কিছু দিন থেকে ভাবচি মৃণাল! মানুষ শিখে তবে সাঁতার কাটে, কিন্তু যে পাখী জলচর, সে জন্মেই সাঁতার দেয়। এই শেখাটা তার কেউ দেখতে পায় না বটে, কিন্তু কাজটাকে ফাঁকি দিয়ে কেবল ফলটুকু ত পাবার যো নেই মা? এ ত ভগবানের নিয়ম নয়। কোথাও-না-কোথাও, কোন-না-কোন আকারে শেখার দুঃখ তাকে বইতেই হবে। তাই ওই জলচরটার মত যে নীড়ের মধ্যে তুমি জন্মকাল থেকে অনায়াসেই এত বড় বিদ্যে আয়ত্ত ক'রে নিয়েচ, তোমাদের সেই বিরাট-বিপুল সমাজ-নীড়টার কথাই আমি দিন-রাত ভাবচি। আমি ভাবি এই যে—

কিন্তু তোমার জল যে একেবারে—

থাক্ না মা, জল। পুকুর ত আর শুকিয়ে যাচ্চে না। আমি ভাবি এই যে, তোমার বুড়ো ছেলেটি শিশুর মত তার মায়ের কাছে গোপনে কত কথাই শিখে নিচ্চে, সে ত আর তাঁর খবর নেই! আজও ত ঠাকুর-দেবতা, মন্ত্র-তন্ত্রে কাণা কড়ির বিশ্বাস হয় নি, কিন্তু তবু যখনি মাকে দেখি, স্নানান্তে সেই পাশুটে রঙের মটকার কাপড়খানি প'রে আহ্নিক করতে যাচ্চেন, তখনি ইচ্ছা করে, আমিও আবার পৈতে নিয়ে অমনি ক'রে কোষা-কুষি নিয়ে ব'সে যাই।

মৃণাল কহিল, কেন বাবা, তোমার নিজের ধর্ম্ম, নিজের সমাজ ছেড়ে অন্য আচার পালন করতে যাবে? তাকেও ত দোষ কেউ দিতে পারে না।

কেদারবাবু বলিলেন, কেউ পারে কি না আলাদা কথা, কিন্তু আমি তার গ্লানি করতে বসব না! সে ভাল হোক্ মন্দ হোক্, এ বয়সে

তাকে ত্যাগ করবার সামর্থ্য নেই, বদ্‌লাবারও উদ্যম নেই। এই রাস্তা ধরেই জীবনের শেষ পর্য্যন্ত চলতে হবে। কিন্তু তোমাকে যখন দেখি —যখন দেখি, এইটুকু বয়সে এত বড় আত্ম-বিসর্জ্জন, যিনি স্বর্গে গেছেন, তাঁর প্রতি এই নিষ্ঠা, তাঁর মাকেই মা জেনে—আচ্ছা, থাক, থাক, আর বলব না—কিন্তু আমিও যার মধ্যে মানুষ হয়ে বুড়ো হয়ে গেলুম মা, তাকেও ত মনে মনে তুলনা না ক'রে থাকতে পারি নে। সমাজ ছাড়া যে ধর্ম্ম, তার প্রতি আর যে আস্থা কোনমতেই টিকিয়ে রাখতে পারি নে মৃণাল।

মৃণাল মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইল। তাহার ব্যক্তিগত জীবনের দুর্ভাগ্যকে যে তিনি এমনি করিয়া নিজের সামাজিক শিক্ষাদীক্ষার উপরেই আরোপ করিবেন, ইহা তাহার কাছে অত্যন্ত অবিচার বলিয়া মনে হইল। বলিল, বাবা, ঠিক এম্‌নি ক'রে যখন আমাদের সমাজটাকে দেখতে পাবেন, তখন এর মধ্যেও অনেক ত্রুটি, অনেক দোষ আপনার চোখে পড়বে। দেখবেন আমার ও নিজেদের দোষগুলো আপনার কাঁধের বদলে সমাজের কাঁধেই তুলে দিতে ব্যস্ত। আমরাও—

কিন্তু কথাটা শেষ না হইতেই কেদারবাবু বাধা দিয়া উঠিলেন। কহিলেন, কিন্তু আমি ত ব্যস্ত নই মা! তোমাদের সমাজে থাক না দোষ, থাক্ না ত্রুটি—কিন্তু তুমি ত আছ! এইটিই যে আমি মাথা খুঁড়ে মলেও খুঁজে পাবো না।

আবার মৃণালের মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, বলিল, এমন ক'রে আমাকে যদি তুমি একশবার লজ্জা দাও বাবা, তা হ'লে এম্‌নি পালাবো যে, কিছুতেই আর আমাকে খুঁজে পাবে না, তা কিন্তু আগে থেকে ব'লে রাখছি।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ কোন কথা কহিলেন না, শুধু নিঃশব্দ ম্লানমুখে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তার পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,

আমিও তোমাকে আজ ব'লে রাখচি মা, এই কাজটিই তোমাকে কিছুতে কর্‌তে দেব না। তুমি আমার চোখের মণি, তুমি আমার মা, তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়। এই অনাথ অকর্ম্মণ্য বুড়োটার ভার থেকে ছুটী নেবার দিন যে দিন তোমার আস্‌বে মা, সে হয় ত বেশি দূরে নয়, কিন্তু সে আমাকে চোখে দেখতে হবে না, তাও আমি বেশ জানি। বলিতে বলিতেই তাহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল।

জামার হাতায় মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন, আমার একটা কাজ এখনো বাকি রয়েচে, সেটা মহিমের সঙ্গে দেখা করা! কেন সে পালিয়ে বেড়াচ্চে, একবার স্পষ্ট ক'রে তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। এমনও ত হতে পারে, সে বেঁচে নেই?

কেন বাবা, তুমি ও সব ভয় কর্‌চ?

ভয়? বৃদ্ধের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল; কহিলেন, সন্তানের মরণটাই বাপের কাছে সবচেয়ে বড় নয় মা!

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

একমাত্র কন্যার মৃত্যুর চেয়েও যে দুর্গতি পিতার চক্ষে বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আভাসমাত্রই মৃণাল কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া যখন নিঃশব্দে সরিয়া গেল, তখন এই সাধ্বী বিধবা মেয়েটির লজ্জাটা যেন ঠিক একটা মুগুরের মত কেদারবাবুর বুকে আসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি একাকী চুপ করিয়া নিজের পাকা দাড়িতে হাত বুলাইলেন, তার পরে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে তেলের বাটিটা টানিয়া লইলেন।

আজ সকাল-বেলাটা বেশ পরিষ্কার ছিল, কিন্তু মধ্যাহ্নের কিছু পর হইতেই মেঘলা করিয়া আসিতে লাগিল। কেদারবাবু এইমাত্র শয্যায়

উঠিয়া বসিয়া পশ্চিমের জানালাটা খুলিয়া দিয়া বাহিরে চাহিয়া ছিলেন, সম্মুখে একটা পুষ্পিত পেয়ারা-গাছ ফুলে ফুলে একেবারে ছাইয়া গিয়াছে এবং তাহার উপরে অসংখ্য মৌমাছির আনন্দ-কলরবের আর অন্ত নাই। অদূরে লম্বা দড়িতে বাঁধা মৃণালের স্বহস্ত-পরিমার্জ্জিত চিকন পরিপুষ্ট গাভীটি বড় বড় নিশ্বাস ফেলিয়া চরিয়া ফিরিতেছে এবং তাহার পিঠের উপর দিয়া পল্লীপথের কতকটা অংশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

বাবা, তোমার চা-টা এইবার নিয়ে আসি গে?

কেদারবাবু ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, এর মধ্যে নিয়ে আসবে মা!

বাঃ—বেলা বুঝি আর আছে?

তিনি একটু হাসিয়া বালিসের তলা হইতে ঘড়িটি বাহির করিয়া বলিলেন, কিন্তু এখনো যে তিনটে বাজে নি মা!

মৃণাল কহিল, নাই বাজলো বাবা তিনটে; ওবেলা যে তোমার মোটেই খাওয়া হয় নি।

কেদারবাবু মনে মনে বুঝিলেন, আপত্তি নিষ্ফল। তাই বলিলেন, আচ্ছা আনো।

মৃণাল মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিয়া কহিল, আচ্ছা বাবা, তুমি যে বড় বল, তুমি গরম চিঁড়ে বড্ড ভালবাসো?

কথাটা ত মিছে বলি নে মা।

তবে, তাও দুটি আনি?

তাও আনবে? আচ্ছা আনো গে, বলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া জোর করিয়া একটু হাসিলেন। মৃণাল চলিয়া গেলে আবার সেই জানালাটার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে গিয়াই দেখিলেন, সমস্ত ঝাপসা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; পরক্ষণেই পাঁচ-ছয় ফোঁটা তপ্ত অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া তাঁহার কোলের উপর ঝরিয়া পড়িল। ব্যস্ত হইয়া জামার হাতায় বৃদ্ধ জলের রেখা দুটি মুছিয়া ফেলিয়া মুখখানি শান্ত এবং সহজ

দেখাইবার চেষ্টায় এমার্সনের খোলা বইটা চোখের সুমুখে তাড়াতাড়ি মেলিয়া ধরিলেন।

তাহার পাতার ভিতরে যাই থাক, মনের মধ্যে এই কথাটারই ছাপ পড়িতে লাগিল, এ কি আশ্চর্য্য অজ্ঞেয় ব্যাপার এই সৃষ্টিটা! সংসারের দিনগুলা যখন গণনার মধ্যে আসিয়া ঠেকিল, তখনই কি এই দীর্ঘ জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, সকল আয়োজন বাতিল করিয়া আবার নূতন করিয়া অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন পড়িল; বেশ দেখিতেছি, আমার মানবজন্মের সমস্ত অতীতটাই একপ্রকার ব্যর্থ হ'য়ে গিয়াছে—অথচ এ কথা বুঝিতেও ত বাকি নাই, এই সুদীর্ঘ ফাঁকি ভরিয়া তুলিতে এই একটা মাসই যথেষ্ট হইল।

দ্বারে পদশব্দ শুনিয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মৃণাল পাথর-বাটীতে চা এবং রেকাবিতে চিঁড়ে-ভাজা লইয়া প্রবেশ করিল। দুই হাত বাড়াইয়া সেগুলি গ্রহণ করিতে করিতে কহিলেন, আজ খাওয়া যে আমার ভাল হয় নি, তা এখন টের পাচ্ছি। কিন্তু দেখ মা—

না বাবা, তুমি কথা কইতে সুরু করলে সব জুড়িয়ে যাবে।

কেদারবাবু নীরবে চায়ের বাটিটা মুখে তুলিয়া দিলেন এবং শেষ হইলে নামাইয়া রাখিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, আমি এই কামনাই কেবল করি মৃণাল, তুমি আসচে-বারে যেন আমার মেয়ে হয়ে জন্মাও। বুকে করে মানুষ করার বিদ্যেটা আমার খুব শেখা আছে মা, সেইটে যেন সেবার সারা জীবন ভ'রে খাটাবার অবসর পাই!

শেষ দিকটায় তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু এই ধরণের আলোচনাকেই মৃণাল সবচেয়ে ভয় করিত। তাই তাঁহার অপরিস্ফুট আবেগের প্রতি লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই সহাস্যে কহিল, বা বেশ ত বাবা, তোমার অনেক ছেলে-মেয়ের মধ্যে আমিও যেন একজন হই।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, না, অনেক নয় মা,

অনেক নয়। কেবল তুমি একা—আমার একটি মেয়ে। একলা তুমি আমার সমস্ত বুক জুড়ে থাকবে। এবার যা কিছু তোমার কাছে শিখে যাচ্ছি সেগুলি আবার একটি ক'রে আমার মেয়েকে শিখিয়ে দিয়ে আবার ঠিক এমনি করে বুড়ো বয়সে সমস্তটুকু তার কাছ থেকে ফিরে নিয়ে পরজন্মের পথে যাত্রা করব। বলিয়াই তিনি অলক্ষ্যে একবার চোখের কোণে হাত দিয়া লইলেন।

মৃণাল ক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে কহিল, তুমি কেবল আমাকে অপ্রতিভ কর বাবা। আমি কি জানি বল ত?

এই যে মা আমার খাওয়া হয় নি, আমি নিজে জানতাম না, কিন্তু তুমি জান্‌তে।

ও ত ভারি জানা। যার চোখ আছে, সেই ত দেখতে পায়।

কিন্তু ওই চোখটাই যে সকলের থাকে না মৃণাল! বলিয়া একটু-খানি থামিয়া কহিলেন, কিন্তু আমি সবচেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি এই দেখে মা, ভগবান কোথায়, কবে আর কি উপায়ে যে মানুষের যথার্থ আপনার জনটিকে মিলিয়ে দেন, তা কেউ জানে না! এর না আছে আড়ম্বর, না আছে কোন সম্পর্কের বালাই, না আছে সময়ের হিসাব। নিমিষে কোথা দিয়ে কি হ'য়ে যায়—কেবল বুক ভ'রে যখন তাকে পাই, তখনই মনে হয়, এতকাল এত বড় ফাঁকা সয়েছিলুম কেমন ক'রে?

মৃণাল আস্তে আস্তে বলিল, সে ঠিক কথা বাবা, নইলে তোমার একটা মেয়ে যে এই বনের মধ্যে ছিল, এতদিন ত তার কোন খোঁজ খবর রাখো নি।

কেদারবাবু কহিলেন, সাধ্য কি মা রাখি, তিনি যতদিন না হুকুম করেন। আবার হুকুম যখন দিলেন, তখন কোথাও এতটুকু বাধ্‌ল না, কিসে যেন হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে এলো। আজ লোকে

দেখচে, এই ত কেবল একটা মাসের পরিচয়। কিন্তু আমি জানি, এ ত শুধু আমার ভাড়ার হিসেব নয় যে, পাঁজির পাতার সঙ্গে এর গণনার মিল হবে! এ যেন কত যুগ-যুগান্ত কাল ধরে কেবল তোমার ছায়াতেই ব'সে আছি—এর আবার দিন মাস বছর কি! বলিয়া তিনি আবার একটু থামিলেন। মৃণাল নিজেও কি যেন একটা বলিতে গেল, কিন্তু সহসা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া সে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, এই বৃদ্ধের অন্তরের মধ্যে এতদিন ধরিয়া যে দুঃখের চিতা নীরবে জ্বলিতেছিল, সে যেন কেমন করিয়া নিবিয়া আসিল বলিয়া; এবং ইহারই শেষ আভাসটুকু তাঁহার মুখের উপর যে দীপ্তিপাত করিয়াছে, সেই ম্লান আলোকে কোথাকার কোন্ সুগভীর স্নেহ যেন অসীম করুণায় মাখামাখি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কোন কথা কহিল না—মৃণালের আনত দৃষ্টি মেঝের উপর তেমনি স্থির হইয়া রহিল। এই নীরবতা কেদার-বাবুই ভঙ্গ করিলেন। বলিলেন, মৃণাল, আমি এক ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে আর এক ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেচি, তখন বাইরের কাছে না হোক্ অন্ততঃ নিজের কাছেও একটা জবাবদিহির দায়ে পড়েছি। সেটা এত দিন কোনমতে এড়িয়ে গেছি বটে, কিন্তু আর বুঝি ঠেকাতে পারি নে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এখন এই কথাটা যেন বুঝতে পারচি—

পলকের জন্য মৃণাল একটুখানি চোখ তুলিতেই কেদারবাবু বলিয়া উঠিলেন, ভয় নেই মা, ভয় নেই, আমি বারংবার তোমার নাম উল্লেখ ক'রে আর তোমাকে সঙ্কোচে ফেল্‌ব না, কিন্তু এতকাল পরে এই সত্যটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছি যে, লড়াই-ঝগড়া বাদাবাদি ক'রে আর যাকেই পাওয়া যাক্ না, ধর্ম্ম-বস্তুটিকে পাবার যো নেই।

মৃণাল তাঁহার অন্তরের বাক্যটি অনুভব করিয়া ধীরে ধীরে কহিল,

সে কথা সত্যি হ'তে পারে বাবা, কিন্তু যে ধর্ম্মটি আমি ভাল ব'লে বুঝেছি, তাকে গ্রহণ করতে হ'লেই যে লড়াই-ঝগড়া বাদাবাদি করতে হবে, আমি ত তার কোন প্রয়োজন দেখতে পাই নে।

কেদারবাবু বলিলেন, আমিও যে ঠিক এক দিন পেয়েছিলুম তাও না, কিন্তু প্রয়োজন হয়ে পড়ে বৈ কি মৃণাল! কোন বস্তুকেই পরিত্যাগ ত আমরা প্রীতির ভেতর দিয়ে, প্রেমের ভেতর দিয়ে করি নে। যাকে ত্যাগ ক'রে যাই, তার সম্বন্ধে, সেই যে মন ছোট হয়ে থাকে, সে ত কোন কালেই ঘোচে না, সেই জন্যই ত আজ মস্ত কৈফিয়তের দায়ে ঠেকেচি মা। কিন্তু তোমরা যা জন্ম থেকেই আপনা আপনি অতি সহজেই পেয়েচ, সে ভাল হোক, মন্দ হোক, তাকেই অবলম্বন ক'রে চলেচ! তফাৎটা একটু চিন্তা ক'রে দেখ দেখি।

মৃণাল মৌন হইয়া রহিল, প্রতিবাদ করিবার মত জবাবটা সে সহসা খুঁজিয়া পাইল না। কেদারবাবু নিজেও মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, মা! আজ অনেক দিনের ভুলে-যাওয়া কথাও ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে, কিন্তু এতকাল এরা কোথায় লুকিয়ে ছিল!

মৃণাল চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কার কথা বাবা? কেদারবাবু বলিলেন, আমারি কথা মা। বড় হবার মত বুদ্ধিও ভগবান দেন নি, বড়ও কখনো হতে পারি নি। আমি সাধারণ মানুষ, সাধারণের সঙ্গে মিশেই কাটিয়েচি, কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁরা বড়, যাঁরা সমাজের মাথা, সমাজের আচার্য্য হয়ে গেছেন, তাঁদের উপদেশই চিরকাল ভক্তির সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে এসেছি। তাঁদের সেই সব কত দিনের কত বিস্মৃত বাক্যই না আজ আমার স্মরণ হচ্চে। তুমি বল্‌ছিলে মৃণাল, ধর্ম্মান্তর গ্রহণের মধ্যে ভালটাকে বেছে নেবার মধ্যে রেষা-রিষি থাক্‌বেই বা কেন, থাকার প্রয়োজন হবেই বা কিসের জন্যে? আমিও ত এত কাল তাই বুঝেচি, তাই ব'লে বেড়িয়েচি। কিন্তু আজ দেখতে পেয়েছি,

প্রয়োজন ছিলই। আজ দেখতে পেয়েছি, হিন্দুদের মধ্যে যারা এই ব'লে অভিযোগ করে যে, দেশে বিদেশে তাদের মাথা আমরা যতখানি হেঁট ক'রে দিতে পেরেছি, ততখানি খৃষ্টান পাদ্রীরাও পেরে উঠে নি—নালিশটা ত আজ আর তাদের মিথ্যে ব'লে ওড়াতে পারি নে মা! বস্তুতঃ বিদেশী বিধর্ম্মীর হাতে আমাদের মত বিভীষণ আর ত কেউ নেই।

মৃণাল অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে দৃক্‌পাত করিলেন না। বলিতে লাগিলেন, মৃণাল রেষা-রিষি যদি নাই-ই থাক্‌বে, তা হ'লে আমাদের মধ্যে যাঁরা সকল বিষয়েই আদর্শ, এমন কি, সমস্ত মানুষের মধ্যেই যাঁরা আদর্শ-পদবাচ্য, তাঁদের মুখ দিয়ে ধর্ম্মের মন্দিরে, ধর্ম্মের বেদীতে দাঁড়িয়ে 'রাম'কে রেমো, 'হরি'কে হোরে, 'নারায়ণ'কে নারাণে বেরুবে কেন? সকলকে আহ্বান ক'রে উচ্চকণ্ঠে কিসের জন্যে এ কথা ঘোষণা কর্‌বেন যে, দুর্ভাগারা যদি আঘাটায় ডুবে মরতে না চায় ত আমাদের এই বাঁধা-ঘাটে আসুক। মা, ধর্ম্মোপদেশের এই প্রচণ্ড তাল-ঠোকায় আমাদের সমাজ-শুদ্ধ সকলের রক্তই তখন ভক্তিতে যেমন গরম, শ্রদ্ধায় তেম্‌নি রুক্ষ হয়ে উঠত—আলোচনায় পুলকের মাত্রাও কোথাও এক তিল কম পড়ত না, কিন্তু আজ জীবনের এই শেষ-প্রান্তে পৌঁছে যেন স্পষ্ট উপলব্ধি কর্‌চি, তার মধ্যে উপদেশ যদি বা কিছু থাকে, তা থাক্, কিন্তু ধর্ম্মের লেশমাত্রও কোন-খানে থাক্‌বার যো ছিল না।

মৃণাল ব্যথিত-কণ্ঠে কহিল, বাবা, এ সব কথা আমাকে তুমি কেন শোনাচ্ছ? তাঁরা সকলেই যে আমার পূজনীয়, আমার নমস্য! বলিয়া সে দুই হাত যোড় করিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিল। এই ভক্তিমতী তরুণীর নম্রনত মুখখানির পানে চাহিয়া বৃদ্ধ যেন বিভোর হইয়া রহিলেন এবং ক্ষণপরে বাহিরে দাসীর আহ্বানে মৃণাল

উঠিয়া চলিয়া গেলেও, তিনি তেম্‌নি একভাবেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শাশুড়ী কেন ডাকিতেছিলেন শুনিয়া খানিক পরে মৃণাল ফিরিয়া আসিতেই কেদারবাবু অকস্মাৎ দুই হাত প্রসারিত করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, মৃণাল, এম্‌নি পরের দোষ-ত্রুটির নালিশ কর্‌তে কি সারা জীবনটা আমার কাটবে? এর থেকে কি কোন কালেই মুক্তি পাব না মা?

মৃণাল কহিল, তোমার মশারির কোণটা একটু ছিঁড়ে গেছে বাবা, একবারটি স'রে ব'সো না, ওটুকু সেলাই ক'রে দি। বলিয়া সে কুলুঙ্গি হইতে সেলাইয়ের ক্ষুদ্র কৌটাটি পাড়িয়া লইতেই বৃদ্ধ শয্যা হইতে উঠিয়া একটা মোড়ায় গিয়া বসিলেন এবং ওই কর্ম্মনিরত নির্ব্বাক মেয়েটির আনত মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সে কোন দিকে মুখ না তুলিয়াই আপন মনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু চাহিয়া চাহিয়া কেদারবাবুর দুই চক্ষু নিতান্ত অকারণেই বারংবার অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং কোঁচার খুট দিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন।

সেলাই শেষ করিয়া মৃণাল কৌটাটি তাহার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও-বেলা তুমি কি খাবে বাবা?

প্রশ্ন শুনিয়া কেদারবাবু হঠাৎ একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার অশ্রুকরুণ ওষ্ঠপ্রান্তে একটুখানি হাসির ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ও-বেলায় খাবার কথা ভাববার জন্যে এ-বেলায় ব্যাকুল হবার আবশ্যক নেই মা, সে চিন্তা যথাসময়েই হ'তে পার্‌বে। কিন্তু তুমি একবার স্থির হয়ে ব'সো দিকি মা! একটু থামিয়া বলিলেন, এ অপরাধের আজই শেষ। আমার মুখ থেকে আর কখনো কারও নামে অভিযোগ শুন্‌বে না মৃণাল। একটু থামিয়াই পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন,

কিন্তু আমার উপরে তুমি বিরক্ত হয়ো না মা, আমি ঠিক এর জন্তেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করি নি।

তাঁহার সজল কণ্ঠস্বরে মৃণাল চকিত হইয়া বলিল, অমন কথা তুমি কেন বল্‌লে বাবা, আমি কি কোন দিন তোমার প্রতি বিরক্ত হয়েচি।

কেদারবাবু তৎক্ষণাৎ সবেগে মাথা নাড়িয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, কখনো না মা, কখনো না। তুমি আমার মা কি না, তাই এই বুড়ো ছেলের সকল অত্যাচার-উপদ্রবই সস্নেহে হাসিমুখে সয়ে আসচ। কিন্তু এত কাল পরে যে সত্যটা আজ বুকের রক্ত দিয়ে পেয়েচি, তাকেই কেবল তোমাকে দেখাতে চেয়েচি মৃণাল, পরের নিন্দা-গ্লানি করতে চাই নি। আজ যেন নিশ্চয় জান্‌তে পেরেচি, ধর্ম্ম জিনিসটিকে এক দিন যেমন আমরা দল বেঁধে মৎলব এঁটে ধর্‌তে চেয়েছি, তেমন ক'রে তাঁকে ধরা যায় না। নিজে ধরা না দিলে হয় ত তাকে ধরাই যায় না। পরম দুঃখের মূর্ত্তিতে যে দিন মানুষের চরম বেদনার উপর পা দিয়ে তিনি একাকী এসে দাঁড়ান, তখন কিন্তু তাঁকে চিন্‌তে পারা চাই। এতটুকু ভুল-ভ্রান্তির ভর সয় না মা, তিনি মুখ ফিরিয়ে ফিরে যান। কিন্তু তার মত দুর্ভাগ্য আমার অতিবড় শত্রুর জন্তেও আমি কামনা করতে পারি নে মৃণাল।

যে প্রসঙ্গকে মৃণাল ক্রমাগত বাধা দিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে, এ যে তাহারই ইঙ্গিত, ইহা অনুভব করিয়াই তাহার সঙ্কোচ ও বেদনার অবধি রহিল না, কিন্তু আজ আর সে যে-কোন একটা ছুতা করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল না, নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

ক্রমান্বয়ে বাধা পাইয়া কেদারবাবুর নিজের দৃষ্টিও এ দিকে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, আজ কিন্তু তিনিও কোন খেয়াল করিলেন না, বলিতে লাগিলেন, মা, এক কথা বার বার বলেও আমার তৃপ্তি হচ্ছে না যে, তুমি ছাড়া এতবড় সংসারে আমার আপনার জন আর কেউ কোন দিন ছিল

না ; তাই বুঝি আমার শেষ জীবনের সমস্ত বোঝা সমস্ত ভাল-মন্দ কি ক'রে জানি নে, তোমার উপরে এসেই স্থিতিলাভ করেচে। যিনি সকল বিধি-ব্যবস্থার মালিক, এ তাঁরই ব্যবস্থা, আমি অসংশয়ে বুঝে নিয়েচি বলেই আর আমার কোন লজ্জা, কোন কুণ্ঠা নেই। গলগ্রহ ব'লে প্রথম আমার ভারি বাধ বাধ ঠেকেছিল, কিন্তু আজ আমার মন থেকে তার সমস্ত বালাই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মৃণাল মুখ তুলিয়া একটু হাসিল। কেদারবাবু একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, তবু কেমন বাধে মৃণাল, তবু কেমন গলা দিয়ে কথাটা কিছুতে বার হ'তে চায় না।

তবে থাক না বাবা—নাই বললে আজ তেমন কথা।

কেদারবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না না, আর থাকবে না—আর থাকলে চলবে না, আমার নিশ্চয় মনে হচ্ছে, সে সুরেশের সঙ্গেই—

এ সংশয় মৃণালের নিজের মনেও বহুবার ঘা দিয়া গিয়াছে, তাই সে শুধু মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল, কিছুই বলিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বহিয়া গেল, কেদারবাবু প্রবল চেষ্টায় যেন আপনাকে আপনি পরাভূত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, একবার মহিমের কাছে যেতে চাই মৃণাল, একটিবার তার মুখের কথা শুনতে চাই—শুধু এরি জন্যে আমার বুকের মধ্যেটা যেন অনুক্ষণ হু হু ক'রে জ্বলে যাচ্চে। কিন্তু একাকী গিয়ে তার কাছে আমি কেমন ক'রে দাঁড়াব ?

মৃণাল তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া তাহার সকরুণ চক্ষু দুটি দুর্ভাগ্য বৃদ্ধের লজ্জিত, ভীত মুখের প্রতি স্থির করিয়া কহিল, কেন বাবা তুমি একলা যাবে—যদি যেতেই হয় ত আমরা দুজনেই একসঙ্গে যাবো।

সত্যি যাবে মা ?

যাবো বৈ কি বাবা। তা ছাড়া, তোমাকে একলা আমি ছেড়েই বা দেব কেন ? তুমি যেখানেই যাও না, আমি সঙ্গে না গিয়ে কিছুতেই

ছাড়ব না, তা ব'লে রাখচি। আমাকে কেউ সঙ্গে নিতে চায় না বাবা, আমি কোথাও একটু বেড়াতে পাই নে।

প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ কোন কথা কহিলেন না, কেবল দুই করতল মুখের উপর চাপ দিয়া নিজের দুই জানুর উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন এবং পরক্ষণেই দেখিতে পাওয়া গেল, এই শুষ্ক শীর্ণ দেহখানির এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভেতরের অব্যক্ত বেদনায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

মৃণাল নিঃশব্দে তাঁহার শিয়রের কাছে বসিয়া রহিল, একটি কথা, একটি সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারণ পর্য্যন্ত করিল না। একমাত্র কন্যার ঘৃণ্যতম দুর্গতিতে যে পিতার হৃদয় বিদ্ধ হইতেছে, তাহাকে সান্ত্বনা দিবার তাহার কি-ই বা ছিল।

এমন করিয়া বহুক্ষণ কাটিলে পরে বৃদ্ধ আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন, মা!

তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া মৃণালের বুক ফাটিয়া গেল, কিন্তু সে প্রাণপণে অশ্রু নিরোধ করিয়া সাড়া দিল, কেন বাবা?

সংসারে ব্যথার পরিণাম যে এতবড়ও হ'তে পারে, এ ত কখনো ভাবি নি মৃণাল? এর থেকে পরিত্রাণের কি কোথাও কোন পথ নেই? কেউ কি জানে না?

কিন্তু বাবা লোকে মৃত্যুর শোকও ত সহ্য কর্‌তে পারে!

কেদারবাবু বলিলেন, আমার পক্ষে সে মৃত, এই ত তুমি বল্‌চ মা? এক হিসেবে তাই বটে। অনেকবার আমার মনেও হয়েছে—কিন্তু মৃত্যুর শোক যেমন বড়, তার শান্তি, তার মাধুর্য্যও তেম্‌নি বড়। কিন্তু সে সান্ত্বনার উপায় কৈ মৃণাল? এর দুঃসহ গ্লানি, অসহ্য লজ্জা আমার বুকের পথ জুড়ে এম্‌নি বেধে আছে যে কোথাও তাদের নাড়িয়ে রাখবার এতটুকু ফাঁক নেই। বলিয়া চক্ষু মুদিয়া বুকের উপর হাতখানি পাতিয়া

রাখিয়া আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, মা, সন্তানের মৃত্যু যিনি দেন, তাঁকে আমরা এই ব'লে ক্ষমা করি যে, তাঁর কার্য্যকরণ আমরা জানি নে! আমরা—

মৃণাল হঠাৎ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, বাবা, আমরাও তা হ'লে তাই কর্‌তে পারি? যে কেউ হোক্ না, যার কার্য্য-কারণ আমাদের জানা নেই, তাকে মাপ কর্‌তেই যদি না পারি, অন্ততঃ মনে মনে তার বিচার ক'রে তাকে অপরাধী ক'রে রাখ্ না!

বৃদ্ধ ঠিক যেন চমকিয়া উঠিলেন, এবং দুই চক্ষের তীব্র দৃষ্টি অপরের মুখের প্রতি একাগ্র করিয়া পাথরের মত নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মৃণাল সলজ্জমুখে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, তা ছাড়া আমি সেজদার কাছেই শুনেচি বাবা, যে, সংসারে এমন অপরাধ অল্পই আছে ইচ্ছে কর্‌লে যাকে ক্ষমা করা না যায়।

কেদারবাবু উত্তেজনায় সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, এ অপরাধও কি কেউ কোন দিন মাপ করতে পারে মৃণাল?

মৃণাল চুপ করিয়া রহিল, তিনি তেমনি তীব্রস্বরে কহিতে লাগিলেন, কখনও নয়, কখনও নয়। বাপ হ'য়ে তার এ দুষ্কৃতি আমি কোনমতেই ক্ষমা কর্‌ব না। ক্ষমার যোগ্য নয়, ক্ষমা করা উচিত নয়—এ তোমাকে আমি নিশ্চয় ব'লে দিলাম।

মৃণাল ধীরে ধীরে বলিল, যোগ্য অযোগ্য ত বিচারের কথা বাবা, তাকে ক্ষমা বলা চলে না। তা ছাড়া ক্ষমার ফল কি শুধু অপরাধীই পায়, যে ক্ষমা করে, সে কি কিছুই পায় না বাবা?

বৃদ্ধ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। মেয়েটির এই শান্ত স্নিগ্ধ কথাগুলি এক মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, এমন ক'রে ত আমি কখনো ভেবে দেখি নি মৃণাল। তোমার কাছে আজ যেন আবার

এক নূতন তত্ত্ব লাভ করলুম মা। ঠিক কথাই ত! যে গ্রহণ করে, লাভের খাতায় তাকে কি কেবল ষোল আনা উসুল দিয়ে দাতার অঙ্কে শূন্য বসাতে হবে? এমন কিছুতেই সত্য হ'তে পারে না! ঠিক, ঠিক! কার অপরাধ কত বড়, সে বিচার যার খুসি সে করুক, আমি ক্ষমা করব কেবল আমার পানে চেয়ে! এই না মা তোমার উপদেশ।

কেন বাবা, এই সব ব'লে আমার অপরাধ বাড়াচ্চ?

তোমার অপরাধ? সংসারে তারও কি স্থান আছে মা?

মৃণাল হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ঐ বুঝি মা আমাকে আবার ডাকচেন—আমি এখনি আস্‌চি বাবা। বলিয়া সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মৃণাল উঠিয়া গেল, কিন্তু কেদারবাবু সে দিকে আর যেন লক্ষ্যই করিলেন না। কেবল নিজের কথার সুরেই মগ্ন থাকিয়া আপন মনে কহিতে লাগিলেন, আমি বাঁচিলাম! আমি বাঁচিলাম মা, আমাকে তুমি বাঁচাইয়া দিলে। দুর্গতির দুর্গম অরণ্যে যখন দুচক্ষু বাঁধা, মৃত্যু ভিন্ন আর যখন আমার সমস্ত রুদ্ধ, তখন হাতের পাশেই যে মুক্তির এতবড় রাজপথ উন্মুক্ত ছিল, এ খবর তুমি ছাড়া আর কে দিতে পারিত! ক্ষমার কথা ত কখনো ভাবিতেই পারি নাই। যদি কখনো মনে হইয়াছে, তখনি তাহাকে দুই হাতে ঠেলিয়া দিয়া সজোরে, সগর্ব্বে ইহাই বলিয়াছি, না, কদাচ না! মেয়ে হইয়া এত বড় অপরাধ যে করিতে পারিল, বাপ হইয়া এত বড় দান তাহাকে কোনমতেই দিতে পারি না! কিন্তু ওরে অন্ধ, ওরে মূঢ়, ওরে কৃপণ, পিতা হইয়া যাহা তুই দিতে পারিস্ না, অপরে তাহা দিবে কি করিয়া? আর সে তোর কতটুকু বা লইয়া যাইবে? তোর ক্ষমার সবটুকুই যে তোর আপন ঘরেই

ফিরিয়া আসিবে। তোর মৃণাল-মায়ের এই তত্বটাকে একবার দুচক্ষু মেলিয়া দেখ। বলিয়া তিনি ঠিক যেন কিছু একটা দেখিবার জন্যই দুচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মেঘলা আকাশের পানে চাহিয়া মনে মনে প্রাণ-পণ-বলে কহিতে লাগিলেন, আমি ক্ষমা করিলাম, আমি ক্ষমা করিলাম! সুরেশ, তোমাকে ক্ষমা করিলাম! অচলা, তোমাকেও ক্ষমা করিলাম! পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ যে কেহ যেখানে আছো, আজ আমি সকলকে ক্ষমা করিলাম! আজ হইতে কাহারো বিরুদ্ধে আমার কোন অভিমান, কোন নালিশ নাই, আজ আমি মুক্ত, আজ আমি স্বাধীন, আজ আমি পরমানন্দময়! বলিতে বলিতেই অনির্ব্বচনীয় করুণায় তাঁহার দুচক্ষু মুদিয়া আসিল, এবং হাতদুটি একত্র করিয়া ধীরে ধীরে ক্রোড়ের উপর রাখিতেই সেই নিমীলিত নেত্র-প্রান্ত হইতে পিতৃস্নেহ যেন অজস্র অশ্রু-ধারায় ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আর কম্পিত ওষ্ঠাধর দুটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিতে লাগিল, মা! মা! তুই কোথায় আছিস্—একবার কেবল ফিরিয়া আয়! আমি তোকে পৃথিবীতে আনিয়াছি, আমি তোকে বুকে করিয়া বড় করিয়াছি—মা, তোর সমস্ত অপরাধ, সমস্ত অপমান লাঞ্ছনা লইয়াই আর একবার পিতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আয় অচলা, আমি বুক দিয়া তোর সকল ক্ষত, সকল জ্বালা মুছিয়া লইয়া আবার তেমনি করিয়াই মানুষ করিব। আমরা লোকালয়ে আসিব না, ঘরের বাহির হইব না, শুধু তুই আর আমি—

বাবা?

বৃদ্ধ মুখ ফিরিয়া মৃণালের মুখের পানে চাহিলেন, বোধ করি, একবার আপনাকে সংযত করিবার চেষ্টাও করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বালকের মত আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন—মা! মা! আমার বুক ফেটে গেল! সবাই তাকে কত দুঃখ, কত ব্যথাই না দিচ্ছে! আর আমি পারি না!

মৃণাল কিছুই বলিল না, শুধু কাছে আসিয়া তাঁহার ভূলুণ্ঠিত মাথাটি নীরবে কোলে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। তাহার নিজের দুচোখ বহিয়াও জল পড়িতে লাগিল।

প্রথম ফাল্গুনের এই মেঘ-ঢাকা দিনটি হয় ত এমনি ভাবেই শেষ হইয়া যাইত, কিন্তু হঠাৎ কেদারবাবু চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন, কহিলেন, মৃণাল, মহিমকে চিঠি লিখলে কি জবাব পাওয়া যাবে না?

কেন যাবে না বাবা? আমার ত মনে হয় কাল-পরশুর মধ্যেই তাঁর উত্তর পাবো।

তুমি কি তাঁকে কিছু লিখেছ?

মৃণাল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

চিঠিতে কি লেখা হয়েছে, এ কথা বৃদ্ধ সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলেন না। বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এখনো খানিক বেলা আছে, আমি একটু ঘুরে আসি! বলিয়া তিনি গায়ের কাপড়খানি টানিয়া লাঠিটি হাতে করিলেন, কিন্তু দুই-এক পদ অগ্রসর হইয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কিন্তু দেখ মা—

কি বাবা?

আমি ভয় করচি—না, ভয় ঠিক নয়—কিন্তু আমি ভাবচি যে—

কিসের বাবা?

কি জানো মা, আমি ভাবচি—আচ্ছা, তুমি কি মনে কর মৃণাল, আমরা যেতে চাইলে মহিম আপত্তি করবে?

এই ভয় এবং ভাবনা দুই-ই মৃণালের যথেষ্ট ছিল এবং মনে মনে ইহার জবাবটাও সে একপ্রকার ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল; তাই তৎক্ষণাৎ কহিল, এখন সে খোঁজে আমাদের কাজ কি বাবা? তাঁর ঠিকানা জান্‌লেই আমরা চ'লে যাবো—তার পরে সেজদা যখন আমাকে তাড়িয়ে দিতে পার্‌বেন, তখন দুনিয়ায় জান্‌বার মত অনেক

কথা আপনি জানা যাবে বাবা। সে আর কাউকে প্রশ্ন করতে হবে না।

কেদারবাবু মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন, তা হ'লে সত্যিই তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

মৃণাল কহিল, সত্যি। কিন্তু আমি ত তোমার সঙ্গে যাবো না বাবা, বরঞ্চ তুমিই আমার সঙ্গে যাবে।

প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ আবার কি একটা বলিতে গেলেন, কিন্তু কেবলমাত্র ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

ঠিক এম্‌নি এক ফাল্গুনের অপরাহ্ণ-বেলায় এই বাঙলা দেশের বাহিরে আরও দুটি নর-নারীর চোখের জল সে দিন এম্‌নি অসংবরণীয় হইয়া উঠিতেছিল; সুরেশ যখন শিলমোহর করা বড় খামখানি অচলার হাতে দিয়া কহিল, এত দিন দিই দিই ক'রেও এ কাগজখানি তোমার হাতে দিতে আমার সাহস হয় নি, কিন্তু আজ আমার আর না দিলেই নয়।

অচলা খামখানি হাতে লইয়া দ্বিধাভাবে কহিল, তার মানে?

সুরেশ একটু হাসিয়া বলিল, দুনিয়ায় আমার সাহস হয় না, এমন ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য বস্তু আবার কি ছিল, এ ত তুমি ভাবচো? ভাবতে পারো—আমিও অনেক ভেবেচি! এর মানে যদি কিছু থাকে, এক দিন তা প্রকাশ পাবেই। কিন্তু অনেক অপমান, অনেক দুঃখের বোঝাই ত সংসারে তুমি আমার কাছে অর্থ না বুঝেই নিয়েচ—একে তেমনি নাও অচলা।

অচলা শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এর মধ্যে কি আছে?

সুরেশ হাত যোড় করিয়া কহিল, এত দিন যা কিছু তোমার কাছে পেয়েছি, ডাকাতের মত জোর করেই পেয়েছি। কিন্তু আজ শুধু একটি জিনিস ভিক্ষে চাইচি—এ কথা তুমি জানতে চেয়ো না।

অচলা চুপ করিয়া রহিল, ইহার পরে কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না।

বাহিরে পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বেহারা ডাকিয়া কহিল, বাবুজী, এক্কাওয়ালা বল্‌চে, আর দেরি কর্‌লে পৌছুতে রাত্রি হয়ে যাবে। পথে হয় ত ঝড়-বৃষ্টিও হ'তে পারে।

অচলা চকিত হইয়া কহিল, আজ আবার তুমি কোথায় যাবে? এমন সময়ে?

সুরেশ হাসিমুখে সংশোধন করিয়া কহিল, অর্থাৎ এমন অসময়ে। যাচ্ছি ওই মাঝুলিতেই। প্লেগের ডাক্তার কিছুতে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ গ্রামগুলো একেবারে শ্মশান হয়ে পড়েচে। এবার পাঁচ-সাত দিন থাক্‌তে হবে—আর কে জানে, হয় ত একেবারেই বা থেকে যেতে হবে। বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

অচলা স্থির হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে নিজেও কিছু কিছু সংবাদ জানিত; সাত-আট ক্রোশ দূরে কতকগুলা গ্রাম যে সত্যই এ বৎসর প্লেগে শ্মশান হইয়া যাইতেছে, এ খবর সে শুনিয়াছিল। সহর হইতে এত দূরে এই ভীষণ মহামারীতে দরিদ্রের চিকিৎসা করিতে যে চিকিৎসকের অভাব ঘটিবে, ইহাও বিচিত্র নয়। সুরেশ বহু টাকার ঔষধ-পথ্য যে গোপনে দিকে দিকে প্রেরণ করিতেছে, ইহাও সে টের পাইয়াছিল; এবং নিজেও প্রায় ভোরে উঠিয়া কোথাও-না-কোথাও চলিয়া যায়, ফিরিতে কখনো সন্ধ্যা, কখনো রাত্রি হয়—পরশু ত আসিতে পারে নাই, কিন্তু সে যে বাড়ি ছাড়িয়া, তাহাকে ছাড়িয়া, একেবারে কিছুদিনের মত সেই মরণের মাঝখানে গিয়া বাস করিবার সঙ্কল্প করিবে, ইহা সে কল্পনাও করে নাই। তাই কথাটা শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য সে কেবল নিঃশব্দে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। এই যে মহাপাপিষ্ঠ, যে ভগবান মানে না, পাপ-পুণ্য মানে না, যে একমাত্র বন্ধু ও তাহার নিরপরাধা স্ত্রীর এত বড় সর্ব্বনাশ

অবলীলাক্রমে সাধিয়া বসিল, কোন বাধা মানিল না—তাহার মুখের প্রতি সে যখনই চাহিয়াছে, তখনই সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় বিষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে তাহারই পানে চাহিয়া সমস্ত অন্তর তাহার বিষে নয়, অকস্মাৎ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ওই লোকটির ওষ্ঠের কোণে তখনও একটুখানি হাসির রেখা ছিল—অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু সেইটুকু হাসির মধ্যেই যেন অচলা বিশ্বের সমস্ত বৈরাগ্য ভরা দেখিতে পাইল। মুখে তাহার উদ্বেগ নাই, উত্তেজনা নাই, এই যে মৃত্যুর মধ্যে গিয়া নামিয়া দাঁড়াইতে যাত্রা করিয়াছে—তথাপি মুখের উপর শঙ্কার চিহ্ন মাত্র নাই। তবে এই নিরীশ্বর ঘোর স্বার্থপরের কাছেও কি তাহার নিজের প্রাণটা এতই সস্তা! সংসারে ভোগ ছাড়া যে লোক আর কিছুই বুঝে না—ভোগের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে মগ্ন রহিয়াও কি বাঁচিয়া থাকাটা তাহার এমনি অকিঞ্চিৎকর, এমনি অবহেলার বস্তু যে, এতই সহজে সমস্ত ছাড়িয়া যাইতে এক নিমিষে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল? হয় ত না ফিরিতেও পারি! ইহা আর যাহাই হোক, পরিহাস নয়। কিন্তু কথাটা কি এতই সহজে বলিবার?

অকস্মাৎ ভিতরের ধাক্কায় সে যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল, হাতে কাগজখানা দেখাইয়া প্রশ্ন করিল, এটা কি তবে তোমার উইল?

সুরেশও প্রশ্ন করিল, যা এইমাত্র ভিক্ষে দিলে অচলা, তাই কি তবে ফিরে নিতে চাও?

অচলা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আচ্ছা, আমি জান্‌তে চাই নে। কিন্তু আমি তোমাকে যেতে দিতে পারবো না।

কেন?

প্রত্যুত্তরে অচলা সেই খামখানাই পুনরায় নাড়াচাড়া করিয়া একটু ইতঃস্তত করিয়া বলিল, তুমি আমার যাই কেন না ক'রে থাকো, আমার জন্যে তোমাকে আমি মরতে দেব না।

সুরেশ জবাব দিল না। অচলা নিজের কথায় একটু লজ্জা পাইয়া কথাটাকে হাল্কা করিবার জন্য পুনশ্চ কহিল, তুমি বল্‌বে, তোমার জন্যে মর্‌তে যাবো কোন্ দুঃখে, আমি যাচ্ছি গরীবদের জন্য প্রাণ দিতে, বেশ, তাও আমি দেব না।

কথাটা শুনিয়াই দপ করিয়া সুরেশের মহিমকে মনে পড়িল এবং বুকের ভিতর হইতে একটা গভীর নিশ্বাস উত্থিত হইয়া স্তব্ধ ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। কারণ জীবনের মমতা যে কত তুচ্ছ এবং কতই না সহজে ইহাকে সে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার একটিমাত্র সাক্ষী আজও আছে, সে কেবল মহিম। আজিকার এই যাত্রাই যদি তাহার মহাযাত্রা হয় ত সেই সঙ্গীহীন একান্ত নীরব মানুষটিই কেবল মনে মনে বুঝিবে, সুরেশ লোভে নয়, ক্ষোভে নয়, ঘৃণায় নয়—ইহকাল পরকাল কোন কিছুর আশাতে প্রাণ দেয় নাই, সে মরিয়াছে শুধু কেবল মরণটা আসিয়াছিল বলিয়াই।

চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিতে চাহিল, কিন্তু সংবরণ করিয়া ফেলিল। বরঞ্চ মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল, আমি কারও জন্যেই মর্‌তে চাই নে অচলা! চুপ ক'রে নিরর্থক ব'সে ব'সে আর ভাল লাগে না, তাই যাচ্ছি একটু ঘুরে বেড়াতে। মর্‌ব কেন অচলা, আমি মর্‌ব না।

তবে এ উইল কিসের জন্য?

কিন্তু এটা যে উইল, সে ত প্রমাণ হয় নি।

না হোক্ কিন্তু আমাকে একলা ফেলে তুমি চ'লে যাবে?

চলেই যে যাবো, আর যে ফিরব না, সেও ত স্থির হয়ে যায় নি।

যায় নি বৈ কি! এই বিদেশে আমাকে একেবারে নিরাশ্রয় ক'রে তুমি—, বলিয়াই অচলা কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরেশ উঠিতে গিয়াও বসিয়া পড়িল। একটা অদম্য আবেগ জীবনে

আজ সে এই প্রথম সংযত করিয়া লইয়া ক্ষণকাল স্থিরভাবে থাকিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, অচলা, আমি ত তোমার সঙ্গী নই। আজও তুমি একা, আর সে দিন যদি সত্যই এসে পড়ে ত তখনও এর চেয়ে তোমাকে বেশি নিরাশ্রয় হ'তে হবে না।

অচলার চোখ দিয়া জল পড়িতেই ছিল, সেই অশ্রুভরা দুচক্ষু তুলিয়া সুরেশের মুখের প্রতি নিবদ্ধ করিল, কিন্তু ওষ্ঠাধর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তার পরে দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া সেই কম্পন নিবারণ করিতে গিয়া অকস্মাৎ ভগ্নকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, আমার কাছে আর তুমি কি চাও, আর আমার কি আছে? এবং বলিতে বলিতেই মুখে আঁচল গুঁজিয়া দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বেহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, এক্কাওয়ালা—

আচ্ছা, আচ্ছা, তাকে সবুর করতে বল্।

অনতিবিলম্বে সহিস আসিয়া জানাইল যে, গাড়ী তৈরি হইয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছে।

গাড়ী কেন?

সহিস যাহা কহিল, তাহাতে বুঝা গেল, মাইজী ও-বাড়িতে বেড়াইতে যাইবেন বলিয়া হুকুম দিয়াছিলেন, কিন্তু দাসী বলিতেছে, ঘরের দরজা বন্ধ এবং অনেক ডাকাডাকিতেও সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। ঘোড়া খুলিয়া দেওয়া হইবে কি না, ইহাই সে জানিতে চায়।

আচ্ছা, সবুর কর।

এ ঘরের ভিতরের দিকের কবাটটা খোলাই ছিল, ইহারই পর্দ্দা সরাইয়া সুরেশ নিঃশব্দে তাহাদের শয়ন-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তেমনি নিঃশব্দে অদূরে একটা চৌকির উপর উপবেশন করিল। এ কক্ষ তাহাদের দুজনের, এখানে সে অনধিকার প্রবেশ করে নাই, কিন্তু ওই যে প্রশস্ত, শুভ্র-সুন্দর শয্যার উপর সুন্দরী নারী উপুড় হইয়া কাঁদিতেছে,

উহার কোনটাই আজ তাহার মনকে সম্মুখে আকর্ষণ করিল না, বরঞ্চ পীড়ন করিয়া পিছনে ঠেলিতে লাগিল। তাহার আগমন অচলা টের পায় নাই, সে কাঁদিতেই লাগিল এবং তাহারই প্রতি নিষ্পলক দৃষ্টি রাখিয়া সুরেশ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছু দিন হইতে নিজের ভুল তাহার কাছে ধরা পড়িতেছিল, কিন্তু ওই লুণ্ঠিত দেহলতা, ওই বেদনা—ইহার সম্মিলিত মাধুর্য্য তাহার চোখের ঠুলিটাকে যেন এক নিমেষে ঘুচাইয়া দিল। তাহার মনে হইল, প্রভাত রবিকরে পল্লব-প্রান্তে যে শিশিরবিন্দু দুলিতে থাকে, তাহার অপরূপ অফুরন্ত সৌন্দর্য্যকে যে লোভ হাতে লইয়া উপভোগ করিতে চায়, ভুলটা সে ঠিক তেমনি করিয়াছে। সে নাস্তিক, সে আত্মা মানে না; সে প্রস্রবণ বাহিয়া অনন্ত সৌন্দর্য্য নিরন্তর ঝরিতেছে, সেই অসীম তাহার কাছে মিথ্যা, তাই স্থূলটার প্রতি সমস্ত দৃষ্টি একাগ্র করিয়া সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল, ওই সুন্দর দেহটাকে দখল করার মধ্যেই তাহার পাওয়াটা আপনা-আপনি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে; কিন্তু আজ তাহার আকাশস্পর্শী ভুলের প্রাসাদ এক মুহূর্ত্তে চূর্ণ হইয়া গেল। প্রাপ্তির সে অদৃশ্য ধরা হইতে বিচ্যুত করিয়া পাওয়াটা যে কত বড় বোঝা, এ যে কত বড় ভ্রান্তি, এ তথ্য আজ তাহার মর্ম্মস্থলে গিয়া বিঁধিল। শিশিরবিন্দু মুঠার মধ্যে যে কি করিয়া এক ফোঁটা জলের মত দেখিতে দেখিতে ঘোলাইয়া উঠে, অচলার পানে চাহিয়া চাহিয়া সে কেবল এই সত্যটাই দেখিতে লাগিল। হায় রে, পল্লবপ্রান্তটুকুই যাহার ভগবানের দেওয়া স্থান, ঐশ্বর্য্যের এই মরুভূমিতে আনিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে কি করিয়া?

অজ্ঞাতসারে তাহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল, মুছিয়া ফেলিয়া ডাকিল, অচলা!

অচলা চমকিয়া উঠিল, কিন্তু তেমনি নীরবে পড়িয়া রহিল। সুরেশ

বলিল, তোমার গাড়ী তৈরী, আজ তুমি রামবাবুদের ওখানে বেড়াতে যাবে?

তথাপি সাড়া না পাইয়া বলিল, যদি ইচ্ছা না থাকে ত আজ না হয় ঘোড়া খুলে দিক্! আমিও বোধ হয় আজ আর বার হ'তে পারব না। একা ফিরিয়ে দিতে ব'লে দিই গে। বলিয়া সে বসিবার ঘরে ফিরিয়া চলিয়া গেল।

তথায় দশ-পনের মিনিট সে যে কি ভাবিতেছিল, তাহা নিজেই জানে না; হঠাৎ শাড়ীর খস্ খস্ শব্দে সচেতন হইয়া সুমুখেই দেখিল অচলা। সে চোখের রক্তিমা যতদূর সম্ভব জল দিয়া ধুইয়া ধনিগৃহিণীর উপযুক্ত সজ্জায় একেবারে সজ্জিত হইয়াই আসিয়াছিল। কহিল, ওঁদের ওখানে আজ একবার যাওয়া চাই-ই!

এই সাজ-সজ্জা তাহার নিজের জন্য নয়, ইহা যে তথাকার আগন্তুক রাজ-অতিথিদের উপলক্ষ্য করিয়া, এ কথা সুরেশ বুঝিল, তথাপি এই মণি-মুক্তাখচিত রত্নালঙ্কার-ভূষিত সুন্দরী নারী ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। বিস্ময়-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, চাইই কেন?

রাক্ষুসী জ্বর নিয়েই কলকাতা থেকে ফিরেছে—খবর পেলুম জ্যাঠা-মশাই নিজেও না কি কাল থেকে জ্বরে পড়েছেন।

আসা পর্য্যন্ত তুমি কি একদিনও তাদের বাড়ি যাও নি?

না।

তাঁরাও কেউ আসেন নি?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না।

রামবাবু নিজেও আসেন নি?

না।

এ বাটীতে আসিয়া পর্য্যন্ত সুরেশ প্লেগ লইয়া আপনাকে এমনি ব্যাপৃত রাখিয়াছিল যে, গৃহস্থালি ও আত্মীয়তার এই সকল ছোট-খাটো

ত্রুটি সে লক্ষ্য করে নাই। তাই কথা শুনিয়া যথার্থই বিস্ময়ভরে কহিল, আশ্চর্য্য! আচ্ছা যাও!

অচলা বলিল, আশ্চর্য্য তাঁদের তত নয়, যত আমাদের। এক জনের জ্বর, এক জন নিজেও অসুখে না পড়া পর্য্যন্ত আত্মীয়দের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন। উচিত ছিল আমাদেরই যাওয়া।

আচ্ছা, যাও। একটু সকাল সকাল ফিরো।

অচলা এক মুহূর্ত্তে মৌন থাকিয়া কহিল, তুমিও সঙ্গে চল।

আমাকে কেন?

অচলা রাগ করিয়া কহিল, নিজের অসুখের কথা মনে কর্‌তে না পারো, অন্ততঃ ডাক্তার বলেও চল।

আচ্ছা, চল, বলিয়া সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাপড় ছাড়িতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

একাওয়ালা বেচারা কোন কিছুই হুকুম না পাইয়া তখনও অপেক্ষা করিয়াছিল। নিচে নামিয়া তাহাকে দেখিয়াই অচলা খামাকা রাগিয়া উঠিয়া বেহারাকে তাহার কৈফিয়ৎ চাহিল এবং ভাড়া দিয়া তৎক্ষণাৎ বিদায় দিতে আদেশ করিল। সে সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কাল—

অচলাই তাহার জবাব দিল, কহিল, না। বাবুর যাওয়া হবে না, এক্কার দরকার নেই।

গাড়ীতে উঠিয়া সুরেশ সম্মুখের আসনে বসিতে যাইতেছিল, আজ অচলা সহসা তাহার জামার খুঁট ধরিয়া টানিয়া পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিল। গাড়ী চলিতে লাগিল, কেহই কোন কথা কহিল না, পাশা-পাশি বসিয়া দুজনেই দুই দিকের খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাগানের গেট পার হইয়া গাড়ী যখন রাস্তায় আসিয়া পড়িল, তখন সুরেশ আস্তে আস্তে ডাকিল, অচলা!

কেন?

আজ-কাল আমি কি ভাবি জানো?

না।

এতকাল যা ভেবে এসেছি ঠিক তার উল্টো। তখন ভাবতুম, কি ক'রে তোমাকে পাবো, এখন অহর্নিশি চিন্তা করি, কি উপায়ে তোমাকে মুক্তি দেব। তোমার ভার যেন আমি আর বইতে পারি নে।

এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব ও একান্ত নিষ্ঠুর আঘাতের গুরুত্বে ক্ষণকালের জন্য অচলার সমস্ত দেহ-মন একেবারে অসাড় হইয়া গেল। ঠিক যে বিশ্বাস করিতে পারিল, তাহাও নয়, তথাপি অভিভূতের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, আমি জানতুম। কিন্তু এ ত—

সুরেশ বলিল, হাঁ, আমারই ভুল। তোমরা যাকে বল পাপের ফল। কিন্তু তবুও কথাটা সত্য। মন ছাড়া যে দেহ, তার বোঝা এমন অসহ্য ভারী, এ স্বপ্নেও ভাবি নি।

অচলা চোখ তুলিয়া কহিল, তুমি কি আমাকে ফেলে চ'লে যাবে?

সুরেশ লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া জবাব দিল, বেশ, ধর তাই।

ওই নিঃসঙ্কোচ উত্তর শুনিয়া অচলা একেবারে নীরব হইয়া গেল। তাহার রুদ্ধ হৃদয় মথিত করিয়া কেবল এই কথাটাই চারিদিকে মাথা কুটিয়া ফিরিতে লাগিল, এ সেই সুরেশ! এ সেই সুরেশ! আজ ইহারই কাছে সে দুঃসহ বোঝা, আজ সেই তাহাকে ফেলিয়া যাইতে চাহে! কথাটা মুখের উপর উচ্চারণ করিতেও আজ তাহার কোথাও বাধিল না।

অথচ পরমাশ্চর্য্য এই যে, এই লোকটিই তাহার সীমাহীন দুঃখের মূল! কাল পর্য্যন্তও ইহার বাতাসে সমস্ত দেহ বিষে ভরিয়া গিয়াছে!

মেঘাবৃত অপরাহ্ন-আকাশ-তলে নির্জ্জন রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে, তাহারই মধ্যে বসিয়া এই দুটি নর-নারী

একেবারে নির্ব্বাক। সুরেশ কি ভাবিতেছিল সেই জানে, কিন্তু তাহার উচ্চারিত বাক্যের কল্পনাতীত নিষ্ঠুরতাকে অতিক্রম করিয়াও আজ নূতন ভয়ে অচলার সমস্ত মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুরেশ নাই—সে একা। এই একাকিত্ব যে কত বৃহৎ, কিরূপ আকুল, তাহা বিদ্যুদ্বেগে তাহার মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় যে তরণী বাহিয়া সে সংসারসমুদ্রে ভাসিয়াছে, সে যে অনিবার্য্য মৃত্যুর মধ্যেই তিল তিল করিয়া ডুবিতেছে, ইহা তাহার চেয়ে বেশি কেহ জানে না, তথাপি সেই সুপরিচিত ভয়ঙ্কর আশ্রয় ছাড়িয়া আজ সে দিক্‌চিহ্নহীন সমুদ্রে ভাসিতেছে, ইহা কল্পনা করিয়াই তাহার সর্ব্বশরীর হিম হইয়া গেল। আর তাহার কেহ নাই; তাহাকে ভালবাসিতে, তাহাকে ঘৃণা করিতে, তাহাকে রক্ষা করিতে, তাহাকে হত্যা করিতে, কোথাও কেহ নাই; সংসারে সে একেবারেই সঙ্গ-বিহীন! এই কথা মনে করিয়া তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সহসা তাহার অশক্ত অবশ ডান হাতখানি খপ করিয়া সুরেশের ক্রোড়ের উপর পড়িতেই সে চমকিয়া চাহিল। অচলা নিরুদ্বেগ কণ্ঠে প্রাণপণে পরিষ্কার করিয়া কহিল, আর কি তুমি আমাকে ভালোবাসো না?

সুরেশ হাতখানি তাহার সযত্নে নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া কহিল, এ প্রশ্নের জবাব তেমন নিঃসংশয়ে দিতে পারি নে অচলা, মনে হয় সে যাই হোক্, এ কথা সত্য যে এই ভূতের বোঝা বয়ে বেড়াবার আর আমার শক্তি নেই।

অচলা আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া অত্যন্ত মৃদু, করুণকণ্ঠে কহিল, তুমি আর কোথায় আমাকে নিয়ে চল—

যেখানে কোন বাঙালী নেই?

হাঁ। যেখানে লজ্জা আমাকে প্রতি নিয়ত বিঁধবে না—

সেখানে কি আমাকে তুমি ভালবাস্তে পার্বে অচলা? এ কি সত্য? বলিতে বলিতেই আকস্মিক আবেগে সে তাহার মাথাটা বুকের উপর টানিয়া লইয়া ওষ্ঠাধর চুম্বন করিল।

অপমানে আজও অচলার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, ঠোঁট দুটি ঠিক তেমনি বিছার কামড়ের মত জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তবুও সে ঘাড় নাড়িয়া চুপি চুপি বলিল, হাঁ। এক সময়ে তোমাকে আমি ভালবাস্তুম। না না—ছি—কেউ দেখতে পাবে। বলিয়া সে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিল। কিন্তু হাতখানি যাহার মুঠার মধ্যে ধরাই রহিল, সে তাহারই উপর পরম স্নেহে একটুখানি চাপ দিয়া কেবল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

গাড়ী বড় রাস্তা ছাড়িয়া রামবাবুর বাঙলোসংলগ্ন উদ্যানের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই বিরাট ওয়েলার-যুগলবাহিত বিপুল-ভার অশ্বযান সমস্ত গৃহ প্রকম্পিত করিয়া দেখিতে দেখিতে গাড়ী-বারান্দার নিচে আসিয়া থামিল।

জমকালো নূতন-পোষাকপরা সহিসেরা গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল এবং সুরেশ নিজে নামিয়া হাত ধরিয়া অচলাকে অবতরণ করাইল। অচলার দৃষ্টি ছিল উপরের বারান্দায়। তথায় অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে রাক্ষুসীও বিছানা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; বহুদিনের পর চোখে চোখে দুই সখীর মুখেই হাসি ফুটিয়া উঠিল। রামবাবু নিচেই ছিলেন, তিনি গায়ের বালাপোষখানা ফেলিয়া দিয়া আনন্দে, সস্নেহ আহ্বান করিলেন, এসো এসো, আমার মা এসো!

এই অপরিচিত কণ্ঠস্বরের ব্যগ্র-ব্যাকুল আবাহনে তাহার হাসিমাখা চোখের দৃষ্টি মুহূর্ত নামিয়া আসিয়া বৃদ্ধের উপর নিপতিত হইল; কিন্তু তাঁহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আজ মহিম—তাহারই প্রতি চাহিয়া যেন পাথর হইয়া গিয়াছে! চোখে চোখে মিলিল, কিন্তু সে চোখে আর পলক

পড়িল না। সর্ব্বাঙ্গের মণি-মুক্তা অচলার তেমনি ঝলসিতে লাগিল, হীরা-মাণিকের দীপ্তি লেশমাত্র নিষ্প্রভ হইল না, কিন্তু তাহাদেরি মাঝখানে প্রস্ফুটিত কমল যেন চক্ষের নিমিষে মরিয়া গেল।

কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে বৃদ্ধের ভুল হইল। অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে তাহাকে সহসা লজ্জায় ম্লান ও বিপন্ন কল্পনা করিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া অচলার আনত ললাট দুই হাতে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, থাক্ মা, আর তোমাকে পায়ের ধূলা নিতে হবে না, তুমি ওপরে যাও—

অচলা কিছুই বলিল না, টলিতে টলিতে চলিয়া গেল।

রামবাবু কহিলেন, সুরেশবাবু, ইনি—

সুরেশ কহিল, বিলক্ষণ! আমরা যে এক ক্লাসের—ছেলে-বেলা থেকে দুজনে আমরা—, বলিয়া সহসা হাসির চেষ্টায় মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, কি মহিম, হঠাৎ তুমি যে—

কিন্তু কথাটা আর শেষ হইতে পারিল না। মহিম মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

হতবুদ্ধি বৃদ্ধ সুরেশের মুখের প্রতি চাহিলেন এবং সুরেশও প্রত্যুত্তরে আর একটা হাসির প্রয়াস করিতে গেল, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না। উপরে যাইবার কাঠের সিঁড়িতে অকস্মাৎ গুরুতর শব্দ শুনিয়া দুজনেই স্তব্ধ হইয়া গেলেন। একটা গোলমাল উঠিল; রামবাবু ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, অচলা উপুড় হইয়া পড়িয়া। সে দুই-তিনটি ধাপ উঠিতে পারিয়াছিল মাত্র, তাহার পরেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ফিরিবার পথে গাড়ীর কোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া অচলা এই কথাটাই ভাবিতেছিল, আজিকার এই মূর্চ্ছাটা যদি আর না ভাঙিত। নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করিবার বীভৎসতাকে সে মনে স্থান দিতেও পারে না, কিন্তু এম্‌নি কোন শান্ত স্বাভাবিক মৃত্যু। হঠাৎ জ্ঞান হারাইয়া ঘুমাইয়া পড়া—তার পরে আর না জাগিতে হয়। মরণকে এমন সহজে পাইবার কি কোন পথ নাই? কেউ কি জানে না?

সুরেশ তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিল, তুমি যে আর কোথাও যেতে চেয়েছিলে, যাবে?

চল।

এর পরে কাল ত এখানে আর মুখ দেখানো যাবে না।

কিন্তু তিনি ত কোন কথাই কাউকে বলবেন না?

সুরেশের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, না। মহিমকে আমি জানি সে ঘৃণায় আমাদের দুর্নামটা পর্য্যন্ত মুখে আনতে চাইবে না।

কথাটা সুরেশ সহজেই কহিল, কিন্তু শুনিয়া অচলার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তার পরে যতক্ষণ না গাড়ী গৃহে আসিয়া থামিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। সুরেশ তাহাকে সযত্নে, সাবধানে নামাইয়া দিয়া কহিল, তুমি একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা কর গে অচলা, আমার কতকগুলো জরুরি চিঠি-পত্র লেখবার আছে। বলিয়া সে নিজের পড়িবার ঘরে চলিয়া গেল।

শয্যায় শুইয়া অচলা ভাবিতেছিল, এই ত তাহার একুশ বৎসর বয়স, ইহার মধ্যে এমন অপরাধ কাহার কাছে সে কি করিয়াছে যে জন্য এত বড় দুর্গতি তাহার ভাগ্যে ঘটিল। এ চিন্তা নূতন নয়, যখন-তখন

ইহাই সে আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিত এবং শিশুকাল হইতে যতদূর স্মরণ হয় মনে করিবার চেষ্টা করিত। আজ অকস্মাৎ মৃণালের এক দিনের তর্কের কথাগুলি তাহার মনে পড়িল এবং তাহারই সূত্র ধরিয়া সমস্ত আলোচনাই সে একটির পর একটি করিয়া মনে মনে আবৃত্তি করিয়া গেল। নিজের বিবাহিত জীবনটা স্বামীর সহিত একপ্রকার তাহার বিরোধের মধ্যে দিয়াই কাটিয়াছে। কেবল শেষ কয়টি দিন তাঁহার রুগ্নশয্যায় স্বামীকে সে বড় আপনার করিয়া পাইয়াছিল। তাঁহার জীবনের যখন আর কোন শঙ্কা নাই, মন যখন নিশ্চিন্ত নির্ভয় হইয়াছে, তখনকার সেই স্নিগ্ধ, সহজ ও নির্ম্মল আনন্দের মাঝে অপরের দুর্ভাগ্য ও বেদনা যখন তাহার বড় বেশি বাজিত, তখন এক দিন মৃণালের গ[illegible] জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধস্বরে কহিয়াছিল, ঠাকুরঝি, তুমি যদি আম[illegible]ব সমাজের, আমাদের মতের হ'তে তোমার সমস্ত জীবনটাকে ত[illegible] ব্যর্থ হ'তে দিতুম না।

মৃণাল হাসি[illegible] জজ্ঞাসা করিয়াছিল, কি কর্‌তে সেজদি, আমার আবার একটা বিয়ে দিতে?

অচলা কহিয়াছিল, নয় কেন? কিন্তু থামো ঠাকুরঝি, তোমার পায়ে পড়ি, আর শাস্ত্রের দোহাই দিয়ো না। ও মল্ল-যুদ্ধ এত হয়ে গেছে যে, হবে শুন্‌লেও আমার ভয় করে।

মৃণাল তেমনি সহাস্যে বলিয়াছিল, ভয় কর্‌বার কথাই বটে। কারণ তাঁদের হুড়োমুড়িটা যে কখন্ কোন্ দিকে চেপে আস্‌বে তার কিছুই বল্‌বার যো নাই। কিন্তু একটা কথা তুমি ভাবো নি সেজদি, যে তাঁরা যুদ্ধ করেন কেবল যুদ্ধব্যবসা ব'লে, কেবল গায়ে জোর আর হাতে অস্ত্র থাকে ব'লে। তাই তাঁদের জিত হার শুধু তাঁদেরই, তাতে আমাদের যায় আসে না। আমাদের ত কোন পক্ষই কোন কথা জিজ্ঞেস করেন না।

অচলা প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু কর্‌লে কি হ'তো?

মৃণাল বলিয়াছিল, সে ঠিক জানি নে ভাই। হয় ত তোমারি মত ভাবতে শিখতুম, হয় ত তোমার প্রস্তাবেই রাজী হতুম, একটা পাত্রও হয় ত এতদিনে জুটে যেতে পার্‌ত। বলিয়া সে হাসিয়াছিল।

এই হাসিতে অচলা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উত্তর দিয়াছিল, আমাদের সমাজের সম্বন্ধে কথা উঠলেই তুমি অবজ্ঞার সঙ্গে বল, সে আমি জানি। কিন্তু আমাদের কথা না হয় ছেড়েই দাও, যাঁরাই এই নিয়ে যুদ্ধ করেন, তাঁরা কি সবাই ব্যবসায়ী? কেউ কি সত্যিকার দরদ নিয়ে লড়াই করেন না।

মৃণাল জিভ কাটিয়া বলিয়াছিল, অমন কথা মনে আন্‌লেও পাপ হয় সেজদি। কিন্তু তা নয় ভাই। কাল সকালেই ত আমি চ'লে যাচ্চি, আবার কবে দেখা হবে জানি নে, কিন্তু যাবার আগে একটা তামাসাও কি কর্‌তে পার্‌ব না? বলিতে বলিতেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সামলাইয়া লইয়া পরে গম্ভীর হইয়া কহিয়াছিল, কিন্তু তুমি ত আমার সকল কথা বুঝতে পারবে না ভাই। বিয়ে জিনিষটি তোমাদের কাছে শুধু একটা সামাজিক বিধান। তাই তার সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচার চলে, তার মতামত যুক্তিতর্কে বদলায়। কিন্তু আমাদের কাছে এ ধর্ম্ম। স্বামীকে আমরা ছেলে-বেলা থেকে এইরূপেতেই গ্রহণ ক'রে আসি। এ বস্তুটি যে ভাই সকল বিচার-বিতর্কের বাইরে!

বিস্মিত অচলা প্রশ্ন করিয়াছিল, বেশ তাও যদি হয়, ধর্ম্ম কি মানুষের বদলায় না ঠাকুরঝি?

মৃণাল কহিয়াছিল, ধর্ম্মের মতামত বদলায়, কিন্তু আসল জিনিষটি কে আর বদ্‌লায় ভাই সেজদি? তাই এত লড়াই-ঝগড়ার মধ্যেও সেই মূল জিনিসটি আজও সকল জাতিরই এক হয়ে রয়েছে। স্বামীর দোষ-গুণের আমরাও বিচার করি, তাঁর সম্বন্ধে মতামত আমাদেরও বদ্‌লায়—

আমরাও ত তাই মানুষ। কিন্তু স্বামী জিনিসটি আমাদের কাছে ধর্ম্ম, তাই তিনি নিত্য! জীবনেও নিত্য, মৃত্যুতেও নিত্য! তাঁকে আর আমরা বদ্‌লাতে পারি নে।

অচলা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিয়াছিল, এই যদি সত্যি, তবে এত অনাচার আছে কেন?

মৃণাল বলিয়াছিল, ওটা থাক্‌বে বলেই আছে। ধর্ম্ম যখন থাকবে না, তখন ওটাও থাকবে না। বেরাল-কুকুরের ত তাই অনাচার নেই!

অচলা হঠাৎ কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কয়েকমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, এতে যদি তোমার সমাজের শিক্ষা, তবে শিক্ষা যাঁরা দেন, তাঁদের এত সন্দেহ, এত সাবধান হওয়া তবু কিসের জন্যে? এত পর্দ্দা এত বাঁধাবাঁধি—সমস্ত দুনিয়া থেকে আড়াল ক'রে লুকিয়ে রাখবার এত প্রাণপণ চেষ্টা কেন? এত জোর-করা সতীত্বের দাম বুঝতুম পরীক্ষার অবকাশ থাক্‌লে।

তাহার উত্তাপ দেখিয়া মৃণাল চমকিয়া হাসিয়া কহিয়াছিল, এ বিধি-ব্যবস্থা যাঁরা ক'রে গেছেন, উত্তর জিজ্ঞাসা কর গে ভাই তাঁদের। আমরা শুধু বাপ-মায়ের কাছে যা শিখেছি, তাই কেবল পালন ক'রে আস্‌চি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জোর ক'রে বলতে পারি সেজদি, স্বামীকে ধর্ম্মের ব্যাপার, পরকালের ব্যাপার ব'লে যে যথার্থই নিতে পেরেচে, তার পায়ের বেড়ি বেঁধেই দাও আর কেটেই দাও তার সতীত্ব আপনা-আপনি যাচাই হয়ে গেছে! বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া ধীরে ধীরে বলিয়াছিল, আমার স্বামীকে ত তুমি দেখেচ? তিনি বুড়ো মানুষ ছিলেন, সংসারে তিনি দরিদ্র, রূপ-গুণও তাঁর সাধারণ পাঁচ জনের বেশি ছিল না, কিন্তু তিনিই আমার ইহকাল, তিনিই আমার পরকাল! এই বলিয়া সে চোখ বুজিয়া পলকের জন্য বোধ করি বা তাঁহাকেই অন্তরের মধ্যে দেখিয়া লইল, তার পরে চাহিয়া

একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, উপমাটা হয় ত ঠিক হবে না সেজদি, কিন্তু এটা মিথ্যা নয় যে, বাপ তাঁর কাণা-খোঁড়া ছেলেটির উপরেই সমস্ত স্নেহ ঢেলে দেন। অপরের সুন্দর সুরূপ ছেলে মুহূর্ত্তের তরে হয় ত তাঁর মনে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি করে, কিন্তু পিতৃধর্ম্মে তাতে লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। যাবার সময়ে তাঁর সর্ব্বস্ব তিনি কোথায় রেখে যান, এ ত তুমি জানো? কিন্তু নিজের পিতৃত্বের প্রতি সংশয়ে যদি কখনো তাঁর পিতৃধর্ম্ম ভেঙ্গে যায়, তখন এই স্নেহের বাষ্পও কোথাও খুঁজে মেলে না! কিন্তু আমাদের শিক্ষা ও চিন্তার ধারা আলাদা ভাই, আমার এই উপমাটা ও কথাগুলো তুমি হয় ত ঠিক বুঝতে পারবে না, কিন্তু এ কথা আমার তুমি ভুলেও বিশ্বাস ক'রো না যে, স্ত্রীকে যে স্ত্রী ধর্ম্ম ব'লে অন্তরের মধ্যে ভাবতে শেখে নি, তার পায়ের শৃঙ্খল চিরদিন বদ্ধই থাক, আর মুক্তই থাক এবং নিজের সতীত্বের জাহাজটাকে সে যত বড় যত বৃহৎই কল্পনা করুক, পরীক্ষার চোরা-বালিতে ধরা পড়লে তাকে ডুবতেই হবে। সে পর্দ্দার ভিতরে ডুববে বাইরেও ডুববে।

তাহাই ত হইল! তখন এ সত্য অচলা উপলব্ধি করে নাই, কিন্তু আজ মৃণালের সেই চোরাবালি যখন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া অহরহ রসাতলের পানে টানিতেছে, তখন বুঝিতে আর বাকি নাই! সে দিন কি কথাটা সে অত করিয়া তাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল। নীরবরুদ্ধ সমাজের অবাধ স্বাধীনতার চোখ-কান খোলা রাখিয়াই সে বড় হইয়াছে, নিজের জীবনটাকে সে নিজে বাছিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এই ছিল তার গর্ব্ব, কিন্তু পরীক্ষার একান্ত দুঃসময়ে এ সকল তাহার কোন কাজে লাগিল না। তাহার বিপদ আসিল অত্যন্ত সঙ্গোপনে বন্ধুর বেশে; সে আসিল জ্যাঠামহাশয়ের স্নেহ ও শ্রদ্ধার ছদ্মরূপ ধরিয়া। এই একান্ত শুভানুধ্যায়ী স্নেহশীল বৃদ্ধের পুনঃ পুনঃ ও নির্ব্বন্ধাতিশয্যে যে দুর্য্যোগের

রাত্রে সে সুরেশের শয্যায় গিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসিল, সেদিন একমাত্র যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত, সে তাহার অত্যাজ্য সতীধর্ম্ম! মৃণাল তাহাকে জীবনে মরণে অদ্বিতীয় ও নিত্য বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সেদিন তাহার বাহিরের খোলসটাই বড় হইয়া তাহার ধর্ম্মকে পরাভূত করিয়া দিল। তাহাদের আজন্ম শিক্ষা ও সংস্কার ভিতরটাকে তুচ্ছ করিয়া, কারাগার ভাবিয়া বাহিরের জগৎটাকেই চিরদিন সকলের উপর স্থান দিয়াছে; যে ধর্ম্ম গুপ্ত, যে ধর্ম্ম গুহাশায়ী, সেই অন্তরের অব্যক্ত ধর্ম্ম কোন দিন তাহার কাছে সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই বাহিরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সে দিনও সে ভদ্রমহিলার সম্ভ্রমের বহির্ব্বাসটাকেই লজ্জায় আঁকড়াইয়া রহিল, এই আবরণের মোহ কাটাইয়া আপনাকে নগ্ন করিয়া কিছুতে বলিতে পারিল না, জ্যাঠামশাই, আমি জানি, আমার এত দিনের পর্ব্বতপ্রমাণ মিথ্যার পরে আজ আমার সত্যকে সত্য বলিয়া জগতে কেহই বিশ্বাস করিবে না; জানি, কাল তুমি ঘৃণায় আর আমার মুখ দেখিবে না, তোমার সতী-সাধ্বী পুত্রবধূর ঘরের দ্বারও কাল আমার মুখের উপর রুদ্ধ হইয়া লাঞ্ছনা আমার জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে; সে সমস্তই সহিবে, কিন্তু তোমার আজিকার এই ভয়ঙ্কর স্নেহ আমার সহিবে না। বরঞ্চ এই আশীর্ব্বাদ আমাকে তুমি কর জ্যাঠামশাই, আমার এত দিনের সতী নামের বদলে তোমাদের কাছে আজিকার কলঙ্কই যেন আমার অক্ষয় হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু হায় রে! একথা তাহার মুখ দিয়া সেদিন কিছুতে বাহির হইতে পায় নাই!

আজ নিষ্ফল অভিমান ও প্রচণ্ড বাষ্পোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ তাহার বারংবার রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, এবং এই অখণ্ড বেদনাকে মহিমের সেই নিষ্ঠুর দৃষ্টি যেন ছুরি দিয়া চিরিতে লাগিল।

এমন করিয়া প্রায় অর্দ্ধেক রাত্রি কাটিল। কিন্তু সকল দুঃখেরই

নাকি একটা বিশ্রাম আছে, তাই অশ্রু-উৎসও এক সময়ে শুকাইল এবং আর্দ্র চক্ষুপল্লব দুটিও নিদ্রায় মুদ্রিত হইয়া গেল।

এই ঘুম যখন ভাঙিল, তখন বেলা হইয়াছে। সুরেশের জন্য দ্বার খোলাই ছিল, কিন্তু সে ঘরে আসিয়াছিল কি না, ঠিক বুঝা গেল না। বাহিরে আসিতে বেহারা জানাইল, বাবুজী অতি প্রত্যুষেই এক্কা করিয়া মাঝুলি চলিয়া গিয়াছেন!

কেউ সঙ্গে গেছে?

না। আমি যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি নিলেন না। বল্‌লেন, প্লেগে মর্‌তে চাস্ ত চল্!

তাই তুমি নিজে গেলে না, কেবল দয়া ক'রে এক্কা ডেকে এনে দিলে? আমাকে জাগালি না কেন?

বেহারা চুপ করিয়া রহিল।

অচলা নিজেও একটু চুপ করিয়া প্রশ্ন করিল, এক্কা ডেকে আন্‌লে কে? তুই?

বেহারা নতমুখে জানাইল, ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন ছিল না; কাল তাহাকে বিদায় দিবার সময় আজ প্রত্যুষেই হাজির হইতে বাবু নিজেই গোপনে হুকুম দিয়াছিলেন।

শুনিয়া অচলা স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা নয়। কাল সন্ধ্যার ঘটনার সহিত ইহার সংস্রব নাই। না ঘটিলেও যাইত— যাওয়ার সংকল্প সে ত্যাগ করে নাই, শুধু তাহারি ভয়ে কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখিয়াছিল মাত্র।

জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কবে ফিরবেন, কিছু ব'লে গেছেন?

সে সানন্দে মাথা নাড়িয়া জানাইল, খুব শিগ্র, পরশু কিংবা তরশু, নয় তার পরের দিন নিশ্চয়।

অচলা আর কোন প্রশ্ন করিল না। কাল সিঁড়িতে পড়িয়া গিয়া

আঘাত কত লাগিয়াছিল, ঠিক ঠাহর হয় নাই, আজ আগাগোড়া দেহটা ব্যথায় যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই উপর রামবাবুর তত্ত্ব লইতে আসার আশঙ্কায় সমস্ত মনটাও যেন অনুক্ষণ কাঁটা হইয়া রহিল। মহিম কোন কথাই যে প্রকাশ করিবে না, ইহা সুরেশের অপেক্ষা সে কম জানিত না, তবুও সর্ব্বপ্রকার দৈবাতের ভয়ে অত্যন্ত ব্যথার স্থানটাকে আগলাইয়া সমস্ত চিত্ত যেমন হুঁসিয়ার হইয়া থাকে, তেমনি করিয়াই তাহার সকল ইন্দ্রিয় বাহিরের দরজায় পাহারা দিয়া বসিয়া রহিল। এম্‌নি করিয়া সকাল গেল, দুপুর গেল, সন্ধ্যা গেল। রাত্রে আর তাঁহার আগমনের সম্ভাবনা নাই জানিয়া নিরুদ্বিগ্ন হইয়া এইবার সে শয্যা আশ্রয় করিল। পাশের টিপয়ে শূন্য ফুলদানী চাপা দেওয়া কোথাকার এক কবিরাজী ঔষধালয়ের সুবৃহৎ তালিকাপুস্তক ছিল, টানিয়া লইয়া তাহারই পাতার মধ্যে শ্রান্ত চোখ দুটি মেলিয়া হঠাৎ কেমনে সে নিজের দুঃখ ভুলিয়া কোন্ এক শ্রীমন্মহারাজাধিরাজের [illegible] আরম্ভ করিয়া বামুনঘাটি মাইনর স্কুলের তৃতীয় [illegible] আরোগ্য হওয়ার বিবরণ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বেহারা বলিয়াছিল, বাবু ফিরিবেন পরশু কিংবা তরশু কিংবা তাহার পরের দিন নিশ্চয়। কিন্তু এই তাহার পরের দিনের নিশ্চয়তাকে সমস্ত দিন ধরিয়া পরীক্ষা করিবার মত শক্তি আর অচলার ছিল না। এই তিন দিনের মধ্যে রামবাবু এক দিনও আসেন নাই। তাঁহার আসাটাকে সে সর্ব্বান্তঃকরণে ভয় করিয়াছে, অথচ এই না-আসার নিহিত অর্থকে কল্পনা করিয়াও তাহার দেহ কাঠ হইয়া গিয়াছে। তিনি অসুস্থ ছিলেন, এবং ইতিমধ্যে পীড়া যে বাড়িতেও পারে, এ কথা তাহার মনেও উদয় হয়

নাই। কেবল আজ সকালে ও-বাড়ির দরওয়ান্ আসিয়াছিল, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে পাঁড়েজীর নিকট হইতেই বিদায় লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সে কেন আসিয়াছিল, কি খবর লইয়া গেল, কোন কথা অচলা ভয়ে কাহাকেও জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার পর হইতেই এই বাড়ি, এই ঘর-দ্বার, এই সব লোকজন সমস্ত হইতে ছুটিয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে, তাহার- এম্নি মনে হইতে লাগিল।

বেহারাকে ডাকিয়া কহিল, রঘুবীর, তোমার বাড়ি ত এই দিকে, তুমি মাঝুলি গ্রামটা জানো ?

সে কহিল, অনেক কাল পূর্ব্বে একবার বরিয়াত গিয়েছিলাম মাইজী।

কতদূর হবে বল্‌তে পারো ?

রঘুবীর এ দেশের লোক হইলেও বহুদিন বাঙালীর সংস্রবে তাহার অনেকটা হিসাব-বোধ জন্মিয়াছিল, সে মনে মনে আন্দাজ করিয়া কহিল! ক্রোশ ছয়-সাতের কম নয় মাইজী।

আজ তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারো ?

রঘুবীর ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুমি যাবে ? সেখানে যে ভারি পিলেগের বেমারী ?

অচলা কহিল, তুমি না যেতে পারো, আর কোন চাকরকে রাজী করিয়ে দিতে পারো ? সে যা বকশিস চায়, আমি দেবো।

রঘুবীর ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, মাইজী, তুমি যেন পারবে, আর আমি পারব না ? কিন্তু রাস্তা নেই, আমাদের ভারি গাড়ী ত যাবে না। এক্কা কিংবা খাটুলি—তার কোনটাতেই ত তুমি যেতে পারবে না মাইজী !

অচলা কহিল, যা জোটে, আমি তাতেই যেতে পারবো। কিন্তু আর ত দেরি কর্‌লে চল্‌বে না রঘুবীর। তুমি যা পাও একটা নিয়ে এসো।

রঘুবীর আর তর্ক না করিয়া অল্পকালের মধ্যেই একটা থাটুলি সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং নিজের লোটা কম্বল লাঠিতে ঝুলাইয়া সেটা কাঁধে ফেলিয়া বারের মতই পদব্রজে সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। বাড়ির খবরদারির ভার দরওয়ান্ ও অন্যান্য ভৃত্যদের উপরে দিয়া কোন্ এক অজানা মাঝুলির পথে অচলা যখন একমাত্র সুরেশকেই লক্ষ্য করিয়া আজ গৃহের বাহির হইল, তখন সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার নিজের কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত স্বপ্নের মত ঠেকিতে লাগিল। তাহার বার বার মনে হইল, এই বিচিত্র জগতে এমন ঘটনাও এক দিন ঘটিবে, এ কথা কে ভাবিতে পারিত!

ধুলা-বালির কাঁচা পথ একটা আছে। কিন্তু কখনও তাহা সুবিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে অস্পষ্ট, কখনও বা ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে লুপ্ত, অবরুদ্ধ। গৃহস্থের সুবিধা ও মর্জ্জিমত তাহার আয়তন ও উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া কখনো বা নদীর ধার দিয়া, কখনো বা গৃহপ্রাঙ্গণের উপর দিয়াই সে গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছে। প্রথম কিছু দূর পর্য্যন্ত তাহার কৌতূহল মাঝে মাঝে সজাগ হইয়া উঠিতেছিল। একটা মৃতদেহ একখণ্ড বাঁশে বাঁধিয়া কয়েক জন লোককে নিকট দিয়া বহন করিয়া যাইতে দেখিয়া সংক্রমণের ভয়ে তাহার দেহ সঙ্কুচিত হইয়াছিল, ইচ্ছা করিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিয়া লয়, কিসে মরিয়াছে, ইহার বয়স কত এবং কে কে আছে। কিন্তু পথের দূরত্ব যত বাড়িয়া চলিতে লাগিল, বেলা তত পড়িয়া আসিতে লাগিল এবং কাছে ও দূর গ্রামের মধ্য হইতে কান্নার রোল যত তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল, ততই সমস্ত মন যেন কি এক প্রকার জড়তায় ঝিমাইয়া পড়িতে লাগিল। বহুক্ষণ হইতে তাহার তৃষ্ণা বোধ হইয়াছিল, এইখানে কতকটা পথ নদীর উচ্চ পাড়ের উপর দিয়া যাইতে যাইতে একটা ঘাটের কাছে আসিয়া সে ডুলি থামাইয়া অবতরণ করিল এবং হাত-মুখ ধুইয়া জল খাইবার জন্য নিচে নামিতেই তাহার চোখে পড়িল,

গোটা-দুই অর্দ্ধগলিত সব অনতিদূরে আটকাইয়া রহিয়াছে। ইহাদের বীভৎস বিকৃতি তাহার মনের উপর এখন কোন আঘাতই করিল না। অত্যন্ত সহজেই সে হাত-মুখ ধুইয়া জল খাইয়া ধীরে ধীরে গিয়া তাহার খাটুলিতে বসিল। কোন অবস্থাতেই ইহা যে তাহার পক্ষে সম্ভবপর, কিছুকাল পূর্ব্বে এ কথা বোধ করি সে চিন্তাও করিতে পারিত না।

ইহার পর হইতে প্রায় গ্রামগুলাই পরিত্যক্ত, শূন্য, কদাচিৎ কোন অত্যন্ত দুঃসাহসী ব্যক্তি ভিন্ন যে যেথায় পারিয়াছে পলায়ন করিয়াছে। কোথাও শব্দ নাই, সাড়া নাই, ঘর-দ্বার রুদ্ধ, অপরিচ্ছন্ন—মনে হয় যেন, এ কুটীরগুলা পর্য্যন্ত মরণকে অনিবার্য্য জানিয়া চোখ বুজিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। এই মৃত্যুশাসিত নির্জ্জন পল্লীগুলার ভিতর দিয়া চলিতে রঘুবীর ও বাহকদিগের চাপা-গলা এবং ত্রস্ত-ভীত পাদক্ষেপ প্রতিমুহূর্ত্তেই অচলাকে বিপদের বার্ত্তা জানাইতে লাগিল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার ভয়ই হইল না, ইহার সহিত তাহার যেন কোন্ আজন্ম পরিচয় আছে, সমস্ত অন্তঃকরণ এমনি নির্ব্বিকার হইয়া রহিল।

এই ভাবে বাকি পথটা অতিবাহিত করিয়া ইহারা যখন মাঁঝুলিতে উপস্থিত হইল, তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। অচলার দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল, তাহাদের পথের দুঃখ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হইবে। গ্রামের কৃতজ্ঞ নর-নারী ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের সংবর্দ্ধনা করিয়া ডাক্তার সাহেবের দরবারে লইয়া যাইবে, তথায় রোগী ও তাহাদের আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের আনা-গোনায়, ঔষধ-পথ্যের বিতরণের ঘটায় সমস্ত স্থানটা ব্যাপিয়া যে সমারোহ চলিতেছে, তাহার মধ্যে অচলার নিজের স্থানটা যে কোথায় হইবে, ইহার চিত্রটা যে একপ্রকার কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আসিয়া দেখিল, তাহার কল্পনা কেবল নিছক কল্পনাই। তাহার সহিত ইহার কোথাও কোন অংশে মিল নাই, বরঞ্চ যে চিত্র পথের দুই ধারে দেখিতে দেখিতে সে আসিয়াছে এখানেও সেই

ছবি। এখানেও পথে লোক নাই, বাড়ি-ঘর-দ্বার রুদ্ধ, ইহার কোথায় কোন্ পল্লীতে যে সুরেশ বাসা করিয়াছে, খুঁজিয়া পাওয়াই যেন কঠিন।

এই গ্রামে প্রত্যহ একটা হাট আজও বসে বটে এবং অন্য সময়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পুরা দমে চলিতেও থাকে সত্য, কিন্তু এখন দুর্দ্দিনের বেচা-কেনা সারিয়া লোকজন অপরাহ্ণের বহুপূর্ব্বেই পলাইয়াছে—ভাঙা হাটের স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন পড়িয়া আছে মাত্র।

রঘুবীর খোঁজাখুঁজি করিয়া একটা দোকান বাহির করিল। বৃদ্ধ দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করিতেছিল, সে কহিল, তাহার ছেলে-মেয়েরা সবাই স্থানান্তরে গিয়াছে, কেবল তাহারা দুই জন বুড়া-বুড়ী দোকানের মায়া কাটাইয়া আজিও যাইতে পারে নাই। সুরেশের সম্বন্ধে এইটুকুমাত্র সন্ধান দিতে পারিল যে ডাক্তারবাবু নন্দ পাঁড়ের নিমতলার ঘরে এত দিন ছিলেন বটে, কিন্তু এখনও আছেন কিংবা মামুদপুরে চলিয়া গিয়াছেন সে অবগত নয়।

মামুদপুর কোথায়?

সিধী ক্রোশ-দুই দক্ষিণে।

নন্দ পাঁড়ের বাড়িটা কোন্ দিকে?

বৃদ্ধ বাহির হইয়া দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একটা বিশাল নিমগাছ দেখাইয়া দিয়া কহিল, এই পথে গেলেই দেখা যাইবে।

অনতিকাল পরে ভীত পরিশ্রান্ত বাহকেরা যখন নিমতলায় আসিয়া খাটুলি নামাইল, তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। বাড়িটা বড়; পিছনের দিকে দুই-একটা পুরাতন ইটের ঘর দেখা যায়; কিন্তু অধিকাংশই খোলার। সম্মুখে প্রাচীর নাই—চমৎকার ফাঁকা। গৃহস্বামীকে দরিদ্র বলিয়াও মনে হয় না, কিন্তু একটা লোকও বাহির হইয়া আসিল না। কেবল প্রাঙ্গণের এক ধারে বাঁধা একটা টাটু-ঘোড়া ক্ষুৎপিপাসার নিবেদন জানাইয়া অত্যন্ত করুণ-কণ্ঠে অতিথিদের অভ্যর্থনা করিল।

সদর-দরজা খোলা ছিল, রঘুবীর সাহস করিয়া ভিতরে গলা বাড়াইতেই দেখিতে পাইল, পাশের বারান্দায় চারপাইয়ের উপর সুরেশ শুইয়া আছে এবং কাছেই খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া একজন অতিবৃদ্ধ স্ত্রীলোক বসিয়া ঝিমাইতেছে।

বাবুজী!

সুরেশ চোখ মেলিয়া চাহিল এবং কনুয়ের ভর দিয়া মাথা তুলিয়া ক্ষণকাল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিল, কে বেয়ারা? রঘুবীর?

রঘুবীর সেলাম করিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু প্রভুর রক্ত-চক্ষুর প্রতি চাহিয়া তাহার মুখে কথা সরিল না।

তুই এখানে?

রঘুবীর পুনরায় সেলাম করিল এবং বাহিরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া শুধু কেবল বলিল, মাইজী—

এবার সুরেশ বিস্ময়ে সোজা উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোকে পাঠিয়েছেন?

রঘুবীর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না, তিনি নিজেই আসিয়াছেন।

জবাব শুনিয়া সুরেশ এমন করিয়া তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল, যেন কথাটাকে ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহার বিলম্ব হইতেছে। তার পরে চোখ বুজিয়া ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল, কিছুই বলিল না।

অচলা আসিয়া যখন নীরবে খাটিয়ার এক ধারে তাহার গায়ের কাছেই উপবেশন করিল, তখন কিছুক্ষণের নিমিত্ত সে তেমনই নিমীলিত-নেত্রে মৌন হইয়া রহিল, ভদ্রতা রক্ষা করিতে সামান্য একটা 'এসো' বলিয়াও ডাকিতে পারিল না। শিশুকাল হইতে চিরদিন অত্যধিক যত্ন আদরে লালিত-পালিত হইয়া আবেগে ও প্রবৃত্তির বশেই সে চলিয়াছে।

ইহাদের সংযত করার শিক্ষা তাহার কোনকালে হয় নাই। এই শিক্ষা জীবনে সে প্রথম পাইয়াছিল, কেবল সেই দিন, যে দিন তাহার মুখের হাসিকে পদাঘাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া মহিম ঘরের চলিয়া গেল। সেদিন এক নিমিষে তাহার বুকের মধ্যে নীরবে যে কি বিপ্লব বহিয়া গেল সে শুধু অন্তর্যামীই জানিলেন এবং আজও কেবল তিনি দেখিলেন, ঐ শান্ত অচঞ্চল দেহটার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া কত বড় ঝড় প্রবাহিত হইতেছে। সে দিনও মহিমের আঘাতকে সে যেমন করিয়া সহ্য করিয়াছিল, আজও তেম্‌নি করিয়াই সে তাহার উন্মত্ত আবেগের সহিত নিঃশব্দে লড়াই করিতে লাগিল—তাহার লেশমাত্র আক্ষেপ প্রকাশ পাইতে দিল না।

এমন করিয়া যে কতক্ষণ কাটিত বলা যায় না, কিন্তু বাহকদের আহ্বানে রঘুবীর বাহিরে চলিয়া গেলে, সেই শব্দে সুরেশ ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল। কহিল, তুমি আমার চিঠি পেয়েছ?

অচলা মুখ না তুলিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, না।

সুরেশ একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, চিঠি না পেয়েই এসেছ, আশ্চর্য্য! যাই হোক, এ ভালই হ'ল যে, একবার দেখা হ'ল। বলিয়া একটা কথার জন্য তাহার আনত মুখের প্রতি এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া নিজেই কহিল, আমার জন্য তোমাকে অনেক দুঃখ পেতে হ'ল—খুব সম্ভব, যত দিন বাঁচবে, এর জের মিট্‌বে না, কিন্তু মস্ত ভুল হয়েছিল এই যে, মহিমকে তুমি যে এতটা বেশি ভালবাসতে তা আমিও বুঝি নি, বোধ হয় তুমিও কোন দিন বুঝতে পারো নি! না?

কিন্তু অচলা তেমনি অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল দেখিয়া সে আবার বলিল, তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, মানুষের মন ব'লে স্বতন্ত্র কোন একটা বস্তু নেই। যা আছে, সে এই দেহটারই ধর্ম্ম। ভালবাসাও তাই। ভেবেছিলাম, তোমার দেহটাকে কোনমতে পেলে মনটাও পাবো, তোমার ভালবাসাও দুষ্প্রাপ্য হবে না—কে জানে, হয় ত সত্যিই

কোন দিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'তো—হয় ত যা সর্ব্বস্ব দিয়ে এমন করে চেয়েছিলাম, তাই তুমি একদিন নিজের ইচ্ছেয় আমাকে ভিক্ষে দিতে! কিন্তু আর তার সময় নেই; আমি অপেক্ষা করবার অবসর পেলাম না। বলিয়া সে পুনরায় কনুয়ে ভর দিয়া মাথা তুলিল এবং সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকের মধ্যে নিজের দুই চক্ষের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া অচলার আনত মুখের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

একজনের এই একাগ্র দৃষ্টি আর একজনের সন্নত দৃষ্টিকে যেন আকর্ষণ করিয়া তুলিল—কিন্তু পলকমাত্র। অচলা তৎক্ষণাৎ চোখ নামাইয়া লইয়া অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে অত্যন্ত লজ্জার সহিত কহিল, এ দেশ থেকে ত সবাই পালিয়েছে—এখানকার কাজ যদি তোমার শেষ হয়ে থাকে ত বাড়ি, কিংবা আরও কত দেশ আছে—তুমি চল, ডিহরীতে আর এক দণ্ড টিক্‌তে পাচ্চি নে।

সে আমার বেশি আর কে জানে? বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুরেশ বালিসে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণ নিঃশব্দে স্থির-ভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, অনেক কষ্টে আজ সকালে দুখানা চিঠি পাঠাতে পেরেছি। একখানা তোমাকে আর একখানা মহিমকে। সে যদি না এর মধ্যে চলে গিয়ে থাকে ত নিশ্চয় আসবে, আমি জানি।

শুনিয়া অচলা ভয়ে, বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল, কহিল, তাঁকে কেন?

সুরেশ তেমনি ধীরে ধীরে বলিল, এখন তাকেই আমার একমাত্র প্রয়োজন। ছেলে-বেলা থেকে সংসারের মধ্যে অনেক দিন অনেক গ্রন্থিই পাকিয়েছি, আর তাদের খোলবার জন্যে এই মানুষটিকে চিরদিন আবশ্যক হয়েছে। তাই আজও তাকেই আমার ডাক দিতে হয়েছে। এত ধৈর্য্য পৃথিবীতে আর ত কারও নেই!

অচলার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল, কিন্তু সে অধোমুখে

স্থির হইয়াই শুনিতে লাগিল। সুরেশ বলিল, আমার চিঠির মধ্যে প্রায় সব কথাই লেখা আছে—পড়লেই টের পাবে। সে দিন তোমার হাতে আমার সমস্ত সম্পত্তির পাকা উইলখানাই দিয়েছি। ইচ্ছে করলে তার অনেক জিনিসই তুমি নিতে পারো, কিন্তু আমি বলি, নিয়ে কাজ নেই। বরঞ্চ আমি বেঁচে থাকলেও যেমন গরীব-দুঃখীরাই সমস্ত পেতো, আমার মরণের পরেও যেন তারাই পায়। আমার কিছুর সঙ্গেই আর তুমি নিজেকে জড়িয়ে রেখো না অচলা—তুমি নিশ্চিন্ত হও, নির্ব্বিঘ্ন হও—আমার সমস্ত সংস্রব থেকে তুমি নিজেকে যেন সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন করতে পারো! চেষ্টা করলে পৃথিবীতে অনেক দুঃখই সহা যায়—আমার দেওয়া দুঃখও যেন এক দিন তুমি অনায়াসে সইতে পারো।

তাহার আচরণে ও কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে অচলার মনের মধ্যে আসিয়া পর্য্যন্তই কেমন যেন ভয় ভয় করিতেছিল, এই শেষের কথাটায় সে যথার্থ ই ভীত হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি এ সব কথা তুলচ কেন? উঠে ব'স না! যাতে আমরা এখনি বার হয়ে পড়তে পারি, তার উদ্যোগ ক'রে দাও না!

তাহার আশঙ্কা ও উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়াও সুরেশ কোন উত্তর দিল না। যে বৃদ্ধা খুঁটি ঠেস দিয়া ঝিমাইতেছিল, সে সজাগ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু এখন ঘরের মধ্যে যাবেন, না আলোটা বাইরে এনে দেবে—তাহারও কোন জবাব দিল না; মনে হইতে লাগিল, সহসা যেন সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। উদ্বিগ্ন অচলা তাহার পূর্ব্ব-প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিতে যাইতেছিল, সুরেশ চোখ মেলিয়া অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, এখনও তোমাকে আমার আসল কথাটাই বলা হয় নি অচলা, আমি মরতে বসেছি—আমার বাঁচবার বোধ করি আর কোন সম্ভাবনাই নেই।

প্রত্যুত্তরে শুধু একটা অস্ফুট, অব্যক্ত কণ্ঠস্বর অচলার গলা হইতে

স্থির হইয়া আসিল, তার পরেই সে মূর্তির মত নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

সুরেশ বলিতে লাগিল, আগে থেকেই আমি স্টেইল ক'রে রেখেছি বটে, কিন্তু কেউ যদি মনে করে, আমি ইচ্ছে ক'রে মরছি, সে অন্যায়, সে মিথ্যা—সে আমার মরার চেয়ে বেশি ব্যথা হবে। আমি সতর্কতার এতটুকু ত্রুটি করি নি, কিন্তু কিছুই লাগল না। যদি কখনো তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, তাদের তুমি এই কথাটা ব'লো যে সংসারে আরও পাঁচ-জনের যেমন মৃত্যু হয়, তাঁরও মৃত্যু তেমনি হয়েছে—মরণকে কেবল এড়াতে পারেন নি বলেই মরেছেন, নইলে মরবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। মরণের মধ্যে আমার কোন হাত, কোন বিশেষত্ব ছিল, এই অপবাদটা আমাকে যেন কেউ না দেয়!

অচলা কিছুই বলিল না। কথা কহিবার শক্তি যে তাহার শুকাইয়া গিয়াছিল, এ কথা সেই প্রায়ান্ধকারের মধ্যে তাহার ভয়ার্ত্ত মুখের প্রতি চাহিয়া সুরেশ ধরিতে পারিল না। ক্ষণকাল আপনাকে সে সংবরণ করিয়া লইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আমি না এসে থাকতে পারি নে বলেই তোমাকে লুকিয়ে সেদিন ভোর-বেলায় পালিয়ে এসেছিলুম। এসে দেখি, গ্রাম প্রায় শূন্য। এ বাড়িতে একটা চাকর মরেছে এবং তার কোন গতি না করেই বাড়িশুদ্ধ সবাই পালাতে উদ্যত হয়েছে। তাদের নিরস্ত করতে পারলুম না বটে, কিন্তু মড়াটার একটা উপায় হ'ল। ফিরে এসে ভাবলুম, আমিও বাড়ি চলে যাই; কিন্তু দুপুর-বেলা মামুদপুর থেকে একটা ছেলে কাঁদতে কাঁদতে এসে জানালে, তার মায়ের অসুখ। তাকে অস্ত্র করতে গিয়েই নিজের এই বিপদ ঘটালুম। এমন অনেক ত করেছি, আমি সাবধানও কম নই, কিন্তু এবার দুর্ভাগ্য এম্‌নি যে, একার চাকায় বুড়ো আঙুলের পিছনটা যে ঘঁষে গিয়েছিল, সেটা কেবল চোখে পড়ল হাতের রক্ত ধুতে গিয়ে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে যা

করবার সমস্তই করলুম, বাড়ি যাবার উপায় থাকলে আমি চলেই যেতুম, কিছুতেই থাকতুম না, কিন্তু কোন উপায় করতে পারলুম না! রাত্রে জ্বর বেড়ে গেল—এ যে কিসের জ্বর; সে যখন বুঝতে আর বাকি রইল না, তখন অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায় একটা লোক দিয়ে তোমাদের দুজনকে দুখানা চিঠি লিখে পাঠিয়েছি।

অচলা অশ্রু-ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কিন্তু এখন ত উপায় আছে, আমার ডুলিতে নিয়ে তোমাকে এখনি আমি বেড়িয়ে পড়ব—আর এক মিনিট্ থাকতে দেব না।

কিন্তু তুমি?

আমি হেঁটে যাবো—আমার কথা তুমি কিছুতে ভাবতে পাবে না।

হেঁটে যাবে? এতটা পথ?

তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আর বাধা দিয়ো না, বলিতে বলিতেই অচলা কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরেশ পলক মাত্র মৌন হইয়া রহিল, তার পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা, তাই চল। কিন্তু বোধ হয়, এর আর প্রয়োজন ছিল না।

অচলা বাহিরে আসিয়া দেখিল, গাছতলায় বসিয়া রঘুবীর নীরবে চানা-ভাজা চর্ব্বণ করিতেছে, কহিল, রঘুবীর, বাবুর বড় অসুখ, তাঁকে এখ্খুনি নিয়ে যেতে হবে। ডুলি-ওয়ালাদের বল, তারা যত টাকা চায়, আমি তার চেয়ে বেশি দেব—কিন্তু আর এক মিনিটও দেরি নয়।

প্রভু-পত্নীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে রঘুবীর চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কিন্তু তারা ত দুজনকে বইতে পারবে না মাইজী!

না না, দুজনকে নয়, দুজনকে নয়। আমি হেঁটে যাবো, কিন্তু আর একমিনিটও দেরি চলবে না রঘুবীর, তুমি শিগ্ গির যাও—কোথায় তারা?

রঘুবীর কহিল, ভাড়ার টাকা নিয়ে তারা দোকানে গেছে খাবার

...তে। এখুনি ডেকে আনছি মা-জী, বলি... অভুক্ত চানা-ভাজা ...বস্ত্রের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে একপ্রকার ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া অচলা সুরেশের শিয়রে বসিল, ... হাত দিয়া তাহার কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। মুনিয়ার মা কেরোসিনের ডিবা জ্বালিয়া অনতিদূরে মেঝের উপর রাখিয়া গিয়াছিল, তাহার অপর্য্যাপ্ত ধূমে সমস্ত স্থানটা কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেইটা সরাইতে গিয়া একটা ঔষধের শিশি অচলার চোখে পড়িল, ... জিজ্ঞাসা করিল, একি তোমার ওষুধ?

সুরেশ বলিল, হাঁ, আমারই। কাল নিজেই তৈরী করেছিলুম, কিন্তু খাওয়া হয়নি। দাও—

কথাটা অচলাকে তীব্র আঘাত করিল, কিন্তু না খাওয়ার হেতু লইয়াও আর সে কথা বাড়াইতে ইচ্ছা করিল না। ঔষধ দিয়া শিয়রে আসিয়া সে আবার তেমনি নীরবে উপবেশন করিল। অনেকক্ষণ হইতেই সুরেশ মৌন হইয়াই ছিল, কিন্তু সে নিঃশব্দে কত বড় যাতনা সহিতেছে, ইহাই উপলব্ধি করিয়া অচলার বুক ফাটিতে লাগিল।

বিলম্ব হইতেছে, ... দেখা নাই। মাঝে মাঝে সে পা টিপিয়া উঠিয়া গিয়া দরজায় মুখ বাড়াইয়া অন্ধকারে যতদূর দেখা যায়, দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও কাহারও সাড়া নাই। ... এই উৎকণ্ঠা তাহার কোনমতে সুরেশের কাছে ধরা পড়িয়া যায় ... ভয়ে সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

রাত্রি বাড়িয়া যাইতে লাগিল, খুঁটির কাছে মুনিয়ার মায়ের নাসিকা ডাকিয়া উঠিল—এমন সময়ে ক্ষুধিত পথশ্রান্ত রঘুবীর যমদূতের ন্যায় উপস্থিত হইয়া ম্লান-মুখে জানাইল, বেহারারা ডুলি লইয়া বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কোথাও তাহাদের সন্ধান মিলিল না।

অচলা সমস্ত ভুলিয়া বিকৃত-কণ্ঠে ... করিতে লাগিল,

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ওলো সেজদি !

অচলা পাশের ঘর হইতে ব্যস্ত হইয়া এ ঘরে আসিয়া পড়িল।

মৃণালের কোমরে আঁচল জড়ানো—সে একটা ছোট দেরাজ একলাই টানা-টানি করিয়া সোজা করিয়া রাখিতেছিল। অচলা ঘরে ঢুকিতেই, সে মহা রাগতভাবে চেঁচাইয়া উঠিল, ওরে মুখপোড়া মেয়ে, তুমি নবাবের মত হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাকবে, আর আমি তোমার শোবার ঘর গুছিয়ে দেব? নাও কচি ওই ঝাঁটাটা তুলে—ঐ কোণটা পরিষ্কার ক'রে ফেল। বলিয়া হাসি আর চাপিতে না পারিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চেঁচামেচি শুনিয়া হরির মাও পিছনে পিছনে আসিয়াছিল, সে কহিল, তোমার এক কথা দিদি। বাড়িতে কতগণ্ডা দাসদাসী—দিদি-মণির কি কোন দিন ঝাঁটা হাতে করা অভ্যাস আছে না কি যে, আজ পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মত ঘর ঝাঁট দিতে যাবে? আমি দিচ্চি, বলিয়া সে ঝাঁটাটা তুলিতে যাইতেছিল—মৃণাল কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে তাহাকে একটা ধমক দিয়া কহিল, তুই থাম্ মাগী। দিদিমণিকে আমার চেয়ে তুই বেশি চিনিস্ না কি যে, সালিশি করতে এসেছিস্? বলিয়া অচলার হাতের মধ্যে ঝাঁটা গুঁজিয়া দিয়া হরির মাকে হাসিয়া বলিল, ওরে, তোর দিদিমণি ইচ্ছে করলে যে কাজ পারে, তা তোর সাতগণ্ডা

পাড়াগাঁয়ের মেয়েতে পারে না। অচলাকে কহিল, নাও ত সেজদি, ঐ কোণটা চট্ ক'রে ঝেড়ে ফেল ত।

অচলা ঝাঁট দিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিল, মৃণালদিদি, তুমি যাদুবিদ্যে জানো, না?

মৃণাল কহিল, কেন বল দেখি?

অচলা বলিল, তা নইলে এই বাড়ি পরিষ্কার কর্‌বার জন্য ঝাঁটা হাতে নিয়েচি, এ ভোজবিদ্যে নয় ত কি?

মৃণাল কহিল, তুমি নেবে না ত কে নেবে গো? তোমার বাড়ি ঝাঁট-পাট দেবার জন্যে কি ও পাড়া থেকে পদির মাসি আস্‌বে না কি? নাও, কথা কয়ে সময় নষ্ট করতে হবে না, সন্ধ্যা হয়।

অচলা কাজ করিতে করিতে হাসিয়া কহিল, নিজেও এক দণ্ড বস্‌বে না, আমাকেও খাটিয়ে খাটিয়ে মারলে, সত্যি বল্‌চি, মৃণালদিদি, এই পাঁচ-ছদিন যে খাটান্ আমাকে খাটিয়েচ, চা বাগানের কর্ত্তারাও বোধ করি, তাদের কুলীদের এত ক'রে খাটায় না।

মৃণাল কাছে আসিয়া তাহার চিবুকের উপর আঙ্গুলের একটা ঘা দিয়া বলিল, তাই ত, ঘর-দোর দেখে মনে হচ্ছে, বাড়িতে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েছে, খাটুনি বল্‌চিস্ ভাই সেজদি—যে দিন স্বামি-পুত্র, ঘর-কন্না নিয়ে নাবার খাবার সময় পাবে না, শুধু তখনি ত এই মেয়েমানুষ-জন্মটা সার্থক হবে। ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি, এক দিন যেন তোমার সে দিন আসে—এখুনি খাটুনির হয়েচে কি গিন্নি! বলিয়া হাসিতে গেল বটে, কিন্তু তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া গেল।

হরির মা হঠাৎ ভ্যাক্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, সেই আশীর্ব্বাদ কর দিদি, শুধু সেই আশীর্ব্বাদই কর! তাহার অচলার মাকে মনে পড়িয়া গিয়াছিল—সেই সাধ্বী অত্যন্ত অসময়ে যখন স্বর্গারোহণ করেন, তখন একরত্তি মেয়েকে হরির মায়ের হাতেই সঁপিয়া দিয়া

গিয়াছিলেন। সেই মেয়ে এখন এত বড় হইয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে।

মৃণাল তাহাকে ধমক্ দিয়া বলিল, আ-মর্! ছিচকাঁদুনি মাগী, কাঁদিস্ কেন?

হরির মা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কাঁদি কি সাধে দিদি? তোমার কথা শুনে কান্না যে কিছুতে ধ'রে রাখতে পারি নে। মাইরি বল্‌চি, তুমি না এসে পড়লে এ বাড়িতে একটা রাতও যে আমাদের কি ক'রে কাট্‌ত, তাই আমি ভেবে পাই নে।

আজ ছয় দিন হইল, মৃণাল এ বাটীতে আসিয়াছে। আসিয়া পর্য্যন্ত বাড়ি-ঘর-দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষগুলোর পর্য্যন্ত চেহারা বদ্‌লাইয়া দিবার কার্য্যেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার সব কাজকর্ম্ম, হাসি-ঠাট্টার মধ্য হইতে একটা যাই যাই ভাব অচলাকে পীড়া দিতেছিল। কারণ, মৃণালের কাজে-কথায়, আচারে-ব্যবহারে এত বড় একটা সহজ আত্মীয়তা ছিল, যাহার আড়ালে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইয়া অচলা উঁকি মারিয়া তাহার নূতন জীবনের অচেনা ঘর-কন্নাকে চিনিয়া লইবার সময় পাইতেছিল এবং ইহার চেয়েও একটা বড় জিনিসকে তাহার ভাল করিয়া এবং বিশেষ করিয়া চিনিবার কৌতূহল হইয়াছিল, সে স্বয়ং মৃণালকে। তাহার সাংসারিক অবস্থা যে স্বচ্ছল নহে, তাহা তাহার সম্পূর্ণ অলঙ্কার বর্জ্জিত হাত দুখানির পানে চাহিলেই টের পাওয়া যায়। তাহাতে ভগ্ন-স্বাস্থ্য বৃদ্ধ স্বামী—কোন দিক্ দিয়াই যাহাকে তাহার উপযুক্ত বলিয়া অচলার মনে হয় না; তাহার উপর বাড়িতে পরিশ্রমের অন্ত নাই—জরাজীর্ণ শাশুড়ী মর মর অবস্থায় অহর্নিশি গলায় ঝুলিতেছে, কারণে-অকারণে তাহার বকুনি-ঝকুনির বিরাম নাই —এ কথা সে মৃণালের নিজের মুখেই শুনিয়াছে—অথচ কোন প্রতিকূলতাই যেন দুঃখ দিয়া এই মেয়েটিকে তাহার জীবন-যাত্রার

পথে অবসন্ন করিয়া বসাইয়া দিতে পারে না। হৃদয়ের আনন্দ-নিরানন্দ ছাড়া বাহিরের কোন কিছুর যেন অস্তিত্বই নাই—এম্‌নি এই মূর্খ-পাড়াগাঁয়ের মেয়েটার ভাব। অনুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সে বেশ বুঝিতেছিল, পদ্ম যেমন পাকের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াও মলিনতার অতীত, ঠিক তেমনি যেন এই লেখাপড়া না-জানা দরিদ্র পল্লী-লক্ষ্মীটিও সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক দুঃখ-দারিদ্র্যের ক্রোড়ে অহোরাত্র বাস করিয়াও, সমস্ত বেদনা-যন্ত্রণার উপরে অবলীলাক্রমে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। না আছে তাহার দেহের ক্লান্তি, না আছে তাহার মুখের শান্তি। সুতরাং অচলাকেও সে যে সকল অনভ্যস্ত কাজের মধ্যে অবিশ্রান্ত টানিয়া লইয়া ফিরিতেছিল, যদিচ তাহার কোনটার সহিত তাহার শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কারের সামঞ্জস্য ছিল না, তথাপি না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ানটা যেন অতি-বড় লজ্জার কথা, এখনই অচলার মনে হইতেছিল। নিজের ভাগ্যটাকেও যে একবার ধিক্কার দিবার জন্য সে এক মুহূর্ত্ত বসিয়া শোক করিবে, এই ছয়টা দিনের মধ্যে সে ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত তাহার মিলে নাই—সমস্ত সময়টা সে কাজ দিয়া, হাসি-গল্প দিয়া এমনি ভরাট করিয়া গাঁথিয়া আনিতেছিল। তাই তাহার শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়া যাইবার ইঙ্গিতমাত্রেই অচলার মনে হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত মেটে বাড়িটা তাহার দরজা-জানলা-দেয়াল সমেত যেন তাদের ঘরের মত চক্ষের নিমিষে উপুড় হইয়া পড়িয়া যাইবে, মৃণালদিদি চলিয়া গেলে, এখানে সে এক দণ্ডও তিষ্ঠিবে কি করিয়া?

সন্ধ্যার পর এক সময়ে অচলা কহিল, কেবল যে পালাই পালাই কর্‌চ মৃণালদিদি, বাপের বাড়ি এসে কে এত শিঘ্র ফিরে যায় বল ত? তা হবে না—আমি যত দিন না কল্‌কাতায় ফিরে যাব, তত দিন তোমাকে থাকতেই হবে।

মৃণাল কহিল, কি করব ভাই সেজদি, শাশুড়ীবুড়ী না নিজে মরবে,

না আমাকে একদণ্ড ছেড়ে দেবে। আমি বলি, বুড়ী তুই মর্। তোর ছেলের বয়স ষাট হতে চল্‌ল, শেষে তাকে খেয়ে তবে যাবি? তা এত যে দিবারাত্রি কাসে, দম্‌টা ত একবারও আট্‌কে যায় না।

অচলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তোমাকে বুঝি তিনি দেখতে পারেন না!

মৃণাল মাথা নাড়িয়া কহিল, দুটি চক্ষে না।

অচলা কহিল, আর তুমি?

মৃণাল বলিল, আমিও না। বুড়ীকে গঙ্গা-যাত্রা করিয়ে আমি পাঁচ-সিকের হরির-লুট দেব মানত ক'রে রেখেছি যে!

অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, বিশ্বাস হয় না মৃণালদিদি! তুমি সংসারে কাকে যে দেখতে পারো না তা তোমার মুখের কথা শুনে কিছুতেই বল্‌বার যো নেই! হয় ত এই বুড়ীকেই তুমি সব চেয়ে বেশি ভালবাস।

মৃণাল হাসিমুখে কহিল, সব চেয়ে বেশি ভালবাসি? তা হবে। বলিয়া অচলার গাল টিপিয়া দিয়া কাজে চলিয়া গেল।

যাই যাই করিয়া মৃণালের আবার কিছুদিন গড়াইয়া গেল। এক দিন হঠাৎ অচলার চোখে পড়িল যাবার দিকে তাহার মুখে যত তাড়া, কাজের দিকে তত নয়। সত্যই চলিয়া যাইতে সে যেন ঠিক এত উৎসুক নয়। এতদিন তাহার অন্তরালে দাঁড়াইয়া পৃথিবীকে সে যে ভাবে চিনিয়া লইতেছিল, এখন তাহার আবরণের বাহিরে আসিয়া, পৃথিবীর সে চেহারা তাহার চোখে যেন আর রহিল না। এ বাটীতে পা দিয়া পর্য্যন্ত যখনই তাহাকে স্বামীর সঙ্গে কোন একটা হাসি তামাসা করিতে দেখিয়াছে, তখনই তাহার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এখন মাঝে মাঝে যেন সূচ ফুটিতে লাগিল। এসব কিছুই নয়, ইহার মধ্যে যথার্থ পরিহাস ভিন্ন আর কিছুই নাই—মন খারাপ

করিবার কোন হেতু নাই—তাহার মন বড় অশুচি—এমনি করিয়া আপনাকে সে যতই শাসন করিবার চেষ্টা করে, ততই কোথা হইতে সংশয়ের বিপরীত তর্ক তাহার হৃদয়ের মধ্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বারংবার মুখ তুলিয়া তাহাকে ভ্যাঙচাইতে থাকে। মহিমের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য এইখানে যেন অতিশয় বাড়াবাড়ি বলিয়া তাহার মনে হয়। সে এই বলিয়া বিতর্ক করিতে থাকে, ভিতরে যদি কিছুই নাই, তবে পরিহাসের জবাব পরিহাস দিয়া করিতেই বা দোষ কি! যে তামাসা করিয়া উত্তর দিতে পারে না, সে ত অন্ততঃ হাসিমুখে সেটা উপভোগ করিতেও পারে! অথচ সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়, মৃণালের রহস্যালাপের সূত্রপাতেই মহিম লজ্জিত মুখে কোনমতে তাড়াতাড়ি অন্যত্র পলাইয়া বাঁচে। তাই কোথায় কি একটা যেন প্রচ্ছন্ন অন্যায় রহিয়াছে, আজ কাল এ চিন্তা কোনমতেই সে মন হইতে সম্পূর্ণ তাড়াইতে পারে না। মৃণালের সঙ্গে একত্র কাজ-কর্ম্ম করিতে করিতেও তাহার একশবার মনে হয়, সে নিজে মেয়েমানুষ হইয়া যখন বুকের মধ্যে একটা ঈর্ষ্যার বেদনা বহন করিতে থাকিয়াও ইহাকে কোনমতে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে না, একত্র এতকাল ঘর করিয়াও কি কোন পুরুষমানুষে এ মেয়েকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে?

মৃণাল আসিলেই যে উড়ে বামুন তাহার রান্নাঘরের দায় হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিত, এ কথা অচলা জানিত না। এবারেও সে ছুটী পাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; কিন্তু অচলা কেবলই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল, মৃণাল নিজের হাতে রাঁধিয়া মহিমকে খাওয়াইতে যেন প্রাণ দিয়া ভালবাসে। আজ সকালে সে হঠাৎ বলিয়া বসিল, মৃণালদিদি, আজ তোমার ছুটী।

মৃণাল বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কিসের ভাই সেজদি?

অচলা কহিল, রান্নার। আজ আমিই রাঁধব।

মৃণাল অবাক্ হইয়া বলিল, পোড়া কপাল! তুমি আবার রাঁধবে কি?

অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, বাঃ, আমি বুঝি জানি নে? বাড়িতে আমি ত কত দিন রেঁধেছি। সে হবে না মৃণালদিদি, আজ আমি রাঁধবই।

তাহার আগ্রহ দেখিয়া মৃণাল হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল; কহিল, সে কি হয়, আমি থাকৃতে তুমি কি দুঃখে রান্নাঘরের ধুঁয়োর মধ্যে কষ্ট পেতে যাবে ভাই?

তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া অচলা জিদ্ করিয়া বলিল, তা হ'লে বামুন থাক্তে তুমিই বা কেন কষ্ট কর? এ বেলা আমি নিশ্চয় রাঁধব।

কেন যে তাহার এই আগ্রহ, মৃণাল তাহার কিছুই বুঝিল না। সে হাসি চাপিয়া কৃত্রিম অভিমানের স্বরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বা রে মেয়ে! একে একে বুঝি তুমি আমার সব কেড়েকুড়ে নিতে চাও? সবই ত নিয়েছ, দুটো দিন রেঁধে খাইয়ে যাবো, তাও বুঝি সইচে না? এখন থেকে সতীনের হিংসে সুরু হ'ল বুঝি?

অচলার বুকের ভিতরটায় আবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মৃণালের শেষ কথাটা গিয়া তাহার ঈর্ষার ব্যথায় সজোরে ঘা দিল। সে এক মুহূর্তেই গম্ভীর হইয়া শুধু সংক্ষেপে কহিল, না, আজ আমিই রাঁধব।

এতক্ষণে মৃণাল দেখিতে পাইল, অচলা রাগ করিয়াছে। তাই আর তর্কাতর্কি না করিয়া বিষণ্ণ-মুখে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বেশ, তা হ'লে তুমিই রাঁধো গে। আচ্ছা চল, কোথায় কি আছে, দেখিয়ে দিয়ে আসি।

মহিম যে এতক্ষণ ঘরেই ছিল, তাহা দুজনের কেহই জানিত না। সহসা তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া উভয়েই অপ্রতিভ হইয়া গেল।

মহিম অচলাকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, মৃণাল যে ক'দিন আছে, ওই রাঁধুক না।

কেন যে সে এত আপত্তি করিতেছিল, মহিম তাহা জানিত। কিন্তু সে কথা ত খুলিয়া বলা চলে না।

অচলা আরও জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু রাগ চাপিয়া শুধু কহিল, না, আমিই রাঁধতে যাচ্ছি, বলিয়াই বাদানুবাদের অপেক্ষামাত্র না করিয়া দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

অচলা জোর করিয়া রাঁধিতে গেল। রান্নার কাজে সে কাহারও চেয়েই খাটো ছিল না; কিন্তু এদিকে সে মন দিতেই পারিল না। বিগত দিনের সমস্ত কাহিনী নড়িতে-চড়িতে কেবলই খচ খচ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, হয় ত মহিম কোন দিনই তাহাকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে নাই। তাহার বিবাহের অনতিকাল পূর্ব্বে সুরেশকে লইয়া যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, এই সকল কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া মনে করিয়া আজ সহসা সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, মহিম তাহার প্রতি চিরদিনই উদাসীন; এমন কি, পিতার অভিমতে পূর্ব্ব-সম্বন্ধ যখন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল, তখনও মহিম যে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই, ইহাতে তাহার যেন আর লেশমাত্র সংশয় রহিল না।

এখানে আসা অবধি মৃণাল ও অচলা একসঙ্গে আহারে বসিত। দুপুর-বেলা হরির মাকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া অচলা মৃণালের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মৃণালদিদির জ্বরের মত হয়েছে, তিনি খাবেন না।

অচলা কোন কথা না কহিয়া মৃণালের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মৃণাল চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়াছিল; অচলা কহিল, খাবে চল মৃণালদিদি।

মৃণাল চাহিয়া দেখিয়া, একটুখানি হাসিয়া বলিল, তুমি খাও গে ভাই সেজদি, আমার শরীর ভাল নেই।

অচলা শুষ্কস্বরে প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে? জ্বর?

মৃণাল কহিল, তাই মনে হচ্চে। আজ উপোস করলেই সেরে যাবে।

অচলা হেঁট হইয়া হাত দিয়া মৃণালের কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, আমি অত বোকা নই মৃণালদিদি, খাবে চল।

মৃণাল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মাইরি বল্‌চি সেজদি, আমার খাবার জো নেই। কেন তুমি আবার কষ্ট ক'রে ডাকতে এলে ভাই! বরং চল, আমি না হয় গিয়ে তোমার সুমুখে বস্‌চি।

অচলা কঠিন হইয়া কহিল, এক জন অভুক্ত বন্ধুকে মুখের সাম্‌নে বসিয়ে রেখে খাবার শিক্ষা আমরা পাই নি মৃণালদিদি!

মৃণাল তথাপি হাসিবার প্রয়াস করিয়া বলিল, আর বন্ধুর যদি ভোজনের উপায় না থাকে, তা হ'লে?

অচলা তেমনিভাবে জবাব দিল, নেই কেন আগে শুনি? তোমার জ্বর হয় নি, হয়েছে রাগ। নিজে না খেয়ে আমাকেও শুকোবে, এই যদি তোমার ইচ্ছে হয়ে থাকে ত স্পষ্ট ক'রে বল, আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না।

মৃণাল তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিল, স্বামীর দিব্য ক'রে বল্‌চি সেজদি, আমি এতটুকু রাগ করি নি। কিন্তু আমার খাবার জো নেই। চল দিদি, আমি তোমাকে কোলে ক'রে ব'সে খাওয়াই গে।

অচলা কহিল, তা হ'লে জ্বরটর নয়? ওটা শুধু ছল।

মৃণাল চুপ করিয়া রহিল। অচলা নিজেও কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, এতক্ষণে বুঝলুম। কিন্তু গোড়াতেই যদি মুখ ফুটে ব'লে দিতে মৃণালদিদি, আমার ছোঁয়া তুমি ঘৃণায় মুখে দিতে পারবে না, তা হ'লে এই অন্যায় জিদ্ ক'রে তোমাকেও কষ্ট দিতুম না, নিজেও দাসী-চাকরের সামনে লজ্জায় পড়তুম না! তা সে যাক—আমাকে মাপ ক'রো ভাই—কিন্তু দুধ ত ছোঁয়া যায় না

শুনেছি, তাই এক বাটি এনে দিই—আর যদু গিয়ে দোকান থেকে গিয়াছিল ; সন্দেশ কিনে আনুক। কি বল ? ...রুর মত চক্ষের

প্রথমটা মৃণাল হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া রহিল ; খানিক ...বং দরজার আড়ালে কাটিয়া গেলেও সে কথা কহিল না, অধোমুখে নির্ব্বাক্‌ ... পালা দর্শন করিয়া

অচলা পুনরায় খোঁচা দিয়া কহিল, কি বল ? ...াগিল।

মৃণাল আঁচলে চোখ মুছিয়া মৃদুকণ্ঠে শুধু ক... ঘরে প্রবেশ করিল, তখন

অচলা আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু চলিয়া গেল। ...স্কার তাহাকে ইতরতার হাত হইতে

মৃণাল মুখও তুলিল না, কথা আত্মসংবরণ করিয়া, কঠোর হাসি হাসিয়া র্‌াঁধিয়া দিতে হয় ; তিনি অ... লোক পাড়াগায়ে এসে বাস করার মত শুনিলে কোনকালে যে তাঁদের অল্পই আছে, না ?

এ কথা সে আভাসেও ...র প্রতি চাহিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,

অচলা রান্নাঘরে কথা বলছ ত ? বুঝতে পারি, প্রথমটা তোমার নানা- নিজের ঘরে গিয়া ... ; কিন্তু মৃণালের সঙ্গে যে তোমার বনিবনাও হবে না, এ কেবল ঘৃণায় ...তে ভাবি নি। কেন না, তার সঙ্গে কোন দিন কারও কথা মিথ্যা ব...।

আঘাত করি... কহিল, আমার সঙ্গেই যে পাড়াশুদ্ধ লোকের চিরকাল অচলা পা...হয়, এ খবরই বা তুমি কোথায় শুনলে ?

হইয়া... মহিম ধীরে ধীরে বলিল, তোমার সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি—থাক্‌, এ সব কথায় এখন কাজ নেই।

অচলা অধিকতর জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, মৃণালদিদিও ত সমস্ত দিন না খেয়েই বাড়ি গেলেন ; কিন্তু তাঁর সঙ্গে হেসে কথা কইতে ত তোমার আপত্তি হয় নি !

মহিম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, এ সব তুমি কি বলচ অচলা ?

অচলা কহিল, আমি এই বলছি যে, কি এমন গুরুতর অপরাধ

তোমার কাছে করেছি, যাতে এই অপমানটা আমাকে না কর্‌লে তোমার চল্‌ছিল না ?

মহিম হতবুদ্ধি হইয়া পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল। কহিল, কি বল্‌ছ ? এ সব কথার মানে কি ?

অচলা অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, মানে এই যে, কি অপরাধে আমাকে এই অপমান কর্‌লে তুমি ? তোমার কি করেছি আমি ?

মহিম বিহ্বল হইয়া উঠিল, বলিল, আমি তোমাকে অপমান করেছি ?

অচলা বলিল, হাঁ, তুমি।

মহিম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, মিছে কথা।

অচলা মুহূর্ত্তকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তার পরে কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া বলিল, আমি কোন দিন মিছে কথা বলি নে। কিন্তু সে কথা যাক্ ; এখন তোমার নিজের যদি সত্যবাদী ব'লে অভিমান থাকে, সত্য জবাব দেবে ?

মহিম উৎসুক-দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া রহিল।

অচলা প্রশ্ন করিল, মৃণালদিদি যা ক'রে আজ চ'লে গেলেন, তাকে কি তোমাদের পাড়াগাঁয়ের সমাজে অপমান করা বলে না ?

মহিম বলিল, কিন্তু তাতে আমাকে জড়াতে চাও কেন ?

অচলা কহিল, বল্‌চি। আগে বল, তাকে কি বলা হয় এখানে ?

মহিম কহিল, বেশ, তাই যদি হয়—

অচলা বাধা দিয়া কহিল, হয় নয়, ঠিক জবাব দাও।

মহিম কহিল, হাঁ, পাড়াগাঁয়েও অপমান বলেই লোকে মনে করে।

অচলা কহিল, করে ত ? তবে তুমি সমস্ত জেনেশুনে এই অপমান করিয়েছ। তুমি নিশ্চয় জান্‌তে, তিনি আমার ছোঁয়া রান্না খাবেন না। ঠিক্ কি না ? বলিয়া সে নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া মহিমের বুকের ভিতর পর্য্যন্ত যেন তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টি প্রেরণ করিতে লাগিল। মহিম তেমনি

অভিভূতের মত শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

ঠিক্ এমনি সময়ে বাহির হইতে সুরেশের চীৎকার আসিয়া পৌঁছিল—মহিম! কোথা হে?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এ কি, সুরেশ যে! এস এস, বাড়ির ভেতরে এস। ভাল ত?

মহিমের স্বাগত-সম্ভাষণ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সুরেশ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতের গ্লাডষ্টোন ব্যাগটা নামাইয়া রাখিয়া কহিল, হাঁ, ভাল। কিন্তু কি রকম, একা দাঁড়িয়ে যে? অচলা বধূঠাকুরাণী এক মুহূর্ত্তে সচলা হয়ে অন্তর্ধান হলেন কিরূপে? তাঁর প্রবল বিশ্রম্ভালাপ মোড়ের ওপর থেকে যে আমাকে এ বাড়ির পাত্তা দিলে!

বস্তুতঃ অচলার শেষ কথাটা রাগের মাথায় একটু জোরে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক দ্বারের বাহিরেই তাহা সুরেশের কানে গিয়াছিল।

সুরেশ কহিল, দেখলে মহিম, বিদুষী স্ত্রী-লাভের সুবিধে কত? কদিনই বা এসেছেন, কিন্তু এর মধ্যেই পাড়াগাঁয়ের প্রেমালাপের ধরণটা পর্য্যন্ত এম্নি আয়ত্ত ক'রে নিয়েছেন যে, খুঁত বের ক'রে দেয়, পাড়াগাঁয়ে মেয়েরও তা সাধ্য নয়।

মহিম লজ্জায় আকর্ণ রাঙা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরেশ ঘরের দিকে চাহিয়া অচলাকে উদ্দেশ করিয়া পুনরায় কহিল, অত্যন্ত অসময়ে এসে রসভঙ্গ ক'রে দিলুম বৌঠান্, মাপ ক'রো। মহিম, দাঁড়িয়ে রইলে যে? বস্‌বার কিছু থাকে ত নিয়ে চল, একটু বসি। হাঁটতে হাঁটতে তীর্থের পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে—ভালা জায়গায় বাড়ি করেছিলে ছিল না। চল, চল, কল্‌কাতায় চল।

সুতরাং আজন্মকাল হৃদয়ের ব্যাপারে যাহার একান্ত দুর্ব্বল বলিয়াই অখ্যাতি ছিল এবং নিজেও যাহা সে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিত, সেই সুরেশ যখন অকস্মাৎ অচলার সম্পর্কে শেষ মুহূর্ত্তে আপনার এতবড় কঠোর সংযমের পরিচয় পাইল, তখন নিজের মধ্যে এই অজ্ঞাত শক্তির দেখা পাইয়া কেবল আত্মপ্রসাদই লাভ করিল না, তাহার সমস্ত হৃদয় গর্ব্বে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অচলার বিবাহের পরে দুটো দিন সে আপনাকে নিরন্তর এই কথাই বলিতে লাগিল—সে শক্তিহীন, অক্ষম নয়—সে প্রবৃত্তির দাস নয়; বরঞ্চ আবশ্যক হইলে সমস্ত প্রবৃত্তিটাকেই সে বুকের ভিতর হইতে সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া দিতে পারে। বন্ধুত্ব যে কি, তাহার সুখের জন্য একজন যে কতখানি ত্যাগ করিতে পারে, এইবার বন্ধু ও বন্ধু-পত্নী বুঝুন গিয়া।

কিন্তু কোন মিথ্যা দিয়াই দীর্ঘকাল একটা ফাঁক ভরাইয়া রাখা যায় না; আত্ম-সংযম তাহার সত্য বস্তু নয়, ইহা আত্ম-প্রতারণা। সুতরাং একটা সম্পূর্ণ সপ্তাহ না কাটিতেই এই মিথ্যা সংযমের মোহ তাহার বিস্ফারিত হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে নিষ্কাশিত হইয়া তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া আনিতে লাগিল. মন তাহার বারংবার বলিতে লাগিল, এই স্বার্থত্যাগের দ্বারা সে পাইল কি? ইহা তাহাকে কি দিল? কোন্ অবলম্বন লইয়া সে আপনাকে এখন খাড়া রাখিবে? পিসিমা বলিলেন, বাবা, এইবার তুই এমনি একটি বৌ ঘরে আন, আমি নিয়ে সংসার করি।

একদিন সমাজের দোর-গোড়ায় কেদারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি স্পষ্টই বলিলেন, কাজটা তাহার ভাল হয় নাই। মহিমের সহিত বিবাহ দিতে ত গোড়াগুড়িই তাহার ইচ্ছা ছিল না—শুধু সে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল বলিয়াই তিনি অবশেষে মত দিলেন। ঘরে আসিয়া তাহার মনের মধ্যে অভিশাপের মত জাগিতে লাগিল, এই বিবাহ দ্বারা তাহাদের

কেহই যেন সুখী না হয়। নিজের অবস্থাকে অতিক্রম করার অপরাধ বন্ধুও অনুভব করুন, অচলাও যেন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া আত্ম-গ্লানিতে দগ্ধ হইয়া মরে। কিন্তু তাই বলিয়া মন তাহার ছোট নয়। এই অকল্যাণ কামনার জন্য নিজেকে সে অনেক রকম করিয়া শাসিত করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার পীড়িত, প্রতারিত হৃদয় কিছুতেই বশ মানিল না—নিতান্ত একগুঁয়ে ছেলের মত নিরন্তর ঐ কথাই আবৃত্তি করিতে লাগিল। এমনি করিয়া মাস-খানেক সে কোনমতে কাটাইয়া দিয়া একদিন কৌতূহল আর দমন করিতে না পারিয়া অবশেষে ব্যাগ হাতে মহিমের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুরেশ বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, এখন দেখতে পাচ্চো মহিম, আমার কথাটা কতখানি সত্যি?

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ কথাটা?

সুরেশ বিজ্ঞের মত বলিল, আমার পল্লীগ্রামে বাস নয় বটে, কিন্তু এর সমস্তই আমি জানি। আমি তথাপি কি সাবধান করে দিই নি যে, গ্রামের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে একটা ঘোরতর বিরোধ বাধবে?

মহিম সহজভাবে কহিল, কৈ, তেমন বিরোধ ত কিছু হয় নি।

বিরোধ আর বল কাকে? তোমার বাড়িতে কেউ খেলে কি? সেইটেই কি যথেষ্ট অশান্তি অপমান নয়?

আমি খেতে কাউকে বলি নি।

বল নি? আচ্ছা, কৈ, বৌ-ভাতে আমাকে ত নেমন্তন্ন কর নি মহিম?

ওটা হয় নি বলেই করি নি।

সুরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল, বৌ-ভাত হয় নি? ওঃ—তোমাদের যে আবার—কিন্তু এমন ক'রে কটা উপদ্রব এড়ানো যাবে মহিম? আপদ-বিপদ আছে, ছেলে-মেয়ের কাজ-কর্ম্ম আছে—সংসার করতে গেলে নেই কি? আমি বলি—

যদুর হাতে চায়ের সরঞ্জাম এবং নিজে থালায় করিয়া মিষ্টান্ন লইয়া অচলা প্রবেশ করিল। সুরেশের শেষ কথাটা তাহার কানে গিয়াছিল; কিন্তু তাহার মুখের ভাবে সুরেশ তাহা ধরিতে পরিল না। দুই বন্ধুর জলযোগ এবং চা-পান শেষ হইলে মহিম কাঁধের উপর চাদরটা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের জমীদার মুসলমান, তাঁহার ছেলেটিকে মহিম ইংরাজি পড়াইত। জমীদার সাহেব নিজে লেখাপড়া না জানিলেও তাঁহার ঔদার্য্য ছিল, এবং মহিমের সহিত সদ্ভাবও যথেষ্ট ছিল। এইজন্য গ্রামের লোক সমাজের দোহাই দিয়া আজও তাহার উপদ্রব করিতে সাহস করে নাই।

অচলা কহিল, আজ পড়াতে না গেলেই কি হ'ত না?

মহিম কহিল, কেন?

অচলার মনের জোর ও অন্তরের নির্ম্মলতা যত বড়ই হোক, সুরেশের সহিত তাহার সম্বন্ধটা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে তাহার আকস্মিক অভ্যাগমে কোন রমণীই সঙ্কোচ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না। সুরেশকে সে ভাল করিয়াই চিনিত; তাহার হৃদয় যত মহৎই হোক, সেই হৃদয়ের ঝোঁকের উপর তাহার কোন আস্থা ছিল না—এমন কি, ভয়ই করিত। এই সন্ধ্যায় তাহারই সহিত তাহাকে একাকী ফেলিয়া যাইবার প্রস্তাবে সে মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; কিন্তু বাহিরে তাহার লেশমাত্রও প্রকাশ না করিয়া হাসিয়া কহিল, বাঃ, সে কি হয়? অতিথিকে একলা ফেলে—

মহিম কহিল, তাতে অতিথি সৎকারের কোন ত্রুটি হবে না। তা ছাড়া, তুমি ত রইলে—

অচলা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কিন্তু আমিও থাকতে পারব না। সুরেশের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমাদের উড়ে বামুনটি এম্নি পাকা রাঁধুনী যে, তার সঙ্গে না থাকলে কিছুই মুখে দেবার যো থাক্‌বে না। আমি বলি, তুমি বরঞ্চ—

মহিম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, তা হয় না। ঘণ্টা-দুই বৈ ত নয়। বলিয়া ঘরের কোণ হইতে সে লাঠিটা হাতে তুলিয়া লইল। একে ত মহিমের কাজের ধারা সহজে বিপর্য্যস্ত হয় না; তাহাতে এই একটা সামান্য কারণ লইয়া বারংবার নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতেও অচলার লজ্জা করিতে লাগিল, পাছে ভয়টা তাহার সুরেশের চোখে ধরা পড়িয়া লজ্জাটা শতগুণ হইয়া উঠে।

মহিম ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। তাহাকে শুনাইয়া সুরেশ অচলাকে হাসিয়া কহিল, কেন নিজের মুখ হেঁট করা! চিরকাল জানি, ও সে পাত্রই নয় যে, কারও কথা রাখবে। তুমি বরং যা হোক্ একখানা বই আমাকে দিয়ে নিজের কাজে যাও—আমার দিব্যি সময় কেটে যাবে।

কথাটা হঠাৎ অচলাকে বাজিল যে, বাস্তবিকই মহিম কোন দিন কোন অনুরোধই তাহার রক্ষা করে না। হউক না ইহা তাহার সুমহৎ গুণ; কিন্তু তবুও সুরেশের মুখ হইতে স্বামীর এই আজন্ম কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় তাহারই সম্মুখে আজ তাহাকে অপমানকর উপেক্ষার আকারে বিঁধিল। কোন কথা না কহিয়া, সে নিজের ঘরে গিয়া, যদুকে দিয়া একখানা বাঙলা বই পাঠাইয়া দিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া মহিম জিজ্ঞাসা করিল, সুরেশ কতদিন এখানে থাক্‌বে তোমাকে বল্‌লে?

এম্‌নি ত নানা কারণে আজ সারাদিনই স্বামীর উপর তাহার মন প্রসন্ন ছিল না; তাহাতে এই প্রশ্নের মধ্যে একটা কুৎসিত বিদ্রূপ নিহিত আছে কল্পনা করিয়া, সে চক্ষের নিমিষে জ্বলিয়া উঠিল; কঠোরকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তার মানে?

মহিম অবাক্ হইয়া গেল। সে সোজাভাবেই কথাটা জানিতে চাহিয়াছিল, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কিছুই করে নাই। তাহাদের এতক্ষণের

আলাপের মধ্যে এ প্রশ্নটা সে বন্ধুকে সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই এবং সুরেশ নিজে হইতে তাহা বলে নাই। কিন্তু তাহার আশা ছিল, সুরেশ নিশ্চয়ই অচলাকে তাহা বলিয়াছে।

মহিমকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অচলা নিজেই বলিল, এ কথার মানে এত সোজা যে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করবারও দরকার নেই। তোমার বিশ্বাস যে, সুরেশবাবু কোন সঙ্কল্প নিয়েই এখানে এসেছেন, এবং তা সফল হ'তে কত দেরি হবে, সে আমি জানি। এই ত?

মহিম আরও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, আমার ও-রকম কোন বিশ্বাস নেই। কিন্তু মৃণালের ব্যবহারে আজ তোমার মন ভাল নেই, তুমি কিছুই ধীরভাবে বুঝতে পারবে না। আজ শোও, কাল সে কথা হবে। বলিয়া নিজেই বিছানায় শুইয়া পাশ ফিরিয়া নিদ্রার উদ্যোগ করিল।

অচলাও শুইয়া পড়িল বটে, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। তাহার মনের মধ্যে সারাদিন যে বিরক্তি উত্তরোত্তর জমা হইয়া উঠিতেছিল, সামান্য একটা কলহের আকারে তাহা বাহির হইয়া যাইতে পারিলে হয় ত সে সুস্থ হইতে পারিত; কিন্তু এমন করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়ায়, সে নিজের মধ্যেই শুধু পুড়িতে লাগিল। অথচ যে প্রসঙ্গ বন্ধ হইয়া গেল, তাহাকে অশিক্ষিত সাধারণ স্ত্রীলোকের মত গায়ে পড়িয়া আন্দোলন করায় যে লজ্জা এবং ইতরতা আছে, তাহাও তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে শুধু কল্পনায় স্বামীকে প্রতিপক্ষ দাঁড় করাইয়া, জ্বালাময়ী প্রশ্নোত্তরমালায় নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া শয্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

একটু বেলায় ঘুম ভাঙিয়া অচলা ধড়মড় করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, যদু কেৎলি হাতে করিয়া রান্না ঘরে চলিয়াছে। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কিছু ব'লে গেছেন যদু?

যদু কহিল, এক প্রহর বেলার মধ্যেই ফিরে আসবেন বলে গেছেন।

মহিম প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া নিজের ক্ষেতখামার দেখিতে যাইত; ফিরিয়া আসিতে কোন দিন বা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইত।

অচলা প্রশ্ন করিল, নতুনবাবু উঠেছেন?

যদু কহিল, উঠেছেন বৈ কি! তিনিই ত চা তৈরি করতে ব'লে দিলেন।

অচলা তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, সুরেশ বহুক্ষণ পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া ঘরের সমস্ত জানালা খুলিয়া দিয়া, খোলা দরজার সুমুখে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া কাল্‌কের সেই বইখানা পড়িতেছে। অচলার পদশব্দে সুরেশ বই হইতে মুখ তুলিয়া চাহিল। অচলার মুখের উপর রাত্রিজাগরণের সমস্ত চিহ্ন দেদীপ্যমান। চোখের নিচে কালি পড়িয়াছে, গণ্ড পাংশু, ওষ্ঠ মলিন—সে যত দেখিতে লাগিল, ততই তাহার দুই চক্ষু ঈর্ষ্যার আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিল না।

তাহার চাহনির ভঙ্গীতে অচলা বিস্মিত হইল, কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারিল না; কহিল, কখন্ উঠলেন? আমার উঠতে আজ দেরি হয়ে গেল।

তাই ত দেখছি, বলিয়া সুরেশ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল, সুমুখের দেওয়ালের গায়ে বহুদিনের পুরাতন একটা বড় আরসি টাঙ্গান ছিল; ঠিক সেই সময়েই অচলার দৃষ্টি তাহার উপরে পড়ায়, সুরেশের চাহনির অর্থ এক মুহূর্ত্তেই তাহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং নিজের শ্রীহীনতার লজ্জায় যেন সে একেবারে মরিয়া গেল। এই মুখখানা কেমন করিয়া লুকাইবে, কোথায় লুকাইবে, সুরেশের মিথ্যা ধারণার কি করিয়া প্রতিবাদ করিবে—কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া সে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল—বলিতে বলিতে গেল, যাই আপনার চা নিয়ে আসি গে।

সুরেশ কোন কথা বলিল না ; শুধু একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শূন্য-দৃষ্টিতে শূন্যের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

মিনিট-দশেক পরে চায়ের সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া অচলা পুনরায় যখন প্রবেশ করিল, তখন সুরেশ আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়াছিল। চা খাইতে খাইতে সুরেশ কহিল, কৈ, তুমি চা খেলে না ?

অচলা হাসিয়া কহিল, আমি আর খাই নে।

কেন খাও না ?

আর ভাল লাগে না ! তা ছাড়া, এ জায়গাটা গরম না কি, খেলে ঘুম হয় না। কাল ত প্রায় সারারাত ঘুমোতে পারি নি। হাসিয়া বলিল, একটা রাত ঘুম না হ'লে চোখ-মুখের কি যে শ্রী হয়—পোড়া মুখ যেন আর লোকের সাম্‌নে বার করা যায় না। বলিয়া লজ্জিত-মুখে হাসিতে লাগিল।

সুরেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু এ তোমার ছেলে-বেলার অভ্যাস, চা খেতে মহিম অনুরোধ করে না ?

অচলা হাসিয়া বলিল, অনুরোধ কর্‌লেই বা শুন্‌বে কে ? তা ছাড়া এ আর এমন কি জিনিস যে, না খেলেই নয় ?

এ হাসি যে শুষ্ক হাসি সুরেশ তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তুমি ত জান, ভূমিকা ক'রে কথা বলা আমার অভ্যাসও নয়, পারিও নে। কিন্তু স্পষ্ট ক'রে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে কি তুমি রাগ কর্‌বে ?

অচলা হাসি-মুখে কহিল, শোন কথা। রাগ কর্‌ব কেন ?

সুরেশ কহিল, বেশ। তা হ'লে জিজ্ঞাসা করি, তুমি এখানে সুখে আছ কি ?

অচলার হাসি-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল ; বলিল, এ প্রশ্ন আপনার করাই উচিত নয়।

কেন নয় ?

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, না। আমি সুখে নেই—এ কথা আপনার মনে হওয়াই অন্যায় !

সুরেশ একটুখানি ম্লান-হাসি হাসিয়া বলিল, মনটা কি ন্যায়-অন্যায় ভেবে নিয়ে তবে মনে করে অচলা ? কেবল মাস-দুই পূর্ব্বে এ ভাবনা শুধু যে আমার উচিত ছিল, তাই নয়, এ ভাবনায় অধিকার ছিল। আজ দুমাস পরে সব অধিকার যদি ঘুচে থাকে ত থাক্, সে নালিশ করি নে, এখন শুধু সত্যি কথাটা জেনে যেতে চাই। এসে পর্য্যন্ত একবার মনে হচ্ছে জিতেছি, একবার মনে হচ্চে হেরেছি। আমার মনটা ত তোমার অজানা নেই—একবার সত্যি ক'রে বল ত অচলা, কি ?

দুর্নিবার অশ্রুর ঢেউ অচলার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল ; কিন্তু প্রাণপণে তাহাদের শক্তি প্রতিহত করিয়া অচলা বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি বেশ আছি।

সুরেশ ধীরে ধীরে কহিল, ভালই।

ইহার পরে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই যেন কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। সুরেশ অকস্মাৎ যেন চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আর একটা কথা। তোমার জন্যে যে আমি কত সয়েচি, সে কি তোমার কখনো—

অচলা দুই কানে অঙ্গুলি দিয়া বলিয়া উঠিল, এ সমস্ত আলোচনা আপনি মাপ করবেন।

সুরেশ খোলা দরজায় দুই হাত প্রসারিত করিয়া অচলার পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া বলিল, না, মাপ আমি করতেই পারি নে, তোমাকে শুনতেই হবে।

তাহার চোখে সেই দৃষ্টি—যাহা মনে পড়িলে আজও অচলা শিহরিয়া উঠে। একটুখানি পিছাইয়া গিয়া সভয়ে কহিল, আচ্ছা বলুন—

সুরেশ কহিল, ভয় নেই, তোমার গায়ে আমি হাত দেব না—আমার

এখনো সে জ্ঞান আছে। বলিয়া পুনরায় চৌকীর উপরে বসিয়া পড়িয়া কহিল, এই কথাটা তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে, আমি তোমার ওপর সমস্ত অধিকার হারালেও, আমার ওপর তোমার সমস্ত অধিকার বর্ত্তমান আছে।

অচলা বাধা দিয়া কহিল, এ মনে রাখায় আমার কোন লাভ নেই, কিন্তু—, বলিতে বলিতে দেখিতে পাইল, কথাটা যেন সজোরে আঘাত করিয়া সুরেশকে পলকের জন্য বিবর্ণ করিয়া ফেলিল এবং সেই মুহূর্ত্তে নিজেও স্পষ্ট অনুভব করিল অনুতাপের কথা তাহার নিজের পিঠের উপর সজোরে আসিয়া পড়িল।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া এবার সে কোমল কণ্ঠে বলিল, সুরেশ-বাবু, এ সব কথা আমারও শোনা পাপ, আপনারও বলা উচিত নয়। কেন আপনি এ সব কথা তুলে আমাকে দুঃখ দিচ্ছেন?

সুরেশ তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, দুঃখ কি পাও অচলা?

অচলার মুখ দিয়া অকস্মাৎ বাহির হইয়া গেল, আমি কি পাষাণ সুরেশবাবু!

সুরেশ তাহার সেই দৃষ্টি অচলার মুখের উপর হইতে নামাইল না বটে, কিন্তু অচলার দুই চক্ষু নত হইয়া পড়িল। সুরেশ ধীরে ধীরে বলিল, ব্যস, এই আমার চিরজীবনের সম্বল রইল অচলা, এর বেশি আর চাই নে। বলিয়া এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া কহিল, তুমি যখন পাষাণ নও, তখন এই শেষ ভিক্ষে থেকে আর আমাকে কিছুতে বঞ্চিত করতে পারবে না। তোমার সুখের ভার যার ওপর ইচ্ছে থাকুক, কিন্তু তোমার হাত থেকে দুঃখই যখন শুধু পেয়ে এসেছি, তখন তোমারও দুঃখের বোঝা আজ থেকে আমার থাক্—এই বর আজ মাগি—আমাকে তুমি ভিক্ষা দাও। বলিতে বলিতেই অশ্রুভারে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। অচলার

চোখ দিয়াও তাহার বিগত দিবারাত্রির সমস্ত পুঞ্জীভূত বেদনা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এইবার গলিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতে লাগিল।

এম্‌নি সময় ঠিক্ দ্বারের বাহিরেই জুতার শব্দ শোনা গেল এবং পরক্ষণেই মহিম ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে কহিল, কি হে সুরেশ চা-টা খেলে ?

সুরেশ সহসা জবাব দিতে পারিল না। সে কোনমতে মুখ নিচু করিয়া কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া ফেলিল এবং অচলা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতবেগে মহিমের পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। মহিম চৌকাঠের ভিতর এক পা এবং বাহিরে এক পা দিয়া হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আপনাকে সংবরণ করিয়া মহিম ঘরে ঢুকিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল।

মানব-চিত্ত যে অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা অসঙ্কোচে ও অবলীলাক্রমে মিথ্যা উদ্ভাবন করিতে পারে, সুরেশের তখন সেই অবস্থা। সে চট্ করিয়া হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া, সলজ্জ হাস্যে, উদারভাবে স্বীকার করিল যে, সে বাস্তবিকই ভারি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু মহিম সে জন্য কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করিল না, এমন কি তাহার হেতু পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিল না।

সুরেশ তখন নিজেই নিজের কৈফিয়ৎ দিতে লাগিল। কহিল, যিনি যাই বলুন মহিম, এ আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি যে এদের চোখে জল দেখলে কোথা থেকে যেন নিজেদের চোখেও জল এসে পড়ে— কিছুতে সামলানো যায় না। আমি না গিয়ে পড়্‌লে কেদারবাবু ত এ যাত্রা কিছুতেই বাঁচতেন না, কিন্তু বুড়ো আচ্ছা বদ্‌মেজাজী লোক হে মহিম, একটিমাত্র মেয়ে, তবুও তাকে খবর দিতে দিলে না।

বিয়ের দিন থেকে সেই যে ভদ্রলোক চোটে আছে, সে চটা আর জোড়া লাগল না। বললুম, যা হবার, সে ত হয়েই গেছে—

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, চা পেয়েছ ত হে ?

সুরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ পেয়েছি। কিন্তু বাপের কাছে এ রকম ব্যবহার পেলে কার চক্ষে না জল আসে বল ? পুরুষমানুষই সব সময় সইতে পারে না, এ ত স্ত্রীলোক।

মহিম বলিল, তা বটে। রাত্রে তোমার শোবার কোন ব্যাঘাত হয় নি সুরেশ, বেশ ঘুমোতে পেরেছিলে ? নতুন জায়গা—

সুরেশ তাড়াতাড়ি কহিল, না, নতুন জায়গায় আমার ঘুমের কোন ত্রুটি হয় নি—একপাশেই রাত কেটে গেছে। আচ্ছা মহিম, কেদারবাবু তাঁর অসুখের খবর তোমাদের একেবারেই দিলেন না, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ভেবে দেখ দেখি !

মহিম একান্ত সহজভাবে কহিল, আশ্চর্য্য বৈ কি ! বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া কহিল, হাত-মুখ ধুয়ে একটু বেড়াতে বার হবে না কি ? যাও ত একটু চট্‌পট্‌ সেরে নাও ভাই, আমাকে আবার ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই বেরুতে হবে! এখনও আমার সকালের কাজ-কর্ম্মই সারা হয় নি।

সুরেশ তাহার পুস্তকের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া কহিল, গল্পটা বেশ লাগছে—এটা শেষ ক'রে ফেলি।

তাই কর। আমি ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যেই ফিরে আসছি, বলিয়া মহিম উঠিয়া চলিয়া গেল।

সে পিছন ফিরিবামাত্রই সুরেশ চোখ তুলিয়া চাহিল। মনে হইল, যেন অদৃশ্য হস্ত এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার আগাগোড়া মুখখানার উপরে যেন এক পোঁচ লজ্জার কালি মাখাইয়া দিয়াছে।

যে দ্বার দিয়া মহিম বাহির হইয়া গেল, সেই খোলা দরজার প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া সুরেশ কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু

ভিতরে ভিতরে তাহার অযাচিত জবাবদিহির সমস্ত নিষ্ফলতা ক্রুদ্ধ-অভিমানে তাহার সর্ব্বাঙ্গে হুল ফুটাইয়া দংশন করিতে লাগিল।

দুই বন্ধুর কথোপকথন দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া অচলা কান পাতিয়া শুনিতেছিল; মহিম কাপড় ছাড়িবার জন্য নিজের ঘরে ঢুকিবার অব্যবহিত পরেই সে কবাট ঠেলিয়া প্রবেশ করিল।

মহিম মুখ তুলিয়া চাহিতেই অচলা স্বাভাবিক মুক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আমার বাবা কি তোমার কাছে এমন কিছু গুরুতর অপরাধ করেছেন?

অকস্মাৎ এরূপ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া মহিম জিজ্ঞাসু-মুখে নীরব রহিল।

অচলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমার কথাটা বুঝি বুঝতে পারলে না?

মহিম কহিল, না, কথাগুলো প্রিয় না হ'লেও স্পষ্ট বটে; কিন্তু তার অর্থ বোঝা কঠিন। অন্ততঃ আমার পক্ষে বটে।

অচলা অন্তরের ক্রোধ যথাশক্তি দমন করিয়া জবাব দিল, এ দুটার কোনটাই তোমার কাছে কঠিন নয়, কিন্তু কঠিন হচ্ছে স্বীকার করা। সুরেশবাবুকে যে কথা তুমি স্বচ্ছন্দে জানিয়ে এলে, সেই কথাটাই আমাকে জানাবার বোধ করি তোমার সাহস হচ্ছে না। কিন্তু আজ আমি তোমাকে স্পষ্ট ক'রেই জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমার বাবা কি তোমার কাছে এত তুচ্ছ হয়ে গেছেন যে, তাঁর সাংঘাতিক অসুখের খবরটাতে তুমি কান দেওয়া আবশ্যক মনে কর না?

মহিম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুবই করি। কিন্তু যেখানে সে আবশ্যক নেই, সেখানে আমাকে কি করতে বল?

অচলা কহিল, কোন্‌খানে আবশ্যক নেই শুনি?

মহিম ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কঠোর-

কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, যেমন এইমাত্র সুরেশের ছিল না। আর যেমন এ নিয়ে তোমারও এতখানি রাগারাগি ক'রে আমার মুখ থেকে কড়া কথা টেনে বার করবার প্রয়োজন ছিল না। যাক্, আর না। যার তলায় পাঁক আছে, তার জল ঘুলিয়ে তোলা আমি বুদ্ধির কাজ মনে করি নে। বলিয়া মহিম বাহির হইয়া যাইতেছিল, অচলা দ্রুতপদে সম্মুখে আসিয়া পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল পরে সে দাঁত দিয়া সজোরে অধর চাপিয়া রহিল, ঠিক যেন একটা আকস্মিক দুঃসহ আঘাতের মর্ম্মান্তিক চীৎকার সে প্রাণপণে রুদ্ধ করিতেছে মনে হইল। তার পরে কহিল, তোমার বাইরে কি বিশেষ জরুরী কোন কাজ আছে? দুমিনিট অপেক্ষা করতে পারবে না?

মহিম বলিল, তা পারব।

অচলা কহিল, তা হ'লে কথাটা স্পষ্ট হয়েই যাক্! জল যখন স'রে আসে, তখনই পাঁকের খবর পাওয়া যায়, এই না?

মহিম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ।

অচলা বলিল, নিরর্থক জল ঘুলিয়ে তোলার আমিও পক্ষপাতী নই, কিন্তু সেই ভয়ে পঙ্কোদ্ধারটাও বন্ধ রাখা কি ভাল? এক দিন যদি ঘোলায় ত ঘোলাক না, যদি বরাবরের জন্যে পাঁকের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়! কি বল?

মহিম কঠিনভাবে কহিল, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি দরকারি কাজ আমার প'ড়ে রয়েছে—এখন সময় হবে না।

অচলা ঠিক তেমনি কঠিন-কণ্ঠে জবাব দিল, তোমার এই ঢের বেশি-দরকারি কাজ সারা হয়ে গেলে ফুরসৎ হবে ত? ভাল, ততক্ষণ আমি না হয় অপেক্ষা করেই রইলুম। বলিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মহিম ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল,

ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পরে কপাট বন্ধ করিয়া দিল।

ঘণ্টা-খানেক পরে যখন সে স্নান করিবার প্রসঙ্গ লইয়া বাহিরে সুরেশ ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার তখন মুখের শ্রান্ত শোকাচ্ছন্ন চেহারা সুরেশ চোখ তুলিবামাত্র অনুভব করিল। মহিমের সঙ্গে ইতি-মধ্যে নিশ্চয় কিছু একটা ঘটিয়া গিয়াছে, ইহা অনুমান করিয়া সুরেশ মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সাহস করিয়া প্রশ্ন করিতে পারিল না।

অচলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও কি হচ্চে?

সুরেশ ব্যাগের মধ্যে তাঁহার কন্যাকার ব্যবহৃত জামা-কাপড়গুলি গুছাইয়া তুলিতেছিল, কহিল, একটার মধ্যেই ত ট্রেণ, একটু আগেই ঠিক ক'রে নিচ্চি।

অচলা একটুখানি আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, আপনি কি আজই যাবেন না কি?

সুরেশ মুখ না তুলিয়াই কহিল, হাঁ।

অচলা কহিল, কেন বলুন ত?

সুরেশ তেমনি অধোমুখে থাকিয়াই বলিল, আর থেকে কি হবে? তোমাদের একবার দেখতে এসেছিলুম, দেখে গেলুম।

অচলা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, তবে উঠে আসুন। এ সব কাজ আপনাদের নয়, মেয়েমানুষের; আমি গুছিয়ে সমস্ত ঠিক ক'রে দিচ্ছি। বলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেই সুরেশ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, না না, তোমাকে কিছু কর্‌তে হবে না—এ কিছুই নয়—এ অতি—

কিন্তু তাহার মুখের কথা শেষ না হইতেই অচলা ব্যাগটা তাহার সুমুখ হইতে টানিয়া লইয়া সমস্ত জিনিস-পত্র উবুড় করিয়া ফেলিয়া ভাঁজ করা কাপড় আর একবার ভাঁজ করিয়া ধীরে ধীরে ব্যাগের

মধ্যে তুলিতে লাগিল। সুরেশ অদূরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল, এর কিছুই অবশ্যক ছিল না—সে যদি—আমি নিজেই—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অচলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথারই প্রত্যুত্তর করিল না, ধীরে ধীরে কাজ করিতে করিতে কহিল, আপনার ভগিনী কিংবা স্ত্রী থাকলে তাঁরাই করতেন, আপনাকে করতে দিতেন না, কিন্তু আপনার ভয়, যদি বন্ধুটি ফিরে এসে দেখতে পান—এই না? কিন্তু তাতেই বা কি, এ ত মেয়েমানুষেরই কাজ।

সুরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এইমাত্র মহিমের সহিত তাহার যাগ হইয়া গিয়াছে, অচলা তাহা নিশ্চয়ই জানে না; তাই কথাটা পাড়িয়া তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিতেও তাহার সাহস হইল না, অথচ ভয় করিতেও লাগিল, পাছে সে আসিয়া পড়িয়া আবার স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া ফেলে।

ব্যাগটি পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দিয়া অচলা আস্তে আস্তে বলিল, বাবার অসুখের কথা না তুললেই ছিল ভাল; এতে তাঁর অপমানই শুধু সার হ'ল—উনি ত গ্রাহ্যই করলেন না।

সুরেশ চকিত হইয়া কহিল, কি বললে তোমাকে মহিম?

অচলা তাহার ঠিক জবাব না দিয়া পাশের দরজাটা চোখ দিয়া দেখাইয়া কহিল, ঐখানে দাঁড়িয়ে আমি নিজেই সমস্ত শুনেচি!

সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, সে জন্যে আমি তোমার কাছে মাপ চাচ্চি অচলা।

অচলা মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, কেন?

সুরেশ অনুতপ্ত-কণ্ঠে কহিল, কারণ ত তুমি নিজেই বললে। আমার নিজের দোষে তাঁকে তোমাকে দুজনকেই আজ আমি অপমান করেচি; সেই জন্যেই তোমার কাছে বিশেষ ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করচি অচলা!

অচলা মুখ তুলিয়া চাহিল। সহসা তাহার সমস্ত চোখ-মুখ যেন ভিতরের আবেগে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; কহিল, যাই কেন না আপনি ক'রে থাকেন সুরেশবাবু, সে ত আমার জন্যেই করেছেন? আমাকে লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যেই ত আজ আপনার এই লজ্জা। তবুও আমার কাছে আপনাকে মাপ চাইতে হবে, এত বড় অমানুষ আমি নই। কিসের জন্য আপনি লজ্জিত হচ্ছেন? যা করেছেন, বেশ করেছেন।

সুরেশের বিস্মিত হতবুদ্ধিপ্রায় মুখের পানে চাহিয়া অচলা বুঝিল, সে তাহার কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। তাই এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, আজই আপনি যাবেন না সুরেশবাবু! এখানে লজ্জা যদি কিছু পেয়ে থাকেন সে ত আমারই লজ্জা ঢাক্‌বার জন্যে; নইলে নিজের জন্যে আপনার ত কোন দরকারই ছিল না! আর বাড়ি আপনার বন্ধুর একার নয়, এর ওপর আমারও ত কিছু অধিকার আছে। সেই জোরে আজ আমি নমন্ত্রণ কর্‌চি, আমার অতিথি হয়ে অন্ততঃ আর কিছু দিন থাকুন।

তাহার সাহস দেখিয়া সুরেশ অভিভূত হইয়া গেল। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হৃদয়ে কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই দেখিতে পাইল, মহিম তাহার বাহিরের কাজ সারিয়া বাড়ি ঢুকিতেছে।

অচলা তখন পর্য্যন্ত ব্যাগটা সম্মুখে লইয়া মেঝের উপর বসিয়া এই দিকে পিছন ফিরিয়া ছিল; পাছে মহিমের আগমন জানিতে না পারিয়া আরও কিছু বলিয়া ফেলে, এই ভয়ে সে একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া বলিয়া উঠিল, এই যে মহিম, কাজ সারা হ'ল তোমার?

হাঁ, হ'ল, বলিয়া মহিম ঘরে পা দিয়াই অচলাকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, ও কি হচ্ছে?

অচলা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া

সুরেশকেই লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্ব-প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া কহিল, আপনি আমার ত বন্ধু—শুধু বন্ধুই বা কেন, আমাদের যা করছেন, তাতে আপনি আমার পরমাত্মীয়। এমন ক'রে চ'লে গেলে, আমার লজ্জার, ক্ষোভের সীমা থাকবে না। আজ আপনাকে ত আমি কোনমতেই ছেড়ে দিতে পারব না।

সুরেশ শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, শোন কথা মহিম! তোমাদের দেখতে এসেছিলুম, দেখে গেলুম, বাস্। কিন্তু এ জঙ্গলের মধ্যে আমাকে অনর্থক বেশি দিন ধ'রে রেখে তোমাদেরই বা লাভ কি আর আমারই বা সহ্য ক'রে ফল কি বল?

মহিম ধীরভাবে জবাব দিল, বোধ করি রাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছিলে; কিন্তু সেটা উনি পছন্দ করেন না।

অচলা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, তুমি পছন্দ কর না কি?

মহিম জবাব দিল, আমার কথা ত হচ্ছে না।

সুরেশ মনে মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; তার এই অপ্রিয় আলোচনা কোনমতে থামাইয়া দিবার জন্য প্রফুল্লতার ভাণ করিয়া সহাস্যে কহিল, এ কি মিথ্যে অপবাদ দেওয়া! রাগ কল্পব কেন হে, আচ্ছা লোক ত তোমরা! বেশ, খুসিই যদি হও, আরও দু-এক দিন না হয় থেকেই যাবো। বৌঠান, কাপড়গুলো আর তুলে কাজ নেই, বের ক'রেই ফেলো। মহিম, চল হে, তোমাদের পুকুর থেকে আজ স্নান করেই আসা যাক্; তারপরে বাড়ি গিয়ে না হয় একশিশি কুইনিনই গেলা যাবে।

চল, বলিয়া মহিম জামা-কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

যাহারা নূতন জুতার সুতীক্ষ্ণ কামড় গোপনে সহ্য করিয়া বাহিরে স্বচ্ছন্দতার ভাণ করে, ঠিক তাহাদের মতই সুরেশ সমস্ত দিনটা হাসি-খুসিতে কাটাইয়া দিল; কিন্তু আর এক জন, যাহাকে আরও গোপনে এই দংশনের অংশ গ্রহণ করিতে হইল, সে পারিল না।

স্বামীর অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের কাছে এই কদাকার ভাঁড়ামিতে, এত বেহায়াপনায় তাহার ক্ষোভে, অপমানে, মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। তাঁহাকে সে আজিও হৃদয়ের দিক হইতে চিনিতে না পারিলেও বুদ্ধির দিক হইতে চিনিয়াছিল। সে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল এই তীক্ষ্ণ-ধীমান্, অল্পভাষী লোকটির কাছে এ অভিনয় একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, অথচ লজ্জার কালিমা প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন তাহারি মুখের উপর গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। আজ সকাল-বেলার পরে মহিম আর বাটীর বাহির হয় নাই; সুতরাং দিনের-বেলায় ভাত খাওয়া হইতে সুরু করিয়া রাত্রির লুচি খাওয়া পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত সময়টাই এই ভাবে কাটিয়া গেল।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিছানার উপর ছট্‌ফট্ করিয়া অচলা ধীরে ধীরে কহিল, সারারাত্রি আলো জ্বেলে পড়লে আর এক জন ঘুমোতে পারে না। তোমার কাছে এটুকু দয়াও কি আর আমি প্রত্যাশা করতে পারি নে?

তাহার কণ্ঠস্বরে মহিম চমকিয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি বাতিটা নামাইয়া দিয়া কহিল, অন্যায় হয়ে গেছে, আমাকে মাপ ক'রো। বলিয়া বই বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। এই প্রার্থিত অনুগ্রহলাভের জন্য অচলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল না, কিন্তু ইহা তাহার নিদ্রার পক্ষেও লেশমাত্র সাহায্য করিল

না। বরঞ্চ যত সময় কাটিতে লাগিল, এই নিঃশব্দ অন্ধকার যেন ব্যথায় ভারী হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার কাছে দুঃসহ হইয়া উঠিতে লাগিল। আর সহিতে না পারিয়া এক সময়ে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, জ্ঞানে হোক্, অজ্ঞানে হোক্, সংসারে ভুল করলেই তার শাস্তি পেতে হয়, এ কথা কি সত্যি ?

মহিম অত্যন্ত সহজভাবে জবাব দিল, অভিজ্ঞ লোকেরা তাই ত বলেন।

অচলা পুনরায় কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, তবে যে ভুল আমরা দুজনেই করেছি, যার কুফল গোড়া থেকেই সুরু হয়েচে, তার শেষ ফলটা কি রকম দাঁড়াবে, তুমি আন্দাজ করতে পারো ?

মহিম কহিল, না।

অচলা কহিল, আমিও পারি নে। কিন্তু ভেবে ভেবে আমি এটুকু বুঝেছি যে, আর সমস্ত ছেড়ে দিলেও শুধু পুরুষমানুষ ব'লেই এই শাস্তির বেশি ভার পুরুষের বহা উচিত।

মহিম বলিল, আরও একটু ভাবলে দেখতে পাবে, মেয়েমানুষের বোঝা তাতে এক তিল কম পড়ে না। কিন্তু পুরুষটি কে ? আমি না সুরেশ ?

অচলা যে শিহরিয়া উঠিল, অন্ধকারের মধ্যেও মহিম তাহা অনুভব করিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অচলা ধীরে ধীরে কহিল, তুমি যে এক দিন আমাকে মুখের ওপরেই অপমান করতে সুরু করবে, এ আমি ভেবেছিলুম। আর এও জানি, এ জিনিস একবার আরম্ভ হ'লে কোথায় যে শেষ হয়, তা কেউ বলতে পারে না ; কিন্তু আমি ঝগড়া করতেও পারব না, কিংবা বিয়ে হয়েচে বলেই ঝগড়া ক'রে তোমার ঘর করতেও পারব না। কাল হোক্, পরশু হোক্, আমি বাবার ওখানে ফিরে যাবো।

মহিম কহিল, তোমার বাবা কিছু আশ্চর্য্য হবেন ?

অচলা বলিল, না। তিনি জানতেন বলেই আমাকে বারংবার সাবধান

করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, এর ফল কোন দিন ভালো হবে না। কল্‌কাতায় চলে, কিন্তু পল্লীগ্রামে সমাজ, আত্মীয়, বন্ধু সকলকে ত্যাগ ক'রে শুধু স্ত্রী নিয়ে কারও বেশি দিন চলে না। সুতরাং তিনি আর যাই হোন্, আশ্চর্য্য হবেন না!

মহিম কহিল, তবে তাঁর নিষেধ শোনো নি কেন?

অচলা প্রাণপণ বলে একটা উচ্ছ্বসিত শ্বাস দমন করিয়া লইয়া কহিল, আমি ভাবতুম, তুমি কিছুই না বুঝে কর না।

সে ধারণা ভেঙ্গে গেছে?

হাঁ।

তাই ভাগের কারবারে সুবিধে হ'লো না টের পেয়ে দোকান তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চাচ্ছো?

হাঁ।

মহিম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তা হ'লে যেয়ো। কিন্তু একে ব্যবসা ব'লেই যদি বুঝতে শিখে থাকো, আমার সঙ্গে তোমার মতের মিল হবে না, কিন্তু এ কথাটাও ভুলো না যে, ব্যবসা জিনিসটাকেও বুঝতে সময় লাগে। সে ভুল যদি কখনো ধরা পড়ে আমাকে জানিয়ো, আমি তখনি গিয়ে নিয়ে আসব।

অচলার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল; হাত দিয়া তাহা সে মুছিয়া ফেলিয়া কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া কণ্ঠস্বরকে সংযত করিয়া বলিল, ভুল মানুষের বার বার হয় না। তোমার সে কষ্ট স্বীকার করার দরকার হবে, মনে করি নে।

মহিম কহিল, মনে করা যায় না বলেই তাকে ভবিষ্যৎ বলা হয়। সেই ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের জন্যে রেখে আজ আমাকে মাপ কর, আমি আর বক্‌তে পারচি নে।

অচলা আঘাত পাইয়া বলিল, আমাকে কি তুমি তামাসা করচ?

তা যদি হয়, তোমার ভুল হচ্চে। আমি সত্যই কাল পরশু চ'লে যেতে চাই।

মহিম কহিল, আমি সত্যিই তোমাকে যেতে দিতে চাই নে।

অচলা হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর ক'রে রাখবে? সে তুমি কিছুতেই পারো না, জানো?

মহিম শান্ত সহজভাবে জবাব দিল, বেশ ত, সেও ত আজই রাত্রে নয়। কাল পরশু যখন যাবে, তখন বিবেচনা ক'রে দেখলেই হবে। ঢের সময় আছে, আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। বলিয়া সে মাথার বালিসটা উল্টাইয়া লইয়া সমস্ত প্রসঙ্গ জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া, নিশ্চিন্তভাবে শয়ন করিল এবং বোধ করি বা পরক্ষণেই ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে চা খাইতে বসিয়া সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, মহিম ত মাঠের চায-বাস দেখতে আজও ভোরে বেরিয়ে গেছে বোধ হয়?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পৃথিবী ওলট্-পালট্ হয়ে গেলেও তার অন্যথা হবার যো নেই।

সুরেশ চায়ের বাটীটা মুখ হইতে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, এক হিসেবে সে আমাদের চেয়ে ঢের ভাল। তার কাজের একটা গতি আছে, য কলের চাকার মত যতক্ষণ দম আছে, ততক্ষণ চল্‌বেই।

অচলা কহিল, কলের মত হওয়াটাই কি আপনি ভাল বলেন?

সুরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, তা বলি, কেন না, এ ক্ষমতা আমারা নিজের সাধ্যাতীত। দুর্ব্বল হওয়ার যে কত দোষ, সে ত আমি জানি; তাই, যে স্থিরচিত্ত, তাকে আমি প্রশংসা না ক'রে পারি নে। কিন্তু আজ আমাকে ছুটী দাও, আমি বাড়ি যাই।

অচলা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, যান্। আমি কাল যাচ্চি।

সুরেশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তুমি কোথায় যাবে কাল?

কল্‌কাতায়।

হঠাৎ কল্‌কাতায় কেন? কৈ, কাল এ মৎলব ত শুনি নি।

বাবার অসুখ, তাই তাঁকে একবার দেখতে যাবো।

সুরেশের মুখের উপর উদ্বেগের ছায়া পড়িল, কহিল, অসুস্থ বাপকে হঠাৎ দেখবার ইচ্ছে হওয়া কিছু সংসারে আশ্চর্য্য ঘটনা নয়; কিন্তু ভয় হয়, পাছে বা আমার জন্যেই একটা রাগারাগি ক'রে—

অচলা তাহার কোন জবাব দিল না। যদু সুমুখ দিয়া যাইতেছিল, সুরেশ ডাকিয়া কহিল, তোর বাবু মাঠ থেকে ফিরেচেন রে?

যদু কহিল, তিনি ত আজ সকালে বার হন্ নি। তাঁর পড়বার ঘরে ঘুমোচ্চেন।

অচলা তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বারের বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, মহিম একটা চেয়ারের উপর হেলান দিয়া বসিয়া দুই পা টেবিলের উপরে তুলিয়া দিয়া ঘুমাইতেছে। একটা লোক রাত্রের অতৃপ্ত নিদ্রা এই ভাবে পোষাইয়া লইতেছে, সংসারে ইহা একান্ত অদ্ভুত নহে, কিন্তু অচলার বাস্তবিকই বিস্ময়ের অবধি রহিল না, যখন সে স্বচক্ষে দেখিল, তাহার স্বামী দিনের কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া এই অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। সে পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া চুপ করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া প্রভাতের অপর্য্যাপ্ত আলোক সেই নিদ্রামগ্ন মুখের উপর পড়িয়াছিল। আজ অকস্মাৎ এতদিন পরে তাহার চোখের উপর এমন একটা নতুন জিনিস পড়িল, যাহা ইতিপূর্ব্বে কোনদিন সে দেখে নাই। আজ দেখিল, শান্ত মুখের উপর যেন একখানা অশান্তির সূক্ষ্ম জাল পড়িয়া আছে; কপালের উপর যে কয়েকটা রেখা পড়িয়াছে, এক বৎসর পূর্ব্বেও সেখানে সে সকল দাগ ছিল না। সমস্ত মুখের চেহারাটাই আজ যেন তাহার মনে হইল, কিসের গোপন ব্যথায় শ্রান্ত, পীড়িত। সে নিঃশব্দে আসিয়াছিল, নিঃশব্দেই চলিয়া যাইতে চাহিয়া-

ছিল; কিন্তু পিক্‌দানীটা পায়ে ঠেকিয়া যেটুকু শব্দ হইল, তাহাতে মহিম চোখ মেলিয়া চাহিল। অচলা অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, এখন ঘুমাচ্ছে যে? অসুখ করে নি ত?

মহিম চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি জানি, অসুখ না হওয়াই ত আশ্চর্য্য!

অচলা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পরেই সুরেশ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হইতেছিল, মহিম অদূরে একখানা চৌকির উপর বসিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল; অচলা দ্বারের নিকটে আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিয়া উঠিল, কাল আমিও যাচ্ছি। সুবিধে হ'লে বাবার সঙ্গে একবার দেখা করবেন।

সুরেশ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, তাই না কি; বলিয়াই মহিমের মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বৌঠানকে তুমি কাল কল্‌কাতা পাঠাচ্চ না কি মহিম?

স্ত্রীর এই গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতায় মহিমের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু সে মুখের ভাব প্রসন্ন রাখিয়াই মৃদু হাসিয়া বলিল, আর কোন বাধা ছিল না, কিন্তু আমাদের এই পল্লীগ্রামের গৃহস্থঘরে নাটক তৈরি করার রীতি নেই? কালই বা কেন, আজই ত তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারতুম।

সুরেশের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল; অচলা চক্ষের পলকে তাহা লক্ষ্য করিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, সুরেশবাবু, আমাদের সহরে বাড়ি ব'লে লজ্জিত হবার কারণ নেই। অসুস্থ বাপ-মাকে দেখতে যাওয়া যদি পাড়াগাঁয়ের রীতি না হয়, আমি ত বলি আমাদের সহরের নাটকই ঢের ভাল। আপনি না হয় আজকের দিনটেও থেকে যান্ না, কাল একসঙ্গেই যাবো।

তাহার অপরিসীম ঔদ্ধত্যে সুরেশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; সে মাথা

হেঁট করিয়া বলিতে লাগিল, না, না, আমার আর থাক্‌বার যো নেই বৌঠান্! তোমার ইচ্ছে হ'লে কাল যেয়ো, কিন্তু আমি আজই চল্‌লুম। বলিতে বলিতেই সে তীব্র উত্তেজনায় হঠাৎ ব্যাগটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহার উত্তেজনার আবেগ অচলাকেও একবার যেন মূল হইতে নাড়িয়া দিল। সে অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, এখনও ট্রেণের অনেক দেরি সুরেশবাবু, এরি মধ্যে যাবেন না—একটু দাঁড়ান। আমার দুটো কথা দয়া ক'রে শুনে যান। তাহার আর্ত্ত কণ্ঠস্বরের আকুল অনুরোধে উভয় শ্রোতাই যুগপৎ চমকিয়া উঠিল।

অচলা কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল, তোমার আমি কোন কাজেই লাগলুম না সুরেশবাবু; কিন্তু তুমি ছাড়া আর আমাদের অসময়ের বন্ধু কেউ নেই। তুমি বাবাকে গিয়ে ব'লো, এরা আমাকে বন্ধ ক'রে রেখেছে, কোথাও যেতে দেবে না—আমি এখানে ম'রে যাবো। সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভালবাসি নে, তার ঘর করবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিয়ো না।

মহিম বিহ্বলের ন্যায় নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; সুরেশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষু দৃপ্ত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুমি জানো মহিম, উনি ব্রাহ্মমহিলা। নামে স্ত্রী হলেও ওঁর ওপর পাশবিক বল-প্রয়োগের তোমার অধিকার নেই।

মহিম মুহূর্ত্তকালের জন্যই অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। সে আত্মসংবরণ করিয়া শান্তস্বরে স্ত্রীকে কহিল, তুমি কিসের জন্যে কি কর্‌চ, একবার ভেবে দেখ দিকি অচলা। সুরেশকে কহিল, পশু বল, মানুষ বল, কোন জোরই আমি কারও উপর কোন দিন খাটাই নে! বেশ ত সুরেশ, তুমি যদি থাক্‌তে পার, আজকের দিনটা থেকে ওঁকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাও না। আমি নিজে গিয়ে ট্রেণে তুলে দিয়ে আস্‌বো—তাতে গ্রামের

মধ্যে বিশেষ দৃষ্টিকটুও হবে না।' একটুখানি থামিয়া বলিল, একটু কাজ আছে, এখন চল্লুম। সুরেশ, যাওয়া যখন হ'লই না, তখন কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেল। আমি ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে ফিরে আস্‌চি। বলিয়া ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অচলা মূর্ত্তির মত চৌকাঠ ধরিয়া যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। সুরেশ মিনিট-খানেক হেঁটমুখে থাকিয়া হঠাৎ অট্টহাসি হাসিয়া বলিল, বাঃ রে, বা! বেশ একটি অঙ্ক অভিনয় করা গেল! তুমিও মন্দ কর নি, আমি ত চমৎকার! ওর বাড়িতে ওর স্ত্রী নিয়ে ওকেই চোখ রাঙিয়ে দিলুম! আর চাই কি? আর বন্ধু আমার মিষ্টি-মুখে একটু 'হেসে ঠিক যেন বাহবা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি বাজি রেখে বল্‌তে পারি অচলা, ও আড়ালে শুধু গলা ছেড়ে হো-হো ক'রে হাস্‌বার জন্যেই কাজের ছুতো ক'রে বেরিয়ে গেল! যাক্‌, আর্‌সিখানা একবার আন ত বৌঠান্‌, দেখি নিজের মুখের চেহারা কি রকম দেখাচ্চে! বলিয়া চাহিয়া দেখিল, অচলার মুখখানা একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। সে কোন জবাব দিল না, শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

যে শয্যা স্পর্শ করিতেও আজ অচলার ঘৃণা বোধ হওয়া উচিত ছিল, তাহাই যখন সে যথা-নিয়মে প্রস্তুত করিতে অপরাহ্ণ-বেলায় ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সমস্ত মনটা যে তাহার কোথায় এবং কি অবস্থায় ছিল— মানব-চিত্ত সম্বন্ধে যাঁহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারই অগোচর রহিবে না।

যন্ত্র চালিতের মত অভ্যস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া ফিরিবার মুখে, পাশের ছোট টেবিলটির প্রতি অকস্মাৎ তার চোখ পড়িয়া গেল; এবং

ব্লটিং প্যাডখানির উপর প্রসারিত একখানি ছোট্ট চিঠি সে চক্ষের নিমেষে পড়িয়া ফেলিল। মাত্র একটি ছত্র। বার, তারিখ নাই; মৃণাল লিখিয়াছে—সেজদা মশাই গো, কর্‌ছ কি? পরশু থেকে তোমার পথ চেয়ে চেয়ে তোমার মৃণালের চোখ দুটি ক্ষয়ে গেল যে!

বহুক্ষণ অবধি অচলার চোখের পাতা নড়িল না। ঠিক পাথরে-গড়া মূর্ত্তির পলক-বিহীন দৃষ্টি সেই একটি ছত্রের উপর পাতিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ চিঠি কবেকার, কখন্, কে আনিয়া দিয়া গেছে—সে কিছুই জানে না। মৃণালের বাটী কোন্ দিকে, কোন্ মুখে তাহার বাড়ী ঢুকিতে হয়, কোন্ পথটার উপর, কি জন্য সে এমন করিয়া তাহার ব্যগ্র, উৎসুক দৃষ্টি পাতিয়া রাখিয়াছে, তাহার কিছুই জানিবার যো নাই। সম্মুখের এই কটি কালির দাগ শুধু এই খবরটুকু দিতেছে যে, কোন্ এক পরশু হইতে এক জন আর এক জনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া চোখ নষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু দেখা মিলে নাই।

এ দিকে সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া, তাহার নিজের চোখ-দুটি বেদনায় পীড়িত এবং কালো কালো অক্ষরগুলা প্রথমে ঝাপসা এবং পরে যেন ছোট ছোট পোকার মত সমস্ত কাগজময় নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তবুও এমনি একভাবে দাঁড়াইয়া হয় ত সে আর কতক্ষণ চাহিয়া থাকিত; কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে এতক্ষণ ধরিয়া তাহার ভিতরে ভিতরে যে নিশ্বাসটা উত্তরোত্তর জমা হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই যখন অবরুদ্ধ স্রোতের বাঁধ ভাঙার ন্যায়, অকস্মাৎ সশব্দে গর্জ্জিয়া বাহির হইয়া আসিল, তখন সেই শব্দে সে চমকিয়া সংবিৎ ফিরিয়া পাইল। দ্বারের বাহিরে মুখ তুলিয়া দেখিল, সন্ধ্যার আঁধার প্রাঙ্গণতলে নামিয়া আসিয়াছে এবং যদু চাকর হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালাইয়া বাহিরের ঘরে দিতে চলিয়াছে। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু ফিরে এসেছেন, যদু?

যদু কহিল, না মা, কৈ, এখনও ত তিনি ফেরেন নি।

এতক্ষণে অচলার মনে পড়িল, দুপুর-বেলার সেই লজ্জাকর অভিনয়ের একটা অঙ্ক শেষ হইলে, সেই যে তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন, এখনও ফিরেন নাই। স্বামীর প্রাত্যহিক গতিবিধি সম্বন্ধে আজ তাহার তিলমাত্র সংশয় রহিল না। সুরেশের আসা পর্য্যন্ত এমনই একটা উৎকট ও অবিচ্ছিন্ন কলহের ধারা এ বাটীতে প্রবাহিত হইয়াছিল যে, তাহারই সহিত মাতামাতি করিয়া অচলা আর সব ভুলিয়াছিল। সে স্বামীকে ভালবাসে না, অথচ ভুল করিয়া বিবাহ করিয়াছে, সারাজীবন সেই ভুলেরই দাসত্ব করার বিরুদ্ধে তাহার অশান্ত চিত্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া অহর্নিশি লড়াই করিতেছিল। মৃণালের কথাটা সে এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াই গিয়াছিল, কিন্তু আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই মৃণালের একটিমাত্র ছত্র তাহার সমস্ত পুরাতন দাহ লইয়া যখন উল্টাস্রোতে ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন এক মুহূর্ত্তে প্রমাণ হইয়া গেল, তাহার সেই ভুল-করা স্বামীরই অন্য-নারীতে আসক্তির সংশয় হৃদয় দগ্ধ করিতে সংসারে কোন চিন্তার চেয়েই খাটো নয়।

লেখাটুকু সে আর একবার পড়িবার জন্য চোখের কাছে তুলিয়া ধরিতে হাত বাড়াইল, কিন্তু নিবিড় ঘৃণায় হাতখানা তাহার আপনি ফিরিয়া আসিল। সে চিঠি সেইখানে তেমনি খোলা পড়িয়া রহিল, অচলা ঘরের বাহিরে আসিয়া, বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দিয়া, স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল—সব মিথ্যা! এই ঘর-দ্বার, স্বামি-সংসার, খাওয়া-পরা, শোওয়া-বসা কিছুই সত্য নয়—কোন কিছুর জন্যেই মানুষের তিলার্দ্ধ হাত-পা বাড়াইবার পর্য্যন্ত আবশ্যকতা নাই। শুধু মনের ভুলেই মানুষে ছট্-ফট্ করিয়া মরে, না হইলে পল্লীগ্রাম সহরই বা কি, খড়ের-ঘর রাজপ্রাসাদই বা কি, আর স্বামি-স্ত্রী, বাপ-মা, ভাই-বোন সম্বন্ধই বা কোথায়! আর কিসের জন্যেই বা রাগা-রাগি, কান্না-কাটি ঝগড়া-ঝাঁটি

করিয়া মরে। দুপুর-বেলায় অত বড় কাণ্ডের পরেও যে স্বামী স্ত্রীকে একলা ফেলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চিন্ত হইয়া বাহিরে কাটাইতে পারে, তাহার মনের কথা যাচাই করিবার জন্যেই বা এত মাথাব্যথা কেন? সমস্ত মিথ্যা! সমস্ত ফাঁকি! মরীচিকার মতই সমস্ত অসত্য! কিন্তু সংসার তাহার কাছে এতদূর খালি হইয়া যাইতে পারিত না, একবার যদি সে মৃণালের ঐ ভাষাটুকুর উপরেই তাহার সমস্ত চিত্ত ঢালিয়া না দিয়া, সেই মৃণালকে একবার ভাবিবার চেষ্টা করিত। অন্য নারীর সহিত সেই পল্লীবাসিনীর সদানন্দময়ীর আচরণ একবার মনে করিয়া দেখিলে, তার নিজের মনটাকে ঐ কটা কথার কালিমাই এমন করিয়া কালো করিয়া দিতে বোধ করি পারিত না।

যদু ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাবু, জিজ্ঞেসা কর্‌লেন, চায়ের জল গরম হয়েচে কি?

অচলা ঠিক যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিল, কহিল, কোন্ বাবু?

যদু জোর দিয়া বলিল, আমাদের বাবু। এইমাত্র তিনি ফিরে এলেন যে। চায়ের জল ত অনেকক্ষণ গরম হয়ে গেছে মা।

চল যাচ্চি, বলিয়া অচলা রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। খানিক পরে চা এবং জলখাবার চাকরের হাতে দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, মহিম অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করিতেছে এবং সুরেশ ঘরের মধ্যে লণ্ঠনের কাছে মুখ লইয়া একমনে খবরের কাগজ পড়িতেছে। যেন কেহই কাহারও উপস্থিতি আজ জানিতেও পারে নাই। এই যে অত্যন্ত লজ্জাকর সঙ্কোচ দুটি চিরদিনের বন্ধুর মাঝখানে আজ সহজ শিষ্টাচারের পথটা পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহার উপলক্ষটা মনে পড়িতেই, অচলার পা দুটা আপনি থামিয়া গেল।

অচলাকে দেখিয়া মহিম থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সুরেশকে চা দিতে এত দেরি হ'ল যে?

অচলার মুখ দিয়া কিছুতেই কথা বাহির হইল না। সে মুহূর্ত্তকাল মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, নীরবে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যদু চায়ের সরঞ্জাম টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলে, সুরেশ কাগজখানা রাখিয়া দিয়া মুখ ফিরাইল; কহিল, মহিম কৈ, সে এখনো ফেরে নি না কি?

সঙ্গে সঙ্গেই মহিম প্রবেশ করিয়া একখানা চৌকী টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল, কিন্তু সে যে মিনিট-দশেক ধরিয়া তাহারই কানের কাছে বারান্দার উপরে হাঁটিয়া বেড়াইতেছিল, এই বাহুল্য কথাটা মুখ দিয়া উচ্চারণ করার প্রয়োজন বোধ করিল না। তার পরেই সমস্ত চুপচাপ। অচলা নিঃশব্দে অধোমুখে দুবাটি চা প্রস্তুত করিয়া, এক বাটি সুরেশকে দিয়া, অন্যটা স্বামীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া নীরবেই উঠিয়া যাইতেছিল, মহিমের আহ্বানে সে চমকিয়া দাঁড়াইল।

মহিম কহিল, একটু অপেক্ষা কর, বলিয়া নিজেই চট করিয়া উঠিয়া কপাটে খিল লাগাইয়া দিল। চক্ষের নিমেষে তাহার ছয় নলা পিস্তলটার কথাই সুরেশের স্মরণ হইল; এবং হাতের পে[illegible] কাঁপিয়া উঠিয়া খানিকটা চা চম্‌কাইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। সে মুখখানা মড়ার মত বিবর্ণ করিয়া বলিল, দোর বন্ধ কর্‌লে যে?

তাহার ক[illegible]স্বর, মুখের চেহারা ও প্রশ্নের ভঙ্গীতে অচলারও ঠিক সেই কথাই মনে পড়িয়া মাথার চুল পর্য্যন্ত কাঁটা দিয়া উঠিল। বোধ করি বা একবার যেন সে চীৎকার করিবারও প্রয়াস করিল, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হইল না। মহিম ক্ষণকালমাত্র অচলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্ত বুঝিল। তার পরে সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, চাকরটা এসে পড়ে, এই জন্যেই—নইলে পিস্তলটা আমার চিরকাল যেমন বাক্সে

বন্ধ থাকে, এখনো তেম্‌নি আছে। তোমরা এত ভয় পাবে জান্‌লে, আমি দোর বন্ধ কর্‌তাম না।

সুরেশ চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া হাসিবার মত মুখের ভাব করিয়া বলিল, বাঃ, ভয় পেতে যাবো কেন হে? তুমি আমার উপর গুলী চালাবে—বাঃ—প্রাণের ভয়! আমি? কবে আবার তুমি দেখলে? আচ্ছা যা হোক—

তাহার অসংলগ্ন কৈফিয়ৎ শেষ হইবার পূর্ব্বেই মহিম কহিল, সত্যই কখনো ভয় পেতে তোমাকে দেখি নি। প্রাণের মায়া তোমার নেই ব'লেই আমি জান্‌তাম। সুরেশ, আমার নিজের দুঃখের চেয়ে তোমার এই অধঃপতন আমার বুকে আজ বেশি ক'রে বাজল। যাতে তোমার মত মানুষকেও এত ছোট ক'রে আন্‌তে পারে—না, সুরেশ, কাল তুমি নিশ্চয় বাড়ি যাবে। কোন ছলে আর দেরি করা চল্‌বে না।

সুরেশ তবুও ক একটা জবাব দিতে চাহিল; কিন্তু এবার তাহার গলা দিয়া স্বরও ফুটিল না, ঘাড়টাও সোজা করিতে পারিল না; সেটা যেন তাহার অজ্ঞাতসারেই ঝুঁকিয়া পড়িল।

তুমি ভেতরে যাও অচলা, বলিয়া মহিম খিল খুলিয়া পরক্ষণেই অন্ধকারের মধ্যে বাহির হইয়া গেল।

এইবার সুরেশ মাথা তুলিয়া জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, শোন কথা। অমন কতগণ্ডা বন্দুক-পিস্তল রাত-দিন নাড়াচাড়া ক'রে বুড়ো হয়ে এলুম, এখন ওর একটা ভাঙা-ফুটো রিভলভারের ভয়ে ম'রে গেছি আর কি! হাসালে যা হোক্‌, বলিয়া সুরেশ নিজেই টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। সে হাসিতে যোগ দিবার মত লোক ঘরের মধ্যে অচলা ছাড়া আর কেহ ছিল না! সে কিন্তু যেমন ঘাড় হেঁট করিয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনি ভাবেই আরও কিছুকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে পাশের দরজা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে মহিম নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কেহ নাই। পাশের ঘরে গিয়া দেখিল, মাটীতে মাদুর পাতিয়া, হাতের উপর মাথা রাখিয়া অচলা শুইয়া আছে। স্বামীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া, সে উঠিয়া বসিল। পাশে একটা খালি তক্তপোষ ছিল, মহিম তাহার উপর উপবেশন করিয়া বলিল, কেমন, কাল তোমার বাপের বাড়ি যাওয়া ত ঠিক?

অচলা নিচের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, কোন জবাব দিল না। মহিম অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনশ্চ কহিল, যাকে ভালবাস না, তারই ঘর করতে হবে, এত বড় অন্যায় উপদ্রব আমি স্বামী হলেও তোমার ওপর করতে পারব না।

কিন্তু অচলা তেমনি পাষাণ-মূর্ত্তির মত নিঃশব্দ স্থির হইয়া রহিল দেখিয়া মহিম বলিতে লাগিল, কিন্তু তোমার ওপর আমার অন্য নালিশ আছে। আমার স্বভাব ত জানো। শুধু বিয়ের পর থেকেই ত নয়, অনেক আগেই ত আমাকে জানতে যে, আমি সুখ-দুঃখ যাই হোক, নিজের প্রাপ্য ছাড়া এক বিন্দু উপরি পাওনা কখনো প্রত্যাশা করি নে—পেলেও নিই নে। ভালবাসার ওপর ত জোর খাটে না অচলা। না পারলে হয় ত তা দুঃখের কথা, কিন্তু লজ্জার কথা ত নয়। কেন তবে এত দিন কষ্ট পাচ্ছিলে? কেন আমাকে না জানিয়ে ভেবে নিয়েছিলে, আমি জোর ক'রে তোমাকে আটক রাখবো? কোন দিন কোন বিষয়েই ত আমি জোর খাটাই নি। তাঁরা তোমাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেলে, তবেই তোমার প্রাণ বাঁচবে—আর আমাকে জানালে কি কোন উপায় হ'তো না? তোমার প্রাণের দামটা কি শুধু তাঁরাই বোঝেন?

অচলা অশ্রু-বিকৃত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর যতদূর সাধ্য সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া চুপি চুপি বলিল, তুমিও ত ভালবাসো না।

মহিম আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, এ কথা কে বললে? আমি ত কখনো বলি নি।

অচলার উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না ; কহিল, শুধু কথাই কি সব ? শুধু মুখের বলাই সত্যি, আর সব মিথ্যে ? রাগের মাথায় মনের কষ্টে যা কিছু মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাকেই কেবল সত্যি ধ'রে নিয়েই তুমি জোর খাটাতে চাও ? তোমার মতন নিক্তির ওজনে কথা বলতে না পার্‌লেই কি তার মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দিতে হবে ? বলিতে বলিতেই তাহার গলা ধরিয়া প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মহিম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল, তার মানে ?

অচলা উচ্ছ্বসিত রোদন চাপিয়া বলিল, মনে ক'রো না—তোমার মত সাবধানী লোকেও মিথ্যেকে চিরকাল চাপা দিয়ে রাখতে পারে ! তোমারও কত ভুল হ'তে পারে—দেখ গে চেয়ে, তোমারই টেবিলের ওপর ! শুধু আমাদেরই—

মহিম প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি আমার টেবিলের ওপর ?

অচলা মুখে আঁচল গুঁজিয়া মাদুরের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। তাহার কাছে আর কোন জবাব না পাইয়া মহিম আস্তে আস্তে তাহার টেবিল দেখিতে গেল। তাহার পড়ার ঘরের টেবিলের উপর খান-কতক বই পড়িয়া ছিল ; প্রায় দশ মিনিট ধরিয়া সেইগুলা উল্‌টিয়া-পাল্‌টিয়া দেখিয়া, তাহার নিচে, আশেপাশে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া স্ত্রীর অভিযোগের কিছুমাত্র তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, বিমূঢ়ের ন্যায় ফিরিয়া আসিবার পথে শোবার ঘরটার প্রতি দৃষ্টি পড়ায়, ভিতরে একটা পা দিয়াই মৃণালের সেই চিঠিখানার উপর তাহার চোখ পড়িল। সেখানা হাতে তুলিয়া লইয়া পড়িবামাত্রই, অকস্মাৎ অন্ধকারে বিদ্যুৎহানার মতই আজ এক মুহূর্ত্তে মহিম পথ দেখিতে পাইল। অচলা যে কি ইঙ্গিত করিয়াছে, আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সেটুকু হাতের মধ্যে লইয়া মহিম বিছানার উপর বসিয়া, শূন্য-দৃষ্টিতে বাহিরের

অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। যেমন করিয়া সে প্রথম দিনটিতে আসিয়াছিল, যে ভাবে সে চলিয়া গিয়াছিল, সতীন বলিয়া সে অচলাকে যত পরিহাস করিয়াছে—একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত মনে পড়িতে লাগিল। পল্লীগ্রামের এই সকল রহস্যালাপের সহিত যে মেয়ে পরিচিত নয়, প্রতিদিন তাহার যে কিরূপ বিঁধিয়াছে, এবং সে নিজেও যখন কোনদিন এই পরিহাসে খোলামনে যোগ দিতে পারে নাই, বরঞ্চ স্ত্রীর সম্মুখে লজ্জা পাইয়া বারংবার বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে—তাহার সেই লজ্জা যদি এই উচ্চশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী রমণীর ধারণায় অপরাধীর সত্যকার লজ্জা বলিয়া ধীরে ধীরে [illegible] হইয়া উঠিয়া থাকে ত আজ তাহার মূলোচ্ছেদ করিবে সে কি দিয়া? বাহিরের অন্ধকারের ভিতর হইতে আজ অনেক সত্য তাহাকে দেখা দিতে লাগিল? কেমন করিয়া অচলার হৃদয় ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া স্বামীর সঙ্গ দিনের পর দিন বিষাক্ত হইয়াছে, কেমন করিয়া স্বামীর আশ্রয় প্রতিমুহূর্তে কারাগার হইয়া উঠিয়াছে—সমস্তই সে যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। এই প্রাণান্তকর অবরোধের মধ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার সেই যে আকুল প্রার্থনা সুরেশের কাছে তখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল—সে যে তাহার অন্তরের কোন্ অন্তরতম দেশ হইতে উত্থিত হইয়াছিল, তাহাও আজ মহিমের মনশ্চক্ষের সম্মুখে প্রচ্ছন্ন রহিল না। অচলাকে সে যথার্থই সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসিয়াছিল। সেই অচলার এত দিন এত কাছে থাকিয়াও, তাহার এত বড় মনোবেদনার প্রতি চোখ বুজিয়া থাকাটাকে সে গভীর অপরাধ বলিয়া গণ্য করিল। কিন্তু এমন করিয়া আর ত একটা মুহূর্তও চলিবে না! স্ত্রীর হৃদয় ফিরিয়া পাইবার উপায় আছে কি না, তাহা কোথায় কত দূরে সরিয়া গিয়াছে, অনুমান করাও আজ দুঃসাধ্য; কিন্তু অনেক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও স্বামী বলিয়া যাহাকে সে এক দিন আশ্রয় করিয়াছিল, তাহারই কাছে অপমান

এবং লাঞ্ছনা পাইয়া যে আজ তাহাকে ফিরিতে হইতেছে, এত বড় ভুল ত তাহাকে জানানো চাই।

মহিম ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া, অচলার দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিল, কবাট রুদ্ধ এবং ঠেলিয়া দেখিল, তাহা ভিতর হইতে বন্ধ। আস্তে আস্তে বার-দুই ডাকিয়া যখন কোন সাড়া পাইল না, তখন শুধু যে জোর করিয়া শান্তিভঙ্গ করিবারই তাহার প্রবৃত্তি হইল না, তাহা নহে; একটা অতি কঠিন পরীক্ষার দায় হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি পাইয়া [illegible] যেন বাঁচিয়া গেল।

মহিম ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল; কিন্তু যাহার অভাবে পার্শ্বের স্থানটা আজ শূন্য পড়িয়া রহিল, ও ঘরে সে অনশনে মাটীতে পড়িয়া আছে মনে করিয়া, কিছুতেই তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। উঠিয়া গিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহাকে তুলিয়া আনা উচিত কি না, ভাবিতে ভাবিতে এবং দ্বিধা করিতে করিতে অনেক রাত্রে বোধ করি, সে কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সহসা মুদ্রিত চক্ষে তীব্র আলোক অনুভব করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। শিয়রের খোলা জানালা দিয়া, এবং চালের ফাঁক দিয়া অজস্র আলোক ও উৎকট ধূমে ঘর ভরিয়া গিয়াছে, এবং অত্যন্ত সন্নিকটে এমন একটা শব্দ উঠি[illegible]ছে, যাহা কানে প্রবেশমাত্রই সর্ব্বাঙ্গ অসাড় করিয়া দেয়। কোথায় যে আগুন লাগিয়াছে, তাহা নিশ্চয় বুঝিয়াও ক্ষণকালের জন্য সে হাত-পা নাড়িতে পারিল না। কিন্তু সেই কয়েকটা মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার মাথার ভিতর দিয়া যেন ব্রহ্মাণ্ড খেলিয়া গেল। লাফাইয়া উঠিয়া, দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, রান্নাঘর এবং যে ঘরে আজ অচলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহারই বারান্দার একটা কোণ বিদীর্ণ করিয়া প্রধূমিত অগ্নিশিখা উপরের সমস্ত জাম-গাছটাকে রাঙা করিয়া ফেলিয়াছে। পল্লীগ্রামে খড়ের ঘরে আগুন ধরিলে তাহা নিবাইবার কল্পনা করাও পাগলামি; সে চেষ্টাও কেহ করে না। পাড়ার

লোক, যে যাহার জিনিষপত্র ও গরু-বাছুর সরাইতে ছুটাছুটি করে, এবং ভিন্ন পাড়ার লোক এক দিকে মেয়েরা এবং এক দিকে পুরুষেরা সমবেত হইয়া অত্যন্ত নিরুদ্বেগে হায় হায় করিয়া এবং কি পরিমাণের দ্রব্য-সম্ভার দগ্ধ হইতেছে এবং কি করিয়া এ সর্ব্বনাশ ঘটিল, তাহারই আলোচনা করিয়া সমস্ত বাড়ীটা ভস্মসাৎ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। তার পরে ঘরে ফিরিয়া হাত-পা ধুইয়া বাকি রাত্রিটুকু বিছানায় গড়াইয়া লইয়া পুনরায় সকাল-বেলা একে একে গাড়ুহাতে দেখা দেয়; এবং আলোচনার জেরটুকু সকালের মত শেষ করিয়া বাড়ি গিয়া স্নানাহার করে। কিন্তু একজনের গৃহপ্রাঙ্গণের বিরাট ভস্মস্তূপ আর এক জনের নিয়মিত জীবনযাত্রার লেশমাত্র ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে না।

মহিম পল্লীগ্রামের লোক, সকল কথাই সে জানিত। তাই নিরর্থক চেঁচা-মেচি করিয়া অসময়ে পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙাইয়া দিল না। বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও ছিল না, কারণ তাহার আমকাঁঠালের এত বড় বাগানটা অতিক্রম করিয়া এই অগ্ন্যুৎপাত যে আর কাহারও গৃহ স্পর্শ করিবে, সে সম্ভাবনা ছিল না। বাহিরের সারের যে কয়টা ঘরে সুরেশ এবং চাকর-বাকরেরা নিদ্রিত ছিল, অগ্নিস্পৃষ্ট হইবার তখনও তাহাদের বিলম্ব ছিল। বিলম্ব ছিল না শুধু অচলার ঘরটার। সে তাহারই দ্বারে সজোরে করাঘাত করিয়া ডাকিল, অচলা!

অচলা ঠিক যেন জাগিয়া ছিল, এমনি ভাবে উত্তর দিল, কেন?

মহিম কহিল, দোর খুলে বেরিয়ে এস!

অচলা শ্রান্ত-কণ্ঠে জবাব দিল, কি হবে? আমি ত বেশ আছি!

মহিম কহিল, দেরি ক'রো না, বেরিয়ে এসো—বাড়িতে আগুন লেগেছে।

প্রত্যুত্তরে অচলা একবার ভয়-জড়িত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল; তার পরেই সমস্ত চুপ-চাপ। মহিমের পুনশ্চ ব্যগ্র আহ্বানে সে আর

সাড়াও দিল না। ঠিক এই ভয়ই মহিমের ছিল ; কারণ বাটীতে আগুন লাগা যে কি ব্যাপার, তাহার কোন প্রকার ধারণাই অচলার ছিল না। মহিম ঠিক বুঝিল, ইতিপূর্ব্বে সে চোখ বুজিয়াই কথা কহিতেছিল, কিন্তু চোখ মেলিয়া যে দৃশ্য তাহাকেও কিছুক্ষণের জন্য অবশ করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই অপর্য্যাপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত সমস্ত ঘরটা চোখে পড়িবামাত্র অচলারও সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই দুর্ঘটনার জন্য মহিম প্রস্তুত হইয়াই ছিল। সে একটা কপাট টানিয়া উঁচু করিয়া হাঁস-কলটা খুলিয়া ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল ; এবং মূর্চ্ছিতা স্ত্রীকে বুকে তুলিয়া লইয়া অবিলম্বে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।

এইবার সে বাটীর অন্য সকলকে সজাগ করিবার জন্য নাম ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সুরেশ পাংশুমুখে বাহির হইয়া আসিল, যদু প্রভৃতি অপর সকলেও দ্বার খুলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পরেই একটা প্রচণ্ড শব্দে অচলা সচেতন হইয়া দুই বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠ প্রাণপণ বলে জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মহিম সকলকে লইয়া যখন বাহিরের খোলা জায়গায় আসিয়া পড়িল, তখন বড়-ঘরের চালে আগুন ধরিয়াছে। এইবার তাহার মনে পড়িল, অচলার অলঙ্কার প্রভৃতি দামী জিনিস যাহা কিছু আছে, সমস্তই এই ঘরে এবং আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে কিছুই বা[illegible]নো যাইবে না।

অচলা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল ; সে সজোরে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না, সে হবে না। প্রতিশোধ নেবার এই কি সময় পেলে? কিছুতেই ওর মধ্যে তোমাকে আমি যেতে দেব না। যাক্, সব পুড়ে যাক।

না গেলে চল্‌বে না অচলা, বলিয়া জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া মহিম সেই জমাট্ ধূমরাশির মধ্যে দ্রুতবেগে গিয়া প্রবেশ করিল। যদু চেঁচাইতে চেঁচাইতে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

সুরেশ এতক্ষণ পর্য্যন্ত অভিভূতের মত চাহিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল ;

অকস্মাৎ সংবিৎ পাইয়া, সে কিছু লইবার উপক্রম করিতেই অচলা তাহার কোঁচার খুঁট ধরিয়া ফেলিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, আপনি যান্ কোথায় ?

সুরেশ টানাটানি করিয়া বলিল, মহিম গেল যে—

অচলা তিক্তস্বরে বলিল, তিনি গেলেন তাঁর জিনিস বাঁচাতে। আপনি কে ? আপনাকে যেতে আমি কোনমতেই দেব না।

তাহার কণ্ঠস্বরে স্নেহের লেশমাত্র সম্পর্ক ছিল না—এ যেন শুধু সে অনধিকারীর উৎপাতকে তিরস্কার করিয়া দমন করিল।

মিনিট দুই-তিন পরেই মহিম দুই হাতে দুটা বাক্স লইয়া এবং যদু প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ মাথায় করিয়া উপস্থিত হইল। মহিম অচলার পায়ের কাছে রাখিয়া কহিল, তোমার গহনার বাক্সটা যেন কিছুতে হাতছাড়া ক'রো না, আমরা বাইরের ঘরে যদি কিছু বাঁচাতে পারি, চেষ্টা করি গে।

অচলার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। তাহার মুঠোর মধ্যে তখনো সুরেশের কোঁচার খুঁট ধরা ছিল, তেম্‌নি ধরা রহিল। মহিম পলকমাত্র সে দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যদুকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতের প্রথম আলোকে স্বামীর মুখের প্রতি চোখ পড়িবামাত্রই অচলার বুকের ভিতরটা হাহা-রবে কাঁদিয়া উঠিল। চোখের জল আর সে কোনমতে সংবরণ করিতে পারিল না। এ কি হইয়াছে! মাথার চুল ধূলাতে, বালুতে, ভস্মে রুক্ষ, বিবর্ণ; শীর্ণ, বিরস মুখ অগ্নুত্তাপে ঝলসিয়া একটা রাত্রির মধ্যেই তাহার অমন সুন্দর স্বামীকে যেন বুড়া করিয়া দিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোক চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া কলরব করিতেছে।

পিতল-কাঁসার বাসন-কোসন সে ত সমস্তই গিয়াছে দেখা যাইতেছে। তা যাক—কিন্তু শাল-দোশালা গহনাপত্র তাই বা আর কত ঐ একটিমাত্র তোরঙ্গে রক্ষা পাইয়াছে—এই লইয়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সমালোচনা চলিতেছে। ইহাদেরই একটু দূরে নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিস্তূপের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া মহিম চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সমস্তই শুনিতে পাইতেছিল, কিন্তু কৌতূহল নিবারণ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। ও-পাড়ার ভিখু বাঁড়ুয্যে—অত্যন্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি—বাতের জন্য এ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই; এখন লাঠিতে ভর দিয়া সদলবলে আগমন করিতেছেন দেখিয়া, মহিম অগ্রসর হইয়া গেল। বাঁড়ুয্যেমশাই বহুপ্রকার বিলাপ করিয়া শেষে বলিলেন, মহিম, তোমার বাবা অনেক দিন স্বর্গীয় হয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি আর আমি ভিন্ন ছিলাম না। আমরা দুজনে হরিহর আত্মা ছিলাম।

মহিম ঘাড় নাড়িয়া সবিনয়ে জানাইল যে, ইহাতে তাহার কোন সংশয় নাই। শুনিয়া তিনি কহিলেন যে, এই কাণ্ডটি যে ঘটিবে, তাহা তিনি পূর্ব্বাহ্ণেই জানিতেন।

মহিম চকিত হইয়া জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া রহিল। পার্শ্বেই বেড়ার আড়ালে অচলা জিনিসপত্র লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল, সেও শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। ভূমিকা এই পর্য্যন্ত করিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মার ক্রোধ ত শুধু শুধু হয় না বাবা! আমাদের একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করলে না, এত বড় বামুনের ছেলে হয়ে কি অকর্ম্মটাই না করলে বল দেখি।

মহিম কথাটা বুঝিতে পারিল না। তিনি নিজের কথাটার তখন বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে অনুচরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা সবাই বলা-বলি করি যে, কিছু একটা ঘটবেই। কৈ, আর কারুর প্রতি ব্রহ্মার অকৃপা হ'ল না কেন! বাবা, বেম্মও যা,

খৃষ্টানও তাই! সাহেব হলেই বলে খৃষ্টান, আর বাঙ্গালী হলেই বলে বেহ্ম। এ আমাদের কাছে—যাদের শাস্ত্রজ্ঞান জন্মেছে—তাদের কাছে চাপা থাকে না।

উপস্থিত সকলেই ইহাতে অনুমোদন করিল। তিনি উৎসাহ পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, যাই কর না বাবা, আগে একটা প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ওটাকে ত্যাগ ক'রে—

মহিম হাত তুলিয়া বলিল, থামুন। আপনাদের আমি অসম্মান করতে চাই নে, কিন্তু যা নয়, তা মুখে আন্‌বেন না। আমি যাঁকে ঘরে এনেচি, তাঁর পুণ্যে ঘর থাকে ভালই, না হয় বার বার পুড়ে যায়, সেও আমার সহ্য হবে। বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

বাঁড়ুয্যেমশাই সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, লাঠি ঠক ঠক করিয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন। মনে মনে যাহা বলিতে বলিতে গেলেন তাহা মুখে না আনাই ভাল।

অচলা সমস্ত শুনিতে পাইয়াছিল; তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

যদু আসিয়া কহিল, মা, তোমাকে জিজ্ঞেসা ক'রে বাবু পাল্কীবেহারা ডেকে আন্‌তে বল্‌লেন। আন্‌ব?

অচলা আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, বাবুকে একবার ডেকে দাও ত যদু।

পাল্কী?

এখন থাক।

মহিম কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইতেই মহিম বিস্মিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিল। হয় ত সে স্বামীর হাত দুটা ধরিয়া কাছে টানিয়া বসাইত, হয় ত বা আরও কিছু ছেলেমানুষি করিয়া

ফেলিত; কি করিত, তা সে তাহার অন্তর্যামীই জানিতেন; কিন্তু সকাল হইয়া গিয়াছে—চারিদিকে কৌতূহলী লোক; অচলা আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল, পাল্কী কেন?

মহিম কহিল, নটার ট্রেণ ধর্‌তে পার্‌লেই ত সব দিকে সুবিধে। একটার মধ্যে বাড়ী পৌঁছে স্নানাহার করতে পার্‌বে। কাল রাত্রেও ত কিছু খাও নি।

আর তুমি?

আমি? মহিম আর একটুখানি চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল, আমারও যা হোক একটা উপায় হবে বৈ কি।

তা হ'লে আমারও হ'বে। আমি যাবো না।

কি উপায় হবে বল।

অচলা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। একবার তাহার মুখে আসিল—বনে, গাছতলায়! কিন্তু সে ত সত্যই সম্ভব নয়। আর পাড়ায় কাহারও বাটীতে একটা ঘণ্টার জন্যও আশ্রয় লওয়া যে কতদূর অপমান-জনক, সে ইঙ্গিত ত সে এইমাত্র ভাল করিয়াই পাইয়াছে। মৃণালের কথা যে তাহার মনে পড়ে নাই, তাহা নহে; বারংবার স্মরণ হইয়াছে; কিন্তু লজ্জায় তাহা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, তুমিও সঙ্গে চল।

মহিম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আমি সঙ্গে যাবো? তাতে লাভ কি?

অচলা বলিল, লাভ-লোকসান দেখবার ভার আজ থেকে আমি নেব। তোমার শুভানুধ্যায়ী এখানে বেশি নেই, সে আমি জানতে পেরেচি। তা ছাড়া তোমার মুখের চেহারা এক রাত্রির মধ্যেই যা হয়ে গেছে, সে তুমি দেখতে পাচ্ছো না, আমি পাচ্ছি। আমার গলায় ছুরি দিলেও, এখানে তোমাকে একলা ফেলে রেখে আমি যেতে পারবো না!

মহিমের মনের ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল; কিন্তু সে স্থির হইয়া রহিল।

অচলা বলিতে লাগিল, কেন তুমি অত ভাবচ? আমার গয়নাগুলো ত আছে। তা দিয়ে পশ্চিমে যেথানে হোক্ কোথাও একটা ছোট বাড়ি অনায়াসে কিন্‌তে পারবো। যেথানেই থাকি, আমাকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেল্‌তে তুমি পারবে না। সে চেষ্টা তোমাকে কর্‌তেই হবে। আর বলেইচি ত তোমার ভার এখন থেকে আমার ওপর।

যদু অদূরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পাল্কী আন্‌তে যাবো মা।

উত্তরের জন্য অচলা উৎসুক-চক্ষে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মহিম ইহার জবাব দিল। যদুকে আনিতে হুকুম করিয়া, স্ত্রীকে বলিল, কিন্তু আমি ত এখুনি যেতে পারি নে।

শুনিয়া অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও তৃপ্তিতে অচলার বুক ভরিয়া গেল। সে অন্তরের আবেগ সংবরণ করিয়া সহজভাবে কহিল, সে সত্যি, এক্ষুনি তোমার যাওয়া হয় না; কিন্তু সন্ধ্যের গাড়ীতে নিশ্চয় যাবে বল? নইলে আমি খাবার নিয়ে ব'সে ব'সে ভাবব, আর—

কিন্তু মন্তব্যটা তাহার মহিমের দীর্ঘশ্বাসে যেন নিবিয়া গেল। সে মলিন হইয়া সভয়ে কহিল, ও-বেলা যেতে পারবে না? তবে এই অন্ধকার রাত্রে কার বাড়িতে—কিন্তু বলিতে বলিতেই সে থামিয়া গেল। যাহার বাটীতে তাহার স্বামীর রাত্রিযাপনের সম্ভাবনা, সে কথা মনে হইতেই তাহার মুখশ্রী গম্ভীর ও বিবর্ণ হইয়া উঠিল। বোধ করি, তাহার মনের কথা মহিম বুঝিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতায় আমাকে কোথায় যেতে বল?

অচলা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, কেন বাবার ওখানে।

মহিম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না।

না কেন? সেও কি তোমার নিজের বাড়ি না?

মহিম তেম্‌নি মাথা নাড়িয়া জানাইল; না।

অচলা কহিল, না হয় সেখানে কেবল দুটো দিন থেকেই আমরা পশ্চিমে চ'লে যাবো।

না।

অচলা জানিত, তাহাকে টলানো সম্ভব নয়। একটুখানি চিন্তা করিয়া বলিল, তবে চল, এখান থেকেই আমরা পশ্চিমের কোন সহরে গিয়ে উঠি গে। আমি সঙ্গে থাক্‌লে কোথাও আমাদের কষ্ট হবে না আমি বেশ জানি। কিন্তু গহনাগুলো ত বেচতে হবে; সে কল্‌কাতা ছাড়া হবে কি ক'রে?

মহিম আর এক দিকে চাহিয়া নীরব হইয়া রহিল। অচলা ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, পশ্চিমেও ত বড় সহর আছে, সেখানেও ত বিক্রী করা যায়? আমার বাক্সে প্রায় দুশ টাকা আছে, এখন তাতেই ত আমাদের যাওয়া হ'তে পারে? চুপ ক'রে রইলে যে? বল না শিগ্‌গির।

মহিম স্ত্রীর চোখের দিকে চাহিতে পারিল না, কিন্তু জবাব দিল; বলিল, তোমার গহনা নিতে পার্‌ব না অচলা।

অকস্মাৎ একটা গুরুতর ধাক্কা খাইয়া যেন অচলা পিছাইয়া গেল। খানিক পরে কহিল, কেন পার্‌বে না, শুন্‌তে পাই?

মহিম তাহার উত্তর দিল না এবং কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। হঠাৎ অচলা একসঙ্গে একরাশ প্রশ্ন করিয়া বসিল। কহিল, পৃথিবীতে স্বামী কি কেবল তুমি একটি? দুঃসময়ে তাঁরা নেন্‌ কি ক'রে? স্ত্রীর গহনা থাকে কি জন্যে? এত কষ্টে এগুলো বাঁচাতে গেলেই বা কেন? বলিয়া সে ছোট টীনের বাক্সটা হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিল, আর বিপদের দিনে যদি কোন কাজেই না লাগে ত মিথ্যে বোঝা বয়ে বেড়িয়ে কি হবে? আগুন ত এখনও জ্বলচে, আমি টান মেরে ফেলে

দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চ'লে যাই—তোমার মনে যা আছে ক'রো। বলিয়া সে আঁচল দিয়া চোখ চাপিয়া ধরিল।

মিনিট-দুই চুপ করিয়া থাকিয়া মহিম ধীরে ধীরে কহিল, আমি সমস্ত ভেবে দেখলাম অচলা। কিন্তু তুমি ত জানো, আমি কোন কাজ ঝোঁকের ওপর করি নে; কিংবা আর কেউ করে, সেও চাই নে, তুমি যা দিতে চাচ্ছো, তা নিজের ব'লে নিতে পারলে আজ আমার সুখের সীমা থাকত না; কিন্তু কিছুতেই নিতে পারি নে। দুঃখ দেখে তোমার মত আরও এক জন আরও ঢের বেশি আমাকে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সেও যেমন দয়া, এও তেমনি দয়া; কিন্তু এতে না তোমাদের না আমার কারও শেষ পর্য্যন্ত ভাল হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

অচলা আর সহ্য করিতে পারিল না। কান্না ভুলিয়া বোধ করি প্রতিবাদ করিবার জন্যই দৃপ্ত চক্ষু দুটি উপরে তুলিবামাত্র স্বামীর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে পাইল, কতকটা দূরে তাহাদের যে পুষ্করিণী আছে, তাহারই ঘাটের পাশে বাঁধানো নিমগাছতলায় সুরেশ হাতে মাথা রাখিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। অচলার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল এবং উচ্ছ্রিত মাথা তাহার আপনি হেঁট হইয়া গেল।

কিন্তু মহিম যেন কতকটা অন্যমনস্কের মত আপন মনেই বলিতে লাগিল, শুধু যে কখনো শান্তি পাবো না তা নয়, তোমাকে বারংবার বঞ্চিত করতে পারি এ সম্বন্ধই কোনদিন আমাদের মধ্যে হয় নি। একটুখানি থামিয়া কহিল, অচলা, নিজেকে রিক্ত ক'রে দান করবার অনেক দুঃখ। কিন্তু ঝোঁকের ওপর হয় ত তাই এক মুহূর্ত্তে পারা যায়, কিন্তু তার ফল-ভোগ হয় সারা জীবন ধ'রে! আমি জানি, একটা ভুলের জন্যে তোমাদের মনস্তাপের অবধি নেই। আবার একটা ভুল হয়ে গেলে, তুমি না পারবে কোন দিন নিজেকে ক্ষমা করতে, না পারবে আমাকে

মাপ করতে। এ ক্ষতি সইবার মত সম্বল তোমার নেই; এ কথা আজ না টের পেতে পারো, দুদিন পরে পারবে। তাই তোমার কাছ থেকে কিছুই আমি নিতে পারব না।

কথাগুলা অচলার বুকের ভিতরে বিঁধিল। স্বামীর চক্ষে সে যে কত পর, তাহা আজ যেমন অনুভব করিল, এমন আর কোনদিন নয়; এবং সঙ্গে সঙ্গেই মৃণালের স্মৃতিতে সে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সেও কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি এতক্ষণ ধ'রে যা বোঝাচ্ছো সে আমি বুঝেছি। হয় ত তোমার কথাই সত্যি, হয় ত তোমার মুখ দেখে দয়া হওয়াতেই আমার যথাসর্ব্বস্ব দিতে চেয়েছিলুম। হয় ত দুদিন পরে আমাকে সত্যি এর জন্যে অনুতাপ করতে হ'তো; সব ঠিক, কিন্তু দ্যাখো, অপরের মনের ইচ্ছে বুঝে নেবার মত মত বুদ্ধিই তোমার থাক্, তোমাকে বুঝিয়ে দেবারও জিনিস আছে। স্ত্রীর জিনিস জোর ক'রে নেওয়া ত দূরের কথা, হাত পেতে নেবার সম্বল তোমারই বা কি আছে? আর তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না। এটুকু বিবেক-বুদ্ধি যে এখনো তোমাতে বাকি আছে, আজ থেকে তাই আমার সান্ত্বনা। কিন্তু যেখানেই থাকি একদিন-না-একদিন তোমাকে সব কথা বুঝতেই হবে। হবেই হবে। বলিয়া সে হাত দিয়া নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কান্না রোধ করিল।

নটার ট্রেনে সুরেশও বাটী ফিরিতেছিল। গত রাত্রের অগ্নিকাণ্ড তাহাকে কেমন যেন একরকম করিয়া দিয়াছিল। কাহারও সহিত কথা কহিবার যেন শক্তিই তাহাতে ছিল না। গাড়ী আসিতে এখনও কিছু বিলম্ব ছিল; সুরেশ মহিমকে ষ্টেশনের এক প্রান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, মহিম, আগুন লাগার জন্যে আমাকে ত তুমি সন্দেহ করো নি?

মহিম তাহার হাত দুটো সজোরে ধরিয়া ফেলিয়া শুধু বলিল, ছি!

সুরেশের দুই চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। বাষ্পরুদ্ধ-স্বরে বলিল, কাল থেকে এই ভয়ে আমার শান্তি নেই মহিম!

মহিম নীরবে শুধু একটু তাহার হাতের মধ্যে চাপ দিল। তাহার পরে কহিল, সুরেশ, একটা সত্যকার অপরাধ অনেক মিথ্যা অপরাধের বোঝা বয়ে আনে। কিন্তু অনেক দুঃখ পেয়ে তুমি যাই কর না কেন, যাকে 'ক্রাইম' বলে, সে তুমি কোন দিন করতে পার না ব'লে আজও আমি বিশ্বাস করি। একটুখানি থামিয়া কহিল, সুরেশ, তুমি ভগবান মানো না বটে, কিন্তু যে যথার্থ মানে, সে অহর্নিশি প্রার্থনা করে, এ বিশ্বাস তিনি যেন তার না ভেঙ্গে দেন।

ট্রেণ আসিয়া পড়িল। মেয়েদের গাড়ীতে অচলা এবং তাহার দাসীকে তুলিয়া দিয়া মহিম সুরেশের কাছে আসিতেই সে জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, তোমার কাল্‌কের 'ক্ষতিটা পূর্ণ ক'রে দেবার প্রার্থনাটা আমার কিছুতেই মঞ্জুর করলে না, কিন্তু তোমার ভগবান তোমার প্রার্থনা যেন মঞ্জুর করেন ভাই। আমাকে যেন আর তিনি ছোট না করেন, বলিয়াই সে হাত ছাড়িয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

ওদিকে জানালায় মুখ রাখিয়া অচলা যদুর সঙ্গে এতক্ষণ চুপি চুপি ক কথা কহিতেছিল; মহিম নিকটে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিল, মৃণাল-দিদির স্বামী না কি আজ মারা গেছেন?

মহিম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ঘণ্টা-খানেক পূর্ব্বে মারা গেছেন শুনলাম।

অচলা জিজ্ঞাসা কহিল, প্রায় দশ-বারো দিন ধ'রে নিমোনিয়ায় ভুগছিলেন। এ খবরটাও আমাকে দেওয়া কোন দিন তুমি আবশ্যক মনে করো নি?

মহিম জবাব দিতে চাহিল, কিন্তু কি করিয়া কথাটা গুছাইয়া বলিবে, ভাবিতে ভাবিতেই বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

তখনও কেদারবাবু আগেকার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান নাই। খাওয়া-দাওয়ার পরে আসিয়া বারান্দায় একখানা ইজি-চেয়ারে পড়িয়া খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে হয় ত একটু তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলেন, দরজায় ঠিকা গাড়ীর কঠোর শব্দে চোখ মেলিয়া দেখিলেন, সুরেশ এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার কন্যা ও ঝি অবতরণ করিল। ঘুমের ঝোঁক তাঁহার নিমেষে উড়িয়া গেল; কি একটা অজ্ঞাত শঙ্কায় শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িয়া গলা বাড়াইয়া চীৎকার করিলেন, অচলা যে? সুরেশ, তুমি কোথা থেকে? কি, ব্যাপার কি? এ সব কি কাণ্ডকারখানা, আমি ত কিছু বুঝতে পারি নে।

অচলা উঠিয়া আসিয়া পিতার পদধূলি গ্রহণ করিল, সুরেশ প্রণাম করিয়া কহিল, মহিমের টেলিগ্রাম পান্ নি?

কেদারবাবু উদ্বিগ্নমুখে কহিলেন, কৈ, না!

সুরেশ একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিয়া বলিল, তা হ'লে হয় সে টেলিগ্রাফ কর্‌তে ভুলেছে, না হয় এখনো এসে পৌঁছায় নি।

কেদারবাবু কহিলেন, টেলিগ্রাফ যাক্, ব্যাপার কি, তাই আগে বল না। তুমি এদের কোথা থেকে নিয়ে এলে?

সুরেশ বলিল, কাল রাত্রিতে আগুন লেগে মহিমের বাড়ি পুড়ে গেছে।

বাড়ি পুড়ে গেছে? সর্ব্বনাশ! বল কি—বাড়ি পুড়ে গেল? কেমন ক'রে পুড়ল? মহিম কৈ? তুমি এদের পেলে কোথায়? এক নিশ্বাসে এতগুলা প্রশ্ন করিয়া কেদারবাবু ধপ করিয়া তাঁহার ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

সুরেশ বলিল, এদের সেখান থেকেই নিয়ে আস্‌ছি। আমি সেইখানেই ছিলাম কি না।

কেদারবাবুর মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন এবং গম্ভীর হইয়া উঠিল, কহিলেন, তুমি ছিলে সেখানে? কবে গেলে, আমি ত কিছু জানি নে। কিন্তু সে কৈ?

সুরেশ বলিল, মহিম ত আস্‌তে পারছে না, তাই—

তাঁহার গম্ভীর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না না, এ সব ভাল কথা নয়। অতিশয় মন্দ কথা। যৎপরোনাস্তি অন্যায়। এ সব ত আমি কোনমতেই—, বলিতে বলিতে তিনি চোখ তুলিয়া কন্যার মুখের প্রতি চাহিলেন।

অচলা এতক্ষণ একটা চেয়ারের পিঠে হাত রাখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। পিতার এই সংশয় তাহার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। তাহার এই অকস্মাৎ আগমনের হেতু যে তিনি লেশমাত্র বিশ্বাস করেন নাই, তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া লজ্জায় ঘৃণায় তাহার মুখে আর রক্তের চিহ্ন রহিল না।

কেদারবাবু এখানে ভুল করিলেন। মেয়ের মুখের চেহারায় তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। আরাম-চেয়ারটায় হেলিয়া পড়িয়া হাতের কাগজখানা মুখের উপরে টানিয়া নিয়া ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যা ভাল বোঝ, তোমরা কর আমি কালই বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও চ'লে যাবো।

সুরেশ ক্রুদ্ধ-বিস্ময়ের সহিত কহিল, এ সব আপনি কি বল্‌ছেন কেদারবাবু? আপনিই বা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন কেন, আর হয়েছেই বা কি? বলিয়া সে একবার অচলার প্রতি, একবার তাহার পিতার প্রতি চাহিতে লাগিল; কিন্তু কাহারও মুখ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না।

কেদারবাবুর কাছে কোন জবাব না পাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, যাক্, আমার ওপর মহিম যা ভার দিয়েছিল, তা হয়ে গিয়াছে।

এখন আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন। আমার নাওয়া-খাওয়া এখনো হয় নি, আমি বাড়ি চল্লুম। বলিয়া সে কয়েকপদ দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইতেই কেদারবাবু উঠিয়া বসিয়া ক্লান্ত-কণ্ঠে কহিলেন, আহা, যাও কেন ছাই। ব্যাপারটা কি, তবু শুনিই না। আগুন লাগল কি ক'রে?

সুরেশ অভিমান-ভরে বলিল, তা জানি নে।

তুমি গেলে কবে সেখানে?

দিন পাঁচ-ছয় পূর্ব্বে। আমি খাই নি এখনো, আর দেরি করতে পারি নে, বলিয়া পুনরায় চলিবার উপক্রম করিতেই কেদারবাবু বলিয়া উঠিলেন, আহা হা, নাওয়া-খাওয়া ত তোমাদের কারও হয় নি দেখচি, কিন্তু জলে পড় নি এটাও ত বাড়ি, এখানেও ত চাকর-বাকর আছে। অচলা, ডাকো না একবার বেয়ারাটাকে—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস, বোস, সুরেশ, ব্যাপারটা কি হ'লো, খুলেই সব বল, শুনি।

সুরেশ ফিরিয়া আসিয়া বসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, রাত্রে ঘুমোচ্চি, মহিমের চীৎকারে ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়ে দেখি, সমস্ত ধূ ধূ ক'রে জ্বলচে। খড়ের ঘর, নিবোবার উপায়ও ছিল না, সে বৃথা চেষ্টাও কেউ করলে না—সর্ব্বস্ব পুড়ে গেল আর কি!

কেদারবাবু লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, বল কি হে! সর্ব্বস্ব পুড়ে গেল? কিছুই বাঁচাতে পারা গেল না? অচলার গয়নাপত্রগুলো?

সেগুলো বেঁচেচে!

তবু রক্ষে হোক! বলিয়া বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তবু, কি ক'রে আগুনটা লাগল?

সুরেশ কহিল, বল্লুম ত আপনাকে, সে খবর এখনো জানা যায় নি। তবে গ্রামের মধ্যে বড় কেউ আর তার শুভাকাঙ্ক্ষী নেই, তা জেনে এসেছি।

নেই বুঝি ?

না।

কেদারবাবু আর কোন কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিয়া পরিশেষে আর একটা গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, যাও, স্নান ক'রে এসো গে সুরেশ, আর বেলা ক'রো না। দেখি, রান্না-বান্নার কি যোগাড় হচ্ছে। বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আহারাদির পরেও তিনি সুরেশকে মুক্তি দেন নাই। সে একটা আরাম-চৌকীর উপরে অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় পড়িয়া ছিল। অচলাও সেই যে স্নানান্তে তাহার ঘরে গিয়া খিল দিয়াছিল, আর তাহার কোন সাড়া-শব্দ ছিল না। বিশ্রাম ছিল না শুধু কেদারবাবুর। এখন যে টেলিগ্রাম আসা না আসার বিশেষ কোন সার্থকতা ছিল না, তাহারই জন্য সমস্ত বেলাটা ছটফট্ করিয়া, সন্ধ্যার সময় অসময়ে ঘুমানো উচিত নয়, এই অজুহাতে মেয়েকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া, প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন, তোমরা যে বল্লে, সে টেলিগ্রাম করেচে—টেলিগ্রাম করেচে—কৈ, তার ত কিছুই দেখি নে। তোমরা ট্রেণেতে এসে পড়লে, আর তারের খবর এতক্ষণেও পৌছল না। আচ্ছা, দাঁড়াও ত দেখি, বলিয়া মেয়ের মুখের জবাব না শুনিয়াই চটিজুতা ফট্‌ফট্ করিতে করিতে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন এবং ক্ষণকাল পরেই নিচে হইতে তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল। অচলার দাসীকে ধরিয়া তিনি নানা-প্রকারে জেরা করিতেছেন, এবং প্রত্যুত্তরে সে আশ্চর্য্য হইয়া বারংবার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে, সে কি বাবু, আগুন লেগে ঘর-দোর সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল, চক্ষে দেখে এলুম, আর আপনি বল্‌ছেন, পোড়ে নি! আর আগুন যদি না-ই লাগবে, তবে ঘর-দোর পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল কি ক'রে, একবার বিবেচনা ক'রে দেখুন দেখি।

সুরেশ সমস্তই শুনিতেছিল ; সে মাথা তুলিয়া দেখিল, অচলা চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া পাংশু-মুখে কান পাতিয়া প্রত্যেক কথাটি গিলিতেছে। শুষ্ক উপহাসের ভঙ্গীতে কহিল, তোমার বাবার হ'ল কি, বল্‌তে পারো ?

অচলা চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, না।

সুরেশ কহিল, আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি, উনি বিশ্বাস করেন নি। ওঁর ধারণা, আগুন লাগার গল্পটা আমাদের আগাগোড়া বানানো। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সত্যি-মিথ্যে একদিন টের পাবেনই, কিন্তু ওঁর সন্দেহটা এমন যে, এখানে আসা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেচে।

অচলা শুষ্ক-মুখে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আর আসবেন না ?

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বোধ করি সম্ভব নয়। আমারও ত কিছু আত্ম-সম্মানবোধ আছে। কোন লোককে দিয়ে আমার ব্যাগটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ো।

অচলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা। কিন্তু তাহার এখানে আসা না আসার সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না।

তা হ'লে কাল সকালেই দিয়ো। অনেক দরকারী জিনিস আমার ওর মধ্যে আছে, বলিয়া সে কেদারবাবুর জন্যে অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

কেদারবাবু ফিরিয়া আসিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে যে অপ্রসন্ন হইয়াছেন, তাহা বোধ হইল না।

রাত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শয্যার উপর ছটফট করিয়া অচলা উঠিয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা, বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া, সম্মুখের রাজপথের উপরে লোকচলাচলের প্রতি চাহিয়া কিছুক্ষণের জন্যেও সে অন্যমনস্ক হয়।

তাহার ঘরের ও-দিকের কবাট খুলিয়া সে বারান্দায় আসিয়া দেখিল, তখনও বসিবার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। প্রথমে মনে করিল, চাকরেরা

গ্যাস বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই ভিতর হইতে তাহার পিতার কণ্ঠস্বর কানে আসিতে তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। চিরদিন তিনি দশটা বাজিতে না বাজিতেই শয্যাগ্রহণ করেন; কিন্তু আজ সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই দাসীর গলা শুনা গেল। সে বলিতেছে, এখন সোয়ামী মারা গেছে—আর যে মৃণাল-দিদিমণি শ্বশুর-ঘর করে, এমন ত আমার মনে হয় না বাবু। জামাইবাবুর সঙ্গে কি যে দাদানাতনী সুবাদ, তা তেনারাই জানে।

প্রত্যুত্তরে কেদারবাবু শুধু হুঁ বলিয়াই চুপ করিয়া রহিলেন।

অচলা বুঝিল, ইতিপূর্ব্বে অনেক কথাই হইয়া গিয়াছে। মৃণালের সম্বন্ধে, মহিমের সম্বন্ধে, তাহার সম্বন্ধে—কিছুই বাদ যায় নাই। কিন্তু পাছে নিজের সম্বন্ধে নিরতিশয় অপ্রিয় কথা নিজের কানেই শুনিতে হয়, এই ভয়ে সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনই নীরবে ফিরিয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু কিসে যেন তাহার পা লোহার শিকলে বাঁধিয়া দিয়া গেল।

কেদারবাবু অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, দুজনের তা হ'লে বনিবনাও হয় নি বল?

ঝি কহিল, মোটে না বাবু, মোটে না। একটি দিনের তরে না।

এই দাসীটিকে অচলা নির্ব্বোধ বলিয়াই এতদিন জানিত; আজ দেখিল, বুদ্ধি তাহার কাহারো অপেক্ষা কম নয়।

কেদারবাবু আবার মিনিট-খানেক মৌন থাকিয়া বলিলেন, কাল রাতে তা হ'লে কারও খাওয়া হয় নি বল? সুরেশ যাওয়া পর্য্যন্তই এক রকম ঝগড়া-ঝাঁটিতেই দিন কাটছিল।

দাসীর উত্তর শুনা গেল না বটে, কিন্তু পিতার মুখের মন্তব্য শুনিয়াই বুঝা গেল, সে গ্রীবা আন্দোলনের দ্বারা কিরূপ অভিমত ব্যক্ত করিল। কারণ পরক্ষণেই কেদারবাবু একটা গভীর নিঃশ্বাস মোচন করিয়া

বলিলেন, এমনটি যে এক দিন ঘটবে, আমি আগেই জানতুম। আজ-কালকার ছেলে-মেয়েরা ত বাপ-মায়ের কথা গ্রাহ্য করে না; নইলে আমি ত সমস্তই একরকম ঠিক ক'রে এনেছিলুম। আজ তা হ'লে ওর ভাবনা কি! বলিয়া আর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাহাও স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল।

ঝি পূর্ণ সহানুভূতির সহিত প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কহিল, তাই বলুন ত বাবু, নইলে আজ ভাবনা কি! কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে কি না একটা খোড়ো মেটে বাড়ি! তাও রইল কৈ! আর জামাইবাবুও ত—, বলিয়া সেও কথাটাকে শেষ না করিয়াও একটা দীর্ঘশ্বাসের দ্বারা অনেক দূর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দিল।

কপাল! বলিয়া কেদারবাবু মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আচ্ছা, তুই যা; বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া আলো নিবাইবার জন্য বেয়ারাকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

অচলা পা টিপিয়া আস্তে আস্তে তাহার ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। পিতার উদারতা, তাঁহার ভদ্রতাবোধের ধারণা, কোন দিনই তাহার মনের মধ্যে খুব উচ্চ অঙ্গের ছিল না, কিন্তু সে যে বাটীর দাসীর সহিত নিভৃতে আলোচনা করিবার মত এত ক্ষুদ্র, ইহাও সে কখনও ভাবিতে পারিত না। আজ তাহার নিজের মন ছোট হইয়া মাটীতে লুটাইতেছে—কিন্তু তাহার স্বামী, তাহার পিতা, তাহার দাসী, তাহার বন্ধু—সবাই যখন তাহারই মত ভূমিতলে পড়িয়া, তখন কাহাকেও অবলম্বন করিয়া কোন দিন যে সে এই ধূলিশয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, এ ভরসা সে কল্পনা করিতেও পারিল না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কেদারবাবু সংসারে সাধারণ দশজনের মত দোষে-গুণে মানুষ। মেয়ের বিবাহে জামাই যাহাতে পাশ করা হয়, অবস্থাপন্ন হয়, এই কামনাই করিয়াছিলেন। মহিম ভাল ছেলে, সে এম এ পাশ করিয়াছে, দেশে তাহার অন্নবস্ত্রের সংস্থান আছে, অতএব তাহার হাতে কন্যা সম্প্রদান করিতে তিনি সৌভাগ্য বলিয়াই গণ্য করিয়াছিলেন। তিনি অকস্মাৎ তাহার ধনাঢ্য বন্ধু সুরেশ যখন একদিন তাহার গাড়ী করিয়া আসিয়া একটা উল্টা রকমের খবর দিয়া নিজেই জামাইগিরির উমেদার খাড়া হইল, তখন উভয় বন্ধুর মধ্যে আর্থিক সঙ্গতির হিসাব করিয়া মহিমকে বরখাস্ত করিতে কেদারবাবুর মনের মধ্যে কোন আপত্তিই উঠিল না। তিনি ভালবাসার সূক্ষ্মতত্ত্বের বড় একটা ধার ধারিতেন না; তাঁহার বিশ্বাস ছিল মেয়েমানুষে যাহার কাছে গাড়ী পাল্কী চড়িয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পায়, স্বামী হিসাবে তাহাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করে। সুতরাং মেয়েকে সুখী করাই যদি পিতার কর্ত্তব্য হয় ত এত বড় অযাচিত সুযোগ কোনমতেই যে হাত-ছাড়া করা উচিত নয়,ইহা স্থির করিতে তাঁহাকে অত্যন্ত বেশী চিন্তা করিতে হয় নাই।

এমন কি, বড়লোক জামাতার কাছে কর্জ্জ করিয়া বিবাহের পূর্ব্বেই হাজার পাঁচেক টাকা লওয়াও তিনি দোষের মনে করেন নাই; এবং বাড়িটা যখন তাহার থাকিবে, তখন পরিশোধের দুশ্চিন্তাও তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে নাই।

অথচ হতভাগা মেয়েটা সমস্ত পণ্ড করিয়া দিল—কিছুতেই বাগ মানিল না। অতএব শেষ পর্য্যন্ত সেই মহিমের হাতেই তাঁহাকে মেয়ে দিতে হইল বটে, কিন্তু এই দুর্ঘটনায় তাঁহার ক্ষোভের অবধি রহিল না। তা ছাড়া, যে কথাটা এখন তাঁহাকে নিজের কাছে নিজে স্বীকার করিতে

হইল, তাহা এই যে, টাকাটা [illegible] কিন্তু জিনিসটা লেখাপড়ার মধ্যে না [illegible] সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হইয়া চোখে [illegible] মধ্যেও তেমনি উজ্জ্বল করিয়া [illegible] মনের মধ্যে উঠিল বটে কিন্তু উত্তরটা প্রায় তেমনই ঝাপসা হইয়া রহিল।

অচলা শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। ইহার পরে সুরেশের [illegible]-যাওয়া, ঘনিষ্ঠতা কেদারবাবু পছন্দ করিতেন না। বাটী [illegible] অধিকাংশ সময় দেখাও দিতেন না। কিন্তু [illegible] বলিয়া মেয়ের দুর্ব্যবহার বৃদ্ধ অন্তরের মধ্যে লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়াই রহিলেন।

এই ভাবেই দিন কাটিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি অত্যন্ত অসুখে পড়িয়া গেলেন। সুরেশ আসিয়া চিকিৎসা করিয়া এবং নিজে পুত্রাধিক সেবা-যত্ন করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া তুলিল। তিনি স্বয়ং ঋণের উল্লেখ করিলে, সে তাহা বন্ধুকে যৌতুক দিয়াছে বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সেই অবধি এই যুবকটির প্রতি তাঁহার স্নেহ প্রতিদিন গভীর ও অকৃত্রিম হইয়া উঠিতে লাগিল। এমন কি, সময়ে সময়ে কন্যার বিরুদ্ধে তাঁহার মনের মধ্যে অভিশাপের ন্যায় উদয় হইত, যে দুর্ভাগা মেয়েটা এমন রত্ন চিনিল না, উপেক্ষা করিয়া ত্যাগ করিয়া গেল, সে যেন একদিন ইহার শাস্তি ভোগ করে।

এই ব্যাপারে মহিম তাঁহার দু'চক্ষের বিষ হইয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁর কন্যা যে নারীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বামীত্যাগের গভীর দুষ্কৃতি সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া তাঁহারই গৃহে আসিয়া উঠিবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই ; এবং এই মহাপাপে যে ব্যক্তি সাহায্য করিয়াছে, সে যত বড় হোক, পিতার মনের ভাব যে তাহার বিরুদ্ধে কিরূপ বাঁকিয়া দাঁড়াইবে, ইহাও অনুমান করা কঠিন নহে।

অন্তপক্ষে পিতার প্রতি কন্যার মনোভাব পূর্ব্বে যেমনি থাক্‌, যে দিন

তিনি শুদ্ধমাত্র টাকার লোভেই মহিমকে বর্জ্জন করিয়া সুরেশের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, এবং পরিশোধের কোন উপায় না থাকা সত্ত্বেও তাহার কাছে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে মানুষ-হিসাবে কেদারবাবু অচলার চক্ষে অত্যন্ত নামিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অশ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল কাল রাত্রে, যখন সে স্বকর্ণে শুনিতে পাইল, তিনি নিজের কন্যার চরিত্র সম্বন্ধে গোপনে দাসীর মতামত গ্রহণ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিলেন না।

কিন্তু সেই সঙ্গে অচলা আজি আপনাকেও দেখিতে পাইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া চোখে পড়িল, যে মুহূর্ত্তে সে স্বামীকে নিজের মুখে বলিয়াছে, তাহাকে সে ভালবাসে না, সেই মুহূর্ত্তেই নারীর সর্ব্বোত্তম মর্য্যাদাও জগৎসংসার হইতে তাহার জন্য মুছিয়া গিয়াছে। তাই আজ সে স্বামীর কাছে ছোট, পিতার কাছে ছোট, নিজের পরিচারিকার কাছে ছোট, এমন কি সেই সুরেশের মত লোকের চক্ষেও আজ সে এত ছোট যে তাহাকে লালসার সঙ্গিনী কল্পনা করাও তাহার পক্ষে আর দুরাশা নয়। কিন্তু সত্যই কি সে তাই? এম্‌নি ছোট? এই ত সে দিন সে যাহার ভালবাসাকেই সর্ব্ব-জয়ী করিতে সমস্ত বিরোধ, সমস্ত প্রলোভন পায়ে দলিয়া উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজ ইহারই মধ্যে সে কথা কি সবাই ভুলিয়াছে? তাহাকে সুরেশের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াও স্বামী তাহার কোন সংবাদ লইলেন না। এই ঔদাসীন্যের নিগূঢ় অপমান ও লাঞ্ছনা তাহাকে সমস্ত রাত্রি যেন আগুন দিয়া পোড়াইতে লাগিল।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে। তরুণ সূর্য্যালোক খোলা জানলার ভিতর দিয়া ঘরের মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া শিয়রের জানালাটা খুলিয়া দিয়া বাহিরে পথের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কলিকাতার রাজপথে জনপ্রবাহের বিরাম নাই। কেহ কাজে

চলিয়াছে, কেহ ঘরে ফিরিতেছে, কেহ বা প্রভাতের আলোক ও হাওয়ার মধ্যে শুধু শুধু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। [illegible] হঠাৎ এক সময়ে তাহার মনে হইল, [illegible] ঘরে বসিয়া নাই, আর আমিই বা যথার্থ কি এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে মুখ দেখাইতে পারি না—আপনাকে আপনি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি! অপরাধ যদি কিছু করিয়াই থাকি ত সে তাঁর কাছে। সে দণ্ড তিনিই দিবেন; কিন্তু নির্ব্বিচারে যে-কেহ শাস্তি দিতে আসিবে, তাহাই মাথায় পাতিয়া লইব কিসের জন্য?

অচলা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সমস্ত গ্লানি যেন জোর করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কেদারবাবু তাঁহার আরাম-কেদারায় বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন, একটিবারমাত্র মুখ তুলিয়াই আবার সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিলেন।

খানিক পরেই বেহারা কেৎলিতে গরম চায়ের জল এবং অন্যান্য সরঞ্জাম আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল, কেদারবাবু নিজে উঠিয়া আসিয়া নিজের জন্য এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া লইলেন এবং বাটিটি হাতে করিয়া নিঃশব্দে তাঁহার আরাম-চৌকিতে ফিরিয়া গিয়া খবরের কাগজ লইয়া বসিলেন।

অচলা নতমুখে বসিয়া পিতার আচরণ সমস্ত লক্ষ্য করিল; কিন্তু নিজে যাচিয়া তাঁহার চা তৈরী করিয়া দিতে কিম্বা একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসও হইল না, ইচ্ছাও করিল না।

কিন্তু ঘরের মধ্যে এমন করিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকাও অসম্ভব। এমন কি, এই ভাবে দীর্ঘকাল এক গৃহের মধ্যেও তাঁহার সহিত বাস করা সম্ভবপর এবং উচিত কি না এবং না হইলেই বা

সে কি উপায় করিবে, এই জটিল সমস্যার কোথাও একটু নিরালায় বসিয়া মীমাংসা করিয়া লইতে যখন সে উঠি উঠি করিতেছিল, এমন সময়ে দুঃসহ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল সুরেশ ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

সে হাত তুলিয়া কেদারবাবুকে নমস্কার করিতে তিনি মুখ তুলিয়া মাথাটা একটু নাড়িয়া পুনশ্চ পড়ায় মন দিলেন।

সুরেশ চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। চায়ের জিনিসগুলা সরাইবার জন্য বেহারা ঘরে ঢুকিতেই তাহাকে কহিল, আমার ব্যাগটা কোথায় আছে, আমার গাড়ীতে তুলে দাও ত। শেভ কর্‌বার জিনিসগুলো পর্য্যন্ত তার মধ্যে আছে। দেরী ক'রো না, আমি এখ্‌খুনি যাবো।

যে আজ্ঞে, বলিয়া সে চলিয়া গেলে আবার সমস্ত কক্ষটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। খানিক পরে সুরেশ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, মহিমের কোন খবর পাওয়া গেল?

কেদারবাবু মুখ না তুলিয়াই শুধু বলিলেন, না।

সুরেশ কহিল, আশ্চর্য্য!

তার পরে আবার সমস্ত চুপ চাপ। বেহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, ব্যাগ তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমি তা হ'লে চল্‌লুম। মহিমের চিঠি এলে আমাকে একটু খবর পাঠাবেন, বলিয়া সুরেশ উঠিবার উপক্রম করিতেই সহসা কেদারবাবু হাতের কাগজখানা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি একটু অপেক্ষা কর সুরেশ, আমি আসচি। বলিয়া তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়াই চটিজুতার পটাপট শব্দ করিয়া একটু দ্রুতবেগেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এতক্ষণ অবধি অচলা অধোমুখেই ছিল। তিনি বাহির হইয়া যাইতেই বিস্মিত সুরেশ অকস্মাৎ মুখ ফিরাইতেই তাহার দৃষ্টি অচলার

ত্রস্ত পীড়িত ও একান্ত মলিন দুই চক্ষুর উপরে গিয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?

অচলা মুখ আনত করিয়া শুধু মাথা নাড়িল।

সুরেশ বলিল, আমি যে কত দুঃখিত, কত লজ্জিত হয়েচি তা ব'লে জানাতে পারি নে।

অচলা অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিল।

সে পুনশ্চ কহিল, তোমার বাবা যে আমাকে এমন হীন, এত বড় পাষণ্ড ভাবতে পারেন, এ আমি স্বপ্নেও মনে করি নি।

এ অভিযোগেও অচলা কোন উত্তর দিল না, তেমনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

সুরেশ বলিল, আমার এম্‌নি ইচ্ছে হচ্ছে যে, এখ্‌খুনি মহিমের কাছে গিয়ে তাকে—কথাটা শেষ হইতে পাইল না, কেদারবাবু ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহার হাতে একখানা ছোট কাগজ। সেইখানা সুরেশের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া কহিলেন, গড়িমসি ক'রে তোমার সেই টাকাটার একখানা রসিদ দেওয়া আর ঘটে উঠে নি। পাঁচ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখেই দিলুম—সুদ বোধ হয় আর দিতে পারব না; তবে এই বাড়িটা ত রইল, এর থেকে আসলটা শোধ হ'তে পারবেই।

সুরেশ স্তম্ভিতের ন্যায় ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, আমি ত আপনার কাছে হ্যাণ্ডনোট চাই নি কেদারবাবু!

কেদারবাবু বলিলেন, তুমি চাও নি সত্য, কিন্তু আমার ত দেওয়া উচিত। এত দিন যে দিই নি, সেই আমার যথেষ্ট অন্যায় হয়ে গেছে সুরেশ, কাগজখানা তুমি পকেটে তুলে রাখো! বুড়ো হয়েছি, হঠাৎ যদি ম'রে যাই, টাকাটার গোল হ'তে পারে।

সুরেশ আবেগের সহিত জবাব দিল, কেদারবাবু, সুরেশ আর যাই

করুক, সে টাকা নিয়ে কখনো কারো সঙ্গে গোল করে না। তা ছাড়া, আপনি নিজেও বেশ জানেন, এ টাকা আমি চাই নে—এ আমি আমার বন্ধুকে যৌতুক দিয়েছি।

কেদারবাবু বলিলেন, তা হ'লে সে তোমার বন্ধুকেই দিয়ো আমাকে নয়। আমি যা নিয়েছি, সে আমারই ঋণ।

সুরেশ কহিল, বেশ আমার বন্ধুকেই দেবো, বলিয়া কাগজখানা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া অচলার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্রই, কেদারবাবু অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। চীৎকার করিয়া বলিলেন, খবরদার, সুরেশ! কাল থেকে অনেক অপমান আমি নিঃশব্দে সহ্য করেছি, কিন্তু আমার মেয়েকে আমার চোখের সামনে তুমি টাকা দিয়ে যাবে, সে আমার কিছুতেই সইবে না ব'লে দিচ্ছি! বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার আরাম কেদারায় ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

প্রথমটা সুরেশ চমকিয়া কেদারবাবুর প্রতি নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তিনি ওইরূপে বসিয়া পড়িলে সে তাহার বিবর্ণ মুখ অচলার প্রতি ফিরাইয়া দেখিল, সে এক মুহূর্তে যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে। প্রবল চেষ্টায় একবার সুরেশ কি একটা বলিতেও গেল; কিন্তু তাহার শুষ্ক-কণ্ঠ হইতে একটা অব্যক্ত ধ্বনি ভিন্ন স্পষ্ট কিছুই বাহির হইল না। আবার ফিরিয়া দেখিল, কেদারবাবু দুই করতল মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া তেমনি পড়িয়া আছেন। আর সে কোন কথা বলিবার চেষ্টাও করিল না, শুধু আড়ষ্টের মত আরও মিনিট-খানেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া অবশেষে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু কন্যা ও পিতা ঠিক তেমনি একভাবে বসিয়া রহিলেন; এবং দেয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ ছাড়া সমস্ত কক্ষ ব্যাপিয়া কেবল একটা নিষ্ঠুর নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

নিচে সুরেশের রবার-টায়ারের গাড়িখানা যে ফটক পার হইয়া গেল, তাহা ঘোড়ার খুরের শব্দে বুঝিতে পারা গেল এবং পরক্ষণেই বেহারা ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, বাবু!

কেদারবাবু চোখ তুলিয়া দেখিলেন, তাহার হাতে একখণ্ড ছিন্ন কাগজ। আর কিছু বলিতে হইল না, তিনি লাফাইয়া উঠিয়া তাহার প্রতি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, নিয়ে যা বলচি ব্যাটা, নিয়ে যা সুমুখ থেকে! বেরো বলচি—

হতবুদ্ধি বেহারাটা মনিবের কাণ্ড দেখিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিতেই, তিনি কন্যার প্রতি অগ্নি-দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কণ্ঠস্বর আরও এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিয়া বলিলেন, হারামজাদা, নচ্ছার যদি আর কোন দিন কোন ছলে আমার বাড়ি ঢোকবার চেষ্টা করে ত তাকে পুলিসে দেব—এই আমি তোমাকে জানিয়ে রাখলুম অচলা!

নিজের নাম শুনিয়া অচলা তাহার একান্ত পাণ্ডুর মুখখানি ধীরে ধীরে উন্নত করিয়া ব্যথিত ম্লান চক্ষুদুটি পিতার মুখের প্রতি নিঃশব্দে মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

পিতা কহিলেন, টাকা ছড়িয়ে বাপের চোখকে বন্ধ করা যায় না, পাষণ্ড যেন এ কথা মনে রাখে।

কন্যা তথাপি নিরুত্তর হইয়া রহিল; কিন্তু তাহার মলিন দৃষ্টি যে উত্তরোত্তর প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল, পিতার দৃষ্টিতে তাহা পড়িল না। তিনি তর্জ্জনী কম্পিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হ্যাণ্ডনোট ছিঁড়ে ফেলে বাপকে ঘুষ দেওয়া যায় না, এ কথা আমি তাকে বুঝিয়ে তবে ছাড়ব। এ বাড়ি আমি নিজে বিক্রী ক'রে নিজের ঋণ পরিশোধ ক'রে যেখানে ইচ্ছে চ'লে যাবো—আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না, তা বলে রাখচি।

এতক্ষণ পরে অচলা কথা কহিল। প্রথমটা বাধা পাইল বটে, কিন্তু

তার পরে স্থির অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, ঋণ-পরিশোধ না ক'রে বাড়িটা আমার জন্যে রেখে যাবে, এই কি আমি প্রত্যাশা করি বাবা? তুমি না করলে ত এ কাজ আমাকেই করতে হ'তো!

কেদারবাবু অধিকতর উত্তেজিতভাবে জবাব দিলেন, তোমরা যা ক'রে এসেছ, শুধু তাইতেই ত আমি ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারচি নে, তা তুমি জানো?

অচলা তেমনি শান্ত দৃঢ়স্বরে প্রত্যুত্তর দিল, না, আমি জানি নে। আমি এমন কিছু যদি করতুম বাবা, যার জন্যে তুমি মুখ দেখাতে পারো না, তা হ'লে সকলের আগে আমার মুখই তোমরা কেউ দেখতে পেতে না। সে দেশে আর যারই অভাব থাক্, ডুবে মরবার মত জলের অভাব ছিল না। বলিতে বলিতেই কান্নায় তাহার গলা ধরিয়া আসিল; কহিল, কাল থেকে যে অপমান আমাকে তুমি করচ, শুধু মিথ্যে বলেই সইতে পেরেচি, নইলে—

এইখানে তাহার একেবারে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সে মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন কোনমতে সংবরণ করিয়া দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কেদারবাবু একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। ক্রোধ করিবার, আঘাত করিবার, শোক করিবার অর্থাৎ কন্যার নিন্দিত-আচরণে সর্ব্বপ্রকার গভীর বিষাদের কারণ একমাত্র তাঁহারই ঘটিয়াছে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস; কিন্তু অপরপক্ষও যে অকস্মাৎ তাঁহারই আচরণকে অধিকতর গর্হিত বলিয়া মুখের উপর তিরস্কার করিয়া তীব্র অভিমানে কাঁদিয়া চলিয়া যাইতে পারে, এ সম্ভাবনা তাঁহার স্বপ্নেও উদয় হয় নাই। তাই অভিভূতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি আস্তে আস্তে বসিয়া পড়িলেন এবং মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বারংবার বলিতে লাগিলেন, এই নাও—এ আবার এক কাণ্ড!

ইহার পরে আট-দশ দিন পিতা-পুত্রীর যে কি করিয়া কাটিল, সে শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন। অচলা কোনমতেই নিজের ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল না, বাটীর চাকর-দাসীর কাছেও মুখ-দেখানো তাহার পক্ষে যেন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিগত কয় দিনের মত আজও সে পথের দিকে চাহিয়াই দিন কাটাইবার জন্য খোলা জানালায় আসিয়া বসিয়াছিল।

শীতের দিন, মধ্যাহ্নের সঙ্গে সঙ্গেই একটা ম্লান ছায়া যেন আকাশ হইতে মাটীর উপরে ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িতেছিল, এবং সেই মালিন্যের সহিত তাহার সমস্ত জীবনের কি একটা অজ্ঞাত সম্বন্ধ অন্তরের গভীর তলদেশে অনুভব করিয়া তাহার সমস্ত মন যেন এই স্বল্পায়ু বেলার মতই নিঃশব্দে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। তাহার চক্ষু যে ঠিক কিছু দেখিতেছিল, তাহাও নহে, অথচ অভ্যাসমত উপরে নিচে, আশে-পাশে কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়াইতে ছিল না। এম্‌নি একভাবে বসিয়া বেলা যখন আর বড় বাকি নাই, সহসা দেখিতে পাইল, সুরেশের গাড়ী তাহাদের বাটীতে প্রবেশ করিতেছে। চক্ষের পলকে তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল এবং পুলিস দেখিয়া চোর যে ভাবে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, ঠিক তেমনি করিয়া সে জানালা হইতে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে খাটের উপর শুইয়া পড়িল।

মিনিট্‌-কুড়ি পরে তাহার রুদ্ধ দরজায় ঘা পড়িল; এবং বাহির হইতে তাহার পিতা স্নিগ্ধস্বরে ডাক দিলেন, মা অচলা, জেগে আছ কি?

কিন্তু সাড়া না পাইয়া অধিকতর কোমল-কণ্ঠে কহিলেন, বেলা গেছে মা, ওঠো। সুরেশের পিসিমা তোমাকে নিতে এসেছেন, মহিম না কি ভারী পীড়িত।

অচলা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া নীরবে দ্বার খুলিয়া দিতেই সুরেশের পিসিমা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

অচলা হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

কেদারবাবু সকলের পশ্চাতে ঘরে ঢুকিয়া শয্যার একান্তে বসিয়া কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমাদের চ'লে আসার পর থেকেই মহিমের ভারি জ্বর। খুব সম্ভব রাত্রে হিম লেগে দুশ্চিন্তায়, পরিশ্রমে, নানা কারণে এই অসুখটি হয়েছে। বলিয়া সুরেশের পিসিকে উদ্দেশ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আমি ভেবে সারা হ'য়ে যাচ্চি, এদের পাঠিয়ে পর্য্যন্ত সে একটা সংবাদ দিলে না কেন? সুরেশ আমার দীর্ঘজীবী হোক্, সে গিয়ে বুদ্ধি ক'রে তাকে এখানে না এনে ফেল্‌লে কি যে হ'তো, তা ভগবানই জানেন! বলিয়া সস্নেহ অনুতাপে বৃদ্ধের গলা ধরিয়া আসিল।

অচলা নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিল, কোন প্রশ্ন করিল না, কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না।

সুরেশের পিসিমা অচলার বাহুর উপর তাঁহার ডান হাতখানি রাখিয়া শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, ভয় নেই মা, সে দুদিনেই ভাল হয়ে যাবে।

অচলা কোন কথা না কহিয়া তাঁহাকে আর একবার নত হইয়া প্রণাম করিয়া আলনা হইতে শুধু গায়ের কাপড়খানি টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

এই শীতের অপরাহ্ণে, ঠাণ্ডার মধ্যে তাহাকে কিছুমাত্র গরম জামা-কাপড় না লইয়া, খালি গায়ে, অনভ্যস্ত সাজে বাহিরে যাইতে উদ্যত দেখিয়া বৃদ্ধ পিতার বুকে বাজিল; কিন্তু পুরোবর্ত্তী ওই বিধবার সজ্জার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আর তাঁহার বাধা দিতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি শুধু কেবল বলিলেন, চল মা, আমিও সঙ্গে যাচ্চি, বলিয়া চটিজুতা পায়ে দিয়াই সকলের অগ্রে সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামিয়া চলিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মহিমের প্রতি অচলার সকলের চেয়ে বড় অভিমান এই ছিল যে, স্ত্রী হইয়াও সে একটি দিনের জন্যও স্বামীর দুঃখ-দুশ্চিন্তার অংশ গ্রহণ করিতে পায় নাই। এই লইয়া সুরেশও বন্ধুর সহিত ছেলে-বেলা হইতে অনেক বিবাদ করিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কৃপণের ধনের মত মহিম সেই বস্তুটিকে সমস্ত সংসার হইতে চিরদিন এম্‌নি একান্ত করিয়া আগলাইয়া ফিরিয়াছে যে, তাহাকে দুঃখে দুঃসময়ে কাহারও সাহায্য করা দূরে থাক্, কি যে তাহার অভাব, কোথায় যে তাহার ব্যথা, ইহাই কোন দিন কেহ ঠাহর করিতে পারে নাই।

সুতরাং বাড়ি যখন পুড়িয়া গেল, তখন সেই পিতৃপিতামহের ভস্মীভূত গৃহস্তূপের প্রতি চাহিয়া মহিমের বুকে যে কি শেল বিঁধিল, তাহার মুখ দেখিয়া অচলা অনুমান করিতে পারিল না। মৃণালের বৈধব্যেও স্বামীর দুঃখের পরিমাণ করা তাহার তেম্‌নি অসাধ্য। যে দিন নিজের মুখে শুনাইয়া দিয়াছিল, তাহাকে সে ভালবাসে না, সে দিন সে আঘাতের গুরুত্ব সম্বন্ধেও সে এম্‌নি অন্ধকারেই ছিল। অথচ এত বড় নির্ব্বোধও সে নহে যে, সর্ব্বপ্রকার দুর্ভাগ্যেই স্বামীর নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যকে যথার্থই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহার মনের মধ্যে কোন সংশয়ই উঁকি মারিত না। তাই সে দিন ষ্টেশনের উপরে সে স্বামীর অবিচলিত শান্ত মুখের প্রতি বারংবার চাহিয়া সমস্ত পথটা শুধু এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিল, সহিষ্ণুতার ওই মিথ্যা মুখোসের অন্তরালে তাহার মুখের সত্যকার চেহারাটা না জানি কিরূপ!

আজ তাহার পীড়ার সংবাদটাকে লঘু এবং স্বাভাবিক ঘটনার আকার দিবার জন্য কেদারবাবু যখন সহজ গলায় বলিয়াছিলেন, তিনি কিছুই আশ্চর্য্য হন নাই, বরঞ্চ এত বড় দুর্ঘটনার পরে এমনিই কিছু একটা

মনে মনে আশঙ্কা করিতেছিলেন, তখন অচলার নিজের অন্তরে যে ভাব এক মুহূর্ত্তের জন্যও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাকে অবিমিশ্র উৎকণ্ঠা বলাও সাজে না।

সুরেশের রবার-টায়ারের গাড়ী দ্রুতবেগেই চলিয়াছিল। পিসিমা এক দিকের দরজা টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে অচলা পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া বসিয়াছিল। শুধু কেদারবাবু কাহারো কাছে কোন উৎসাহ না পাইয়াও পথের দিকে শূন্য দৃষ্টি পাতিয়া অনর্গল বকিতেছিলেন। সুরেশের মত দয়ালু, বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ ছেলে ভূ-ভারতে নাই; মহিমের একগুঁয়েমির জ্বালায় তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন; যে দেশে মানুষ নাই, ডাক্তার-বৈদ্য নাই, শুধু চোর-ডাকাত, শিয়াল-কুকুরের বাস, সেই পাড়াগাঁয়ে গিয়া বাস করার শাস্তি একদিন তাহাকে ভাল করিয়াই ভোগ করিতে হইবে; এমনি সমস্ত সংলগ্ন অসংলগ্ন মন্তব্য তিনি নিরন্তর এই নির্ব্বাক রমণীর কর্ণে নির্ব্বিচারে ঢালিয়া চলিতেছিলেন।

ইহার কারণও ছিল। কেদারবাবু স্বভাবতঃই যে এতটা হাল্কা প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয়ের গূঢ় আনন্দ কোন সংযমের শাসনই মানিতেছিল না। তাহাদের পরম মিত্র সুরেশের সহিত প্রকাশ্য বিবাদ, একমাত্র কন্যার নিঃশব্দ বিদ্রোহ এবং সর্ব্বোপরি একান্ত কুৎসিত ও কদর্য্য সংশয়ের গোপন গুরুভার বিগত কয়েক দিন হইতে তাঁহার বুকের উপর জাঁতার মত চাপিয়া বসিয়াছিল; আজ পিসিমার অপ্রত্যাশিত আগমনে সেই ভারটা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। মহিমের অসুখের খবরটাকে তিনি মনের মধ্যে আমলই দেন নাই। যদি সে রাত্রির দৈব-দুর্ব্বিপাকে ঠাণ্ডা লাগাইয়া একটু জ্বরভাবই হইয়া থাকে ত সে কিছুই নহে। পিসিমা দুই-তিন দিনের মধ্যে আরোগ্য হইবার আশা দিয়াছিলেন; হয় ত সে সময়ও

লাগিবে না, হয় ত কাল সকালেই সারিয়া যাইবে। পীড়ার সম্বন্ধে ইহাই তিনি ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আসল কথা হইতেছে এই যে, সুরেশ স্বয়ং গিয়া তাহাকে আপনার বাড়িতে ধরিয়া আনিয়াছে এবং যে কোন ছলে তাহার স্ত্রীকে তাহার পার্শ্বে আনিয়া দিবার জন্য নিজের পিসিমাকে পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিয়াছে। কন্যা-জামাতার মধ্যে যে কিছুকাল হইতে একটা মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছিল, দাসীর মুখের এ তথ্যটি তিনি একবারও বিস্মৃত হন নাই। অতএব সমস্তই যে সেই দাম্পত্য-কলহের ফল, আজ এই সত্য পরিস্ফুট হওয়ায়, এই অবিশ্রাম বকুনির মধ্যেও তাঁহার নিরতিশয় আত্মগ্লানির সহিত মনে হইতে লাগিল, ওখানে পৌঁছিয়া সেই সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও ভদ্র যুবকের মুখের পানে তিনি চাহিয়া দেখিবেন কি করিয়া? কিন্তু তাঁহার কন্যার সর্ব্বদেহের উপর একটা কঠিন নীরবতা স্থির হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। অসুখটা যে বিশেষ কিছুই নহে, তাহা সেও মনে মনে বুঝিয়াছিল, শুধু বুঝিতে পারিতেছিল না, সুরেশ তাঁহাকে ধরিয়া আনিল কিরূপে! স্বামীকে সে এটুকু চিনিয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রাস্তার গ্যাস জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গাড়ী সুরেশের বাটীর ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং গাড়ী-বারান্দার অনতিদূরে আসিয়া থামিল। কেদারবাবু গলা বাড়াইয়া দেখিয়া সহসা উদ্বিগ্ন-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, দুখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে কেন?

সঙ্গে সঙ্গেই অচলার চকিত দৃষ্টি গিয়া তাহার উপরে পড়িল এবং লণ্ঠনের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সুরেশ একজন প্রবীণ ইংরেজকে সসম্ভ্রমে গাড়ীতে তুলিয়া দিতেছে এবং আর একজন সাহেবী-পোষাকপরা বাঙ্গালী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। ইহারা যে ডাক্তার, তাহা উভয়েই চক্ষের পলকে বুঝিতে পারিল।

তাঁহারা চলিয়া গেলে ইঁহাদের গাড়ী আসিয়া গাড়ী-বারান্দায়

লাগিল। সুরেশ দাঁড়াইয়া ছিল, কেদারবাবু চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিলেন, মহিম কেমন আছে সুরেশ? অসুখটা কি?

সুরেশ কহিল, ভাল আছে। আসুন।

কেদারবাবু অধিকতর ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, অসুখটা কি তাই বল না শুনি?

সুরেশ কহিল, অসুখের নাম কর্‌লে ত আপনি বুঝতে পার্‌বেন না কেদারবাবু! জ্বর, বুকে একটু সর্দ্দি বসেছে। কিন্তু আপনি নেমে আসুন, ওঁদের নাম্‌তে দিন।

কেদারবাবু নামিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া বলিলেন, একটু সর্দ্দি বসেছে, তার চিকিৎসা ত তুমি নিজেই কর্‌তে পার! আমি ছেলেমানুষ নই সুরেশ, দুজন ডাক্তার কেন? সাহেবডাক্তারই বা কিসের জন্যে? বলিতে বলিতে তাঁহার গলা কাঁপিতে লাগিল।

সুরেশ নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে নামাইয়া লইয়া বলিল, পিসিমা, অচলাকে ভেতরে নিয়ে যাও, আমি যাচ্চি।

অচলা কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিল না, তাহার মুখের চেহারাও অন্ধকারে দেখা গেল না; নামিতে গিয়া পা-দানের উপর তাহার পা যে টলিতে লাগিল, ইহাও কাহারও চোখে পড়িল না, সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে নামিয়া পিসিমার পিছনে পিছনে বাটীর ভিতরে চলিয়া গেল।

মিনিট কয়েক পরে দ্বারের ভারি পর্দ্দা সরাইয়া যখন সে রোগীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন মহিম বোধ করি, তাহার বাটীর সম্বন্ধেই কি সব বলিতেছিল। সেই জড়িত-কণ্ঠের দুটা কথা কানে প্রবেশ করিবামাত্রই আর তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না, ইহা অর্থহীন প্রলাপ এবং রোগ কতদূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে; মুহূর্ত্তকালের জন্য সে দেয়ালের গায়ে ভর দিয়া আপনাকে দৃঢ় করিয়া রাখিল।

যে মেয়েটি রোগীর শিয়রে বসিয়া বরফ দিতেছিল, সে ফিরিয়া চাহিল এবং ধীরপদে উঠিয়া আসিয়া অচলাকে হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। ইহার বিধবার বেশ। চুলগুলি ঘাড় পর্য্যন্ত ছোট করিয়া ছাঁটা; ইহার মুখের উপর সর্ব্বকালের সকল বিধবার বৈরাগ্য যেন নিবিড়ভাবে বিরাজ করিতেছিল। ম্লান দীপালোকে প্রথমে ইহাকে মৃণাল বলিয়া অচলা চিনিতে পারে নাই; এখন মুখোমুখি স্থির হইয়া দাঁড়াইতেই ক্ষণকালের জন্য উভয়েই যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিল; একবার অচলার সমস্ত দেহ দুলিয়া নড়িয়া উঠিল; কি একটা বলিবার জন্য ওষ্ঠাধরও কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু কোন কথাই তাহার মুখ ফুটিয়া বাহির হইল না, এবং পরক্ষণেই তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ ছিন্নলতার মত মৃণালের পদমূলে পড়িয়া গেল।

চেতনা পাইয়া অচলা চাহিয়া দেখিল, সে পিতার ক্রোড়ের উপর মাথা রাখিয়া একটা কোচের উপর শুইয়া আছে। একজন দাসী গোলাপজলের পাত্র হইতে তাহার চোখে-মুখে ছিটা দিতেছে এবং পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সুরেশ একখানা হাত-পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছে।

ব্যাপারটা কি হইয়াছে, স্মরণ করিতে তাহার কিছুক্ষণ লাগিল। কিন্তু মনে পড়িতে লজ্জায় মরিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেই কেদারবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, একটু বিশ্রাম কর মা, এখন উঠে কাজ নেই।

অচলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, না বাবা, আমি বেশ ভাল হয়ে গেছি, বলিয়া পুনরায় বসিবার চেষ্টা করিতে পিতা জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়া উদ্বেগের সহিত বলিলেন, এখন উঠবার কোন আবশ্যক নেই অচলা, বরঞ্চ একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা কর।

সুরেশও অস্ফুটে বোধ করি এই কথারই অনুমোদন করিল। অচলা

নীরবে একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া প্রত্যুত্তরে কেবল পিতার হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ঘুমোবার জন্যে ত এখানে আসি নি বাবা—আমার কিছুই হয় নি—আমি ও-ঘরে যাচ্চি। বলিয়া প্রতিবাদের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এ বাটীর ঘর-দ্বার সে বিস্মৃত হয় নাই। রোগীর কক্ষ চিনিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। প্রবেশ করিতেই মৃণাল চাহিয়া দেখিল; কহিল, তুমি এসে একটুখানি বোসো সেজদি, আমি আহ্নিকটা সেরে নিই গে। বরফের টুপীটা গড়িয়ে না প'ড়ে যায়, একটু নজর রেখো। বলিয়া সে অচলাকে নিজের জায়গায় বসাইয়া দিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

কঠিন নিমোনিয়া রোগ সারিতে সময় লাগিবে। কিন্তু মহিম ধীরে ধীরে যে আরোগ্যের পথেই চলিয়াছিল, এ যাত্রায় আর তাহার ভয় নাই, এ কথা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখের অর্থহীন বাক্য, চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি সমস্তই শান্ত এবং স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছিল।

দিন-দশেক পরে একদিন অপরাহ্ণ-বেলায় মহিম শান্তভাবে ঘুমাইতেছিল। এ বৎসর সর্ব্বত্রই শীতটা বেশি পড়িয়াছিল। তাহাতে এইমাত্র বাহিরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রোগীর খাটের সহিত একটা বড় তক্তপোষ জোড়া দিয়া বিছানা করা হইয়াছিল; ইহার উপরেই সকলে বেশ করিয়া কাপড় গায়ে দিয়া বসিয়াছিল। সকলের চোখে মুখেই একটা নিরুদ্বিগ্ন তৃপ্তির প্রকাশ; শুধু পিসিমা গৃহকর্ম্মে

অন্যত্র নিযুক্ত এবং কেদারবাবু তখনও বাড়ি হইতে আসিয়া জুটিতে পারেন নাই।

সুরেশের প্রতি চাহিয়া মৃণাল হঠাৎ হাতযোড় করিয়া কহিল, এইবার আমার ছাড়-পত্র মঞ্জুর করতে হুকুম হোক্ সুরেশবাবু, আমি দেশে যাই। এই দারুণ শীতে আমার বুড়ী শাশুড়ী হয় ত বা মরেই গেল।

সুরেশ কহিল, এখনও কি তাঁর বেঁচে থাকা দরকার না কি? না, তাঁর জন্য আপনার যাওয়া হবে না।

মৃণাল পলকের তরে ঘাড় ফিরাইয়া বোধ করি বা একটা দীর্ঘনিশ্বাসই চাপিয়া লইল; তাহার পরে সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, শুধু আপনিই নয় সুরেশবাবু, এ প্রশ্ন পূর্ব্বে আমিও অনেকবার করেছি। মনেও হয়, এখন তাঁর যাওয়াই মঙ্গল। কিন্তু মরণ-বাঁচনের মালিক যিনি, তাঁর ত সে খেয়াল নেই, থাকলে হয় ত সংসারে অনেক দুঃখ-কষ্টের হাত থেকেই মানুষ নিস্তার পেত।

অচলা এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। মৃণালের কথায় বোধ করি, তাহার স্বামীর মৃত্যুর কথাটাই মনে করিয়া কহিল, তার মানে যিনি অন্তর্যামী, তিনি জানেন, মানুষ শত দুঃখেও নিজের মৃত্যু চায় না।

মৃণালের মুখের উপর একটা গোপন বেদনার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। মাথা নাড়িয়া কহিল, না সেজদি, তা নয়। এমন সময় সত্যিই আসে, যখন মানুষে যথার্থই মরণ-কামনা করে। সে দিন অনেক রাত্রে হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙ্গে যেতে শাশুড়ীঠাকরুণকে বিছানায় পেলুম না। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি, ঠাকুরঘরের দরজাটা একটু খোলা। চুপি চুপি পাশে এসে দাঁড়ালুম। দেখি, তিনি গলায় কাপড় দিয়ে ঠাকুরের কাছে করযোড়ে মৃত্যু ভিক্ষে চাইচেন। বলছেন, ঠাকুর! যদি একটা দিনও কায়মনে তোমার সেবা ক'রে থাকি ত আজ আমার

লজ্জা নিবারণ কর। আমি মুক্তি চাই নে, স্বর্গ চাই নে, শুধু এই চাই ঠাকুর, তুমি আর আমাকে লজ্জা দিয়ো না—আমি এ মুখ আমার বৌমার কাছে বার করতে পারচি নে। বলিতে বলিতেই মৃণাল ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই প্রার্থনার মধ্যে মাতৃ-হৃদয়ের কত বড় সুগভীর বেদনা যে নিহিত ছিল, তাহা কাহারও অনুভব করিতে বিলম্ব হইল না। সুরেশের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কাহারও সামান্য দুঃখেই সে কাতর হইয়া পড়িত; আজ এই সন্তানহারা বৃদ্ধা জননীর মর্মান্তিক দুঃখের কাহিনীতে তাহার বুকের মধ্যে ঝড় বহিতে লাগিল। সে খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে মাটীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, যাও দিদি, তোমার বুড়ো শাশুড়ীর সেবা ক'রে কর্ত্তব্য কর গে, আমি আর তোমাকে আটকে রাখ্‌ব না! এই হতভাগ্য দেশের আজও যদি কিছু গৌরব করবার থাকে ত সে তোমার মত মেয়েমানুষ! এমন জিনিসটি বোধ করি, আর কোন দেশ দেখাতে পারে না! বলিয়া সে জিজ্ঞাসু-মুখে একবার অচলার প্রতি চাহিল। কিন্তু সে জানালার বাহিরে একখণ্ড ধূসর মেঘের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া ছিল বলিয়া তাহার কাছ হইতে কোন সাড়া আসিল না।

কিন্তু মৃণাল লজ্জা পাইয়া নিজের দিক হইতে আলোচনাটাকে অন্যপথে সরাইবার জন্য তাড়াতাড়ি জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, না, নেই বই কি! আপনি সব দেশের খবর জানেন কি না! আচ্ছা, সেজদার চেয়ে আপনি বড় না ছোট?

এই অদ্ভুত প্রশ্নে সুরেশ সহাস্যে কহিল, কেন বলুন ত?

মৃণাল বাধা দিয়া বলিল, না, আমাকে আর আপনি নয়। আমি দিদি হ'লেও যখন বয়সে ছোট, তখন—মেজদা? নদা?—বলুন, বলুন, শিগ্‌গির বলুন, কি?

অচলা আকাশ হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া এবার তাহার দিকে চাহিল। অনেক দিন পূর্ব্বে যে দিন এই মেয়েটি এমনি দ্রুত, এমনি অবলীলাক্রমে তাহার সহিত সেজদি সম্বন্ধ পাতাইয়া লইয়াছিল, সে কথা তাহার মনে পড়িল। কিন্তু মৃণালের চরিত্রের এই দিকটা সুরেশের জানা ছিল না বলিয়া সে এই আশ্চর্য্য রমণীর মুখের পানে তাকাইয়া সকৌতুক হাস্যে বলিল, নদা! নদা! তোমার সেজদার চেয়ে আমি প্রায় দেড় বছরের ছোট।

মৃণাল কহিল, তা হ'লে নদা, দয়া ক'রে একটি লোক ঠিক ক'রে দিন যে, আমাকে কাল সকালের গাড়ীতে রেখে আসবে।

যাইবার অনুমতি এইমাত্র সুরেশ নিজে দিলেও সে যে কাল সকালেই যাইতে উদ্যত হইবে, তাহা সে ভাবে নাই। তাই ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, আর দুটো দিনও কি থাকতে পারবে না দিদি? তোমার ওপর ভার দিয়ে আমরা মহিমের জন্যে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলুম। এমন অহর্নিশি সতর্ক, এমন গুছিয়ে সেবা করতে আমি হাসপাতালেও কখনো কাউকে দেখেছি ব'লে মনে হয় না। কি বল অচলা?

প্রত্যুত্তরে অচলা শুধু মাথা নাড়িল।

মৃণাল সুরেশের চিন্তিতভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিল, আপনি সে জন্যে একটুকুও ভাববেন না। যার জিনিস, তারই হাতে দিয়ে যাচ্ছি, নইলে আমিও হয় ত যেতে পারতুম না। আপনার ত মনে আছে, আমাদের কি রকম তাড়াতাড়ি চ'লে আসতে হয়েছিল। তাই কোন বন্দোবস্ত করেই আসা হয় নি। কাল আমাকে ছুটী দিন নদা, আবার যখনি হুকুম করবেন, তখনি চ'লে আসব।

সুরেশ আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া সহসা বলিয়া বসিল, আচ্ছা মৃণাল, সেই অজ পাড়াগাঁয়ে শুধু কেবল একটা বুড়ো শাশুড়ীর সেবা

ক'রে, আর পূজো আহ্নিক ক'রে তোমার সমস্ত সময়টা কাটবে কি ক'রে, আমি তাই শুধু ভাবি।

মৃণালের মুখের উপর পুনরায় ব্যথার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। কিন্তু সে হাসিয়া কহিল, সময় কাটাবার ভার ত আমার ওপর নেই নদা। যিনি সময় সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তার ব্যবস্থা করবেন।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা, সে যেন হ'লো। কিন্তু তোমার শাশুড়ী ত বেশি দিন বাঁচবেন না, আর মহিমকেও ডাক্তারের হুকুমমত ভাল হবে পশ্চিমের কোন একটা স্বাস্থ্যকর সহরে গিয়ে কিছুকাল বাস করতে হবে। তখন একলাটি সেখানে তুমি থাকবে কি ক'রে?

মৃণাল উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় একটু হাসিল। কহিল, সে উনিই জানেন।

অজ্ঞাতসারে সুরেশের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। মৃণাল কহিল, নদা বুঝি এ সব মানেন না?

কি সব?

এই যেমন ভগবান—

না।

তবে বুঝি আমাদের জন্যে ওটা আপনার অবজ্ঞার দীর্ঘনিশ্বাস বয়ে গেল নদা?

সুরেশ এ প্রশ্নে সহসা কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ বিমনার মত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না মৃণাল, তা নয়। একটা অজানা ভবিষ্যতের ভার তেম্‌নি অজানা একটা ঈশ্বরের ওপরে দিয়ে তারা যে বরঞ্চ আমাদের চেয়ে জিতের পথেই চলে, তা আমি অনেক দেখেচি। কিন্তু এ সব আলোচনা থাক্ দিদি, হয় ত আমার প্রতি তোমার একটা ঘৃণা জন্মে যাবে।

মৃণাল তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া সুরেশের দুই পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কহিল, আচ্ছা, থাক্।

সুরেশ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া কহিল, এটা আবার কি হ'লো মৃণাল?

কোন্‌টা দাদা?

কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এই পায়ের ধূলো নেওয়াটা?

মৃণাল কহিল, বড়ভাইয়ের পায়ের ধূলো নিতে কি আবার দিন-ক্ষণ দেখাতে হয় না কি? বলিয়া হাসিয়া উঠিয়া গেল।

আচ্ছা মেয়ে ত! বলিয়া সস্নেহ হাস্যে সুরেশ অচলার মুখের প্রতি চাহিতে গিয়া বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া গেল! তাহার সমস্ত মুখ শ্রাবণ-আকাশের মত ঘন মেঘে যেন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, এমনি বোধ হইল। কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাইয়া এ সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্নের আভাসমাত্র দিবার পূর্ব্বেই অচলা হতবুদ্ধি সুরেশকে আকাশ-পাতাল ভাবিবার অজস্র অবকাশ দিয়া ত্বরিতপদে মৃণালের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

সেইখানে স্তব্ধভাবে বসিয়া সুরেশ কেবলি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এ কিসে কি হইল? মৃণালের প্রণাম করার সঙ্গে ইহার কেমন করিয়া যেন একটা নিগূঢ় যোগ আছে, তাহা সে নিজের ভিতর হইতেই নিশ্চয় অনুমান করিতে লাগিল; কিন্তু এ যোগ কোথায়? কেন মৃণাল অকস্মাৎ তাহার পদধূলি মাথায় লইয়া চলিয়া গেল, এবং পলক না ফেলিতে কেনই বা অচলা ওরূপ বিবর্ণমুখে ঘর ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। নিজের ব্যবহার ও কথাবার্ত্তাগুলা সে আগাগোড়া বারংবার তন্ন তন্ন করিয়া স্মরণ করিয়াও কিন্তু কোন কূলকিনারা খুঁজিয়া পাইল না। অথচ পাশাপাশি এত বড় দুটা ঘটনাও কিছু শুধু শুধু ঘটে নাই, তাহাও সে বুঝিল। সুতরাং তাহারই কোন অজ্ঞাত নিন্দিত আচরণই যে এই অনর্থের মূল, এ সংশয় তাহার মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল।

কিন্তু মৃণালকেও এ সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন করা অসম্ভব। রাত্রিটা সে একরকম পাশ কাটাইয়া রহিল, এবং প্রভাতে এক সময়ে অচলাকে নিভৃতে পাইয়া কহিল, তোমাকে একটা কথার জবাব দিতে হবে।

অচলার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। প্রশ্নটা যে কি, সে তাহার অগোচর ছিল না। গত রাত্রির সেই তাহার অদ্ভুত আচরণের এই কৈফিয়ৎ দিতে হবে বুঝিয়া সে আরক্তমুখে মৃদুকণ্ঠে কহিল, কি কথা?

সুরেশ আস্তে আস্তে বলিল, কাল মৃণাল হঠাৎ আমার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে গেল, তুমিও মুখ ভার ক'রে রাগ ক'রে চ'লে গেলে, সে কি তার শাশুড়ীর মরণের কথা বলেছিলুম ব'লে?

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে অচলা একটা পথ দেখিতে পাইয়া মনে মনে খুসি হইয়া বলিল, এ রকম প্রসঙ্গ কি তোমার তোলা উচিত ছিল? সে বেচারার স্বামী নেই, শাশুড়ীর মৃত্যুতে তার নিঃসহায় অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ দিকি!

সুরেশ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, আমার ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি যে আর বেশি দিন বাঁচতে পারেন না, এ ত মৃণাল নিজেও বোঝে। তা ছাড়া সে নিঃসহায় হবেই বা কেন?

অচলা জবাব দিল, এ কথা আমরা ত তাকে একবারও বলি নি। বরঞ্চ তুমিই তাকে নানা রকমে ভয় দেখালে, দেশে একলাটি থাক্‌বে কেমন ক'রে!

সুরেশ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তা হ'লে সে যাবার পূর্ব্বে আমার কি তাকে সাহস দেওয়া উচিত নয়? তার যে কোন ভয় নেই, এ কথা কি তাকে—

বলিতে বলিতেই অকৃত্রিম করুণায় তাহার কণ্ঠ সজল হইয়া আসিল।

অচলা তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল। এই পরদুঃখকাতর সহৃদয় যুবকের সহস্র দয়ার কাহিনী তাহার চক্ষের নিমিষে মনে পড়িয়া

গেল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, তোমার সাহস দিতেও হবে না, ভয় দেখিয়েও কাজ নেই। যখন সে সময় আসবে, তখন আমি চুপ ক'রে থাকব না।

সুরেশ আত্মবিস্মৃত আবেগভরে অকস্মাৎ তাহার হাতখানা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া প্রচণ্ড একটা নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, এই ত তোমার যোগ্য কথা! এই ত তোমার কাছে আমি চাই অচলা! বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু অপরিসীম লজ্জায় হাত ছাড়িয়া দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

তাহার যে উচ্ছ্বাস মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে পরার্থতার নির্ম্মল আনন্দের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছিল, এই লজ্জিত পলায়নে তাহা এক নিমিষেই কদর্য্য কলুষিত হইয়া দেখা দিল। অচলার বুকের রক্ত বিদ্যুৎবেগে প্রবাহিত হইয়া বিন্দু বিন্দু ঘামে ললাট ভরিয়া উঠিল এবং সর্ব্বাঙ্গ বারংবার শিহরিয়া উঠিয়া নিকটবর্ত্তী একখানা চেয়ারের উপর সে নির্জ্জীবের মত বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণে তাহার সে ভাবটা কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু পীড়িত স্বামীর শয্যায় গিয়া নিজের আসনটি গ্রহণ করিতে আজ সমস্ত সকালটা তাহার কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল।

যাই যাই করিয়াও যাইতে মৃণালের দিন-দুই দেরি হইয়া গেল। মহিমের কাছে বিদায় লইতে গিয়া দেখিল, আজ সে পাশ ফিরিয়া অত্যন্ত অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যে বিদায় লইতে আসিয়াছিল, সে এই মিথ্যা নিদ্রার হেতু নিশ্চিত অনুমান করিয়াও চুপি চুপি কহিল, ওঁকে আর জাগিয়ে কাজ নেই সেজদি। কি বল?

প্রত্যুত্তরে অচলার ঠোঁটের কোণে শুধু একটুখানি বাঁকা হাসি দেখা দিল। মৃণাল মনে মনে বুঝিল, এ ছলনা সে ছাড়াও আরো একটি নারীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে মৃণাল অন্তরের মধ্যে যে গোপন ঈর্ষ্যার ভাব পোষণ করে, তাহা সে মহিমের কাছে কোনদিন আভাসমাত্র না পাইয়াও জানিত। এই একান্ত অমূলক দ্বেষ তাহাকে

কাঁটার মত বিঁধিত! কিন্তু তথাপি অচলা যে নিজের হীনতা দিয়া আজিকার দিনেও ওই পীড়িত লোকটির পবিত্র দুর্ব্বলতাটুকুকে বিকৃত করিয়া দেখিবে, তাহা সে ভাবে নাই। মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত তাহার মনটা জ্বালা করিয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া কানে কানে কহিল, তুমি ত সব জান সেজদি, আমার হ'য়ে ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ো। ব'লো, ভাল হ'য়ে আবার যখন দেশে ফিরবেন, বেঁচে থাকি ত দেখা হবে।

নিচে কেদারবাবু বসিয়া ছিলেন। মৃণাল প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল। এই অল্পকালের মধ্যেই সকলের মত তিনিও এই বিধবা মেয়েটিকে অতিশয় ভালবাসিয়াছিলেন। জামার হাতায় অশ্রু মুছিয়া কহিলেন, মা, তোমার কল্যাণেই মহিমকে আমরা যমের মুখ থেকে ফিরে পেয়েছি। যখনি ইচ্ছে হবে, যখনি একটু বেড়াবার সাধ হবে, তোমার এই বুড়ো ছেলেটিকে ভুলো না মা। আমার বাড়ি তোমার জন্যে রাত্রি-দিন খোলা থাকবে মৃণাল।

অচলা অদূরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; মৃণাল তাহাকে দেখাইয়া হাসিমুখে কহিল, যমের বাপের সাধ্যি কি বাবা, ওঁর কাছ থেকে সেজদাকে নিয়ে যায়! যে দিন সেজদির হাতে পৌঁছে দিয়েছি, সেই দিনই আমার কাজ চুকে গেছে।

কেদারবাবুর মুখের ভাব একটু গম্ভীর হইল, কিন্তু আর তিনি কিছু বলিলেন না।

দুইজন বৃদ্ধগোছের কর্ম্মচারী ও একজন দাসী মৃণালকে দেশে পৌঁছাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; তাহাদের সকলকে লইয়া ষ্টেশনের অভিমুখে ঘোড়ার গাড়ী ফটকের বাহির হইয়া গেলে, কেদারবাবুর অন্তরের ভিতর হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। ধীরে ধীরে শুধু বলিলেন, অদ্ভুত, অপূর্ব্ব মেয়ে!

সুরেশের মনটাও বোধ করি এই ভাবেই পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সে কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া সায় দিয়া আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল, আমি কখনো এমনটি আর দেখি নি কেদারবাবু! এমন মিষ্টি কথাও কখনো শুনি নি, এমন নিপুণ কাজকর্মও কখনো দেখি নি। যে কাজ দাও, এমন অপূর্ব্ব দক্ষতার সঙ্গে ক'রে দেবে যে, মনে হবে যেন এই নিয়েই সে চিরকালটা আছে! অথচ আশ্চর্য্য এই যে, কোন দিন গ্রামের বাইরে পর্য্যন্ত যায় নি।

কেদারবাবু ইহা সত্য বলিয়া জানিলেও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, বল কি সুরেশ!

সুরেশ কহিল, যথার্থ-ই তাই! ওর পানে চেয়ে চেয়ে আমার মাঝে মাঝে মনে হ'তো, এই যে জন্মান্তরের সংস্কার ব'লে একটা প্রবাদ আছে, কি জানি সত্যি না কি। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

পরকাল-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গে কেদারবাবু চিন্তাযুক্ত মুখে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, তা সে যাই হোক, এ কয়দিন দেখে দেখে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হয়েছে, এ মেয়ে স্ত্রীলোকের মধ্যে অমূল্য রত্ন। একে সারাজীবন এমন জীবন্মৃত ক'রে রাখা শুধু পাপ নয়, মহাপাপ। ও আমার মেয়ে হ'লে আমি কোনমতেই নিশ্চেষ্ট থাকতে পারতুম না।

সুরেশ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি করতেন?

বৃদ্ধ উদ্দীপ্তস্বরে বলিলেন, আমি আবার বিবাহ দিতুম। একটা বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওর ওই উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে যারা ওকে সন্ন্যাসিনী সাজিয়েছে, তারা ওর মিত্র নয়, ওর শত্রু। শত্রুর কার্য্যকে আমি কোনমতেই ন্যায়সঙ্গত ব'লে স্বীকার ক'রে নিতুম না।

একটু মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন, তা ছাড়া ওর স্বামীর ব্যবহারটাই একবার মনে ক'রে দেখ দিকি সুরেশ। সে লোকটার দু-দুটো স্ত্রী গত হ'তে পঞ্চাশ বছর বয়সে যখন এমন মেয়েকে বিবাহ

করতে রাজী হ'লো, তখন নিজের সুখ-সুবিধে ভিন্ন স্ত্রীর ভবিষ্যতের দিকে পায়ও কতটুকু দৃষ্টিপাত করেছিল, কল্পনা কর দেখি।

সুরেশকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, না সুরেশ, আমি বিধবা-বিবাহের ভালমন্দ তর্ক তুলচি নে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তোমার সমস্ত হিন্দুসমাজ চীৎকার ক'রে মলেও আমি মানবো না, এই ব্যবস্থাই ওই দুধের মেয়েটার পক্ষে চরম শ্রেয়ঃ। ওর এমন এতটুকু কিছু নেই, যার মুখ চেয়ে ও একটা দিন কাটাতে পারে। সমস্ত জীবনটা কি তোমরা খেলার জিনিস পেয়েছ, সুরেশ যে, ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মচর্য্য ক'রে চেঁচালেই সারা দুনিয়াটা ওর জন্যেই রাতারাতি বদলে ঋষির তপোবন হয়ে উঠবে! মেয়েটার শুধু কাপড়-চোপড়ের পানে চাইলে আমার বুক যেন ফেটে যেতে থাকে।

সুরেশ জবাব দিল না, মুখ তুলিয়াও চাহিল না; কিন্তু চোখের কোণে দেখিতে পাইল যে, চৌকাঠে ভর দিয়া অচলা এতক্ষণ পর্য্যন্ত মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াছিল—সেখানে আর সে নাই, কখন্ নিঃশব্দে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেছে।

মৃণাল চলিয়া গেলে, অচলা যখনই সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখে, তখনই তাহার মনে হয়, সে বিমনা হইয়া আছে, এবং কিসের শোক যেন তাহাকে নিরন্তর শুষ্ক করিয়া ফেলিতেছে।

দুইদিন পরে একদিন অপরাহ্ণে সুরেশ নিচের বারান্দার এক ধারে রৌদ্রের মধ্যে আরাম-কেদারাটা টানিয়া লইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল, পদশব্দে চাহিয়া দেখিল, তাহারই জন্য চা লইয়া অচলা নিজে আসিতেছে। এরূপ ঘটনা পূর্ব্বে কোনদিন ঘটে নাই; তাই সে আশ্চর্য্য হইয়া সোজা উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেয়ারা কৈ? আজ তুমি যে!

অচলা এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই একটা ছোট টিপার চেয়ারের পাশে

টানিয়া আনিয়া চায়ের বাটি নামাইয়া রাখিল এবং আর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া নিজেও বসিয়া পড়িল।

এই অভিনব আচরণে তাহাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে আর সুরেশের সাহস হইল না। শুধু চায়ের পেয়ালাটা নীরবে হাতে তুলিয়া লইল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া অচলা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সুরেশবাবু, আপনি কি বিধবা-বিবাহ কোন ক্ষেত্রেই ভাল ব'লে মনে করেন না?

সুরেশ চায়ের বাটি হইতে মুখ না তুলিয়াই জবাব দিল, করি। তার কারণ, কুসংস্কার আজও আমার অতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছয় নি।

অচলা চিন্তা করিবার নিজেকে আর মুহূর্ত্ত অবসর না দিয়া বলিল, তা হ'লে মৃণালের মত মেয়েকে বিবাহ করতে আপনার ত লেশমাত্র আপত্তি থাকা উচিত নয়।

সুরেশ চায়ের বাটিটা হাতে করিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া বলিল, এ কথার মানে?

অচলার মুখে বা কণ্ঠস্বরে কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না। বেশ সহজভাবে বলিল, আপনার কাছে আমি অসংখ্য ঋণে ঋণী। তা ছাড়া আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষিণী। আপনাকে আমি সুস্থ, সহজ সংসারী এবং স্বাভাবিক দেখতে চাই। একদিন আপনি বিবাহ করতে প্রস্তুত ছিলেন, আজ আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি স্বীকার করুন।

এক নিশ্বাসে মুখস্থর মত এতগুলা কথা বলিয়া অচলা যেন হাঁপাইতে লাগিল।

সুরেশ পাথরে-গড়া মূর্ত্তির মত অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, এতে তুমি কি সত্যই সুখী হবে?

অচলা কহিল, হাঁ।

সে রাজী হবে?

তাই ত আমার বিশ্বাস।

সুরেশ একটুখানি ম্লান হাসিয়া বলিল, আমার বিশ্বাস তা নয়। বইয়ে পড়েছ ত সহমরণের দিনে কোন কোন সতী হাস্‌তে হাস্‌তে পুড়ে মর্‌ত। মৃণাল তাদেরই জাত। এদের মুখের কথায় সম্মত করানো ত ঢের দূরের কথা, একটা একটা ক'রে হাত-পা কাটতে থাকলেও একে আর একবার বিয়ে করতে রাজী করানো যাবে না। এ অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা ক'রে মাঝ থেকে আমাকে তার কাছে মাটী ক'রে দিও না অচলা। আমাকে সে দাদা ব'লে ডেকেছে, তার কাছে আমি এই সম্মানটুকু বজায় রাখতে চাই।

দেখিতে দেখিতে অচলার সমস্ত মুখ ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল। সুরেশের কথা শেষ হইতেই কঠিন মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সংসারে শুধু মৃণালই একমাত্র সতী নয় সুরেশবাবু। এমন সতীও আছে, যারা মনে মনেও একবার কাউকে স্বামিত্বে বরণ করলে, সহস্র কোটি প্রলোভনেও আর তাদের নড়ানো যায় না। এঁদের কথা আপনি ছাপার বইয়ে পড়তে না পেলেও সত্যি ব'লে জেনে রাখবেন সুরেশবাবু! বলিয়া স্তম্ভিত, অভিভূত সুরেশের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়াই এই গর্ব্বিতা রমণী দৃঢ়-পদক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

একজনের উচ্ছ্বসিত অকপট প্রশংসার মধ্যে যে আর একজনের কত বড় সুকঠোর আঘাত ও অপমান লুকাইয়া থাকিতে পারে, বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের কেহই বোধ করি, তাহা মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বেও জানিত না। সুরেশ হাতের বাটি হাতে লইয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল, এবং অচলা তাহার ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া

মর্ম্মান্তিক ক্রন্দনের দুর্নিবার বেগ রোধ করিতে লাগিল ; পাশেই মহিমের ঘর, পাছে বিন্দুমাত্র শব্দও তাহার কানে গিয়া পৌছে ! বস্তুতঃ অন্তর্যামী ভিন্ন সে কান্নার ইতিহাস আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জানিল না।

কিন্তু সে নিজে এই গভীর দুঃখের মধ্যে এক নূতন তত্ত্ব লাভ করিল। এই নারী জীবনের সতীত্ব যে কত বড় সম্পদ, এতদিন পরে তাহার পরিপূর্ণ মহিমা আজই প্রথম যেন তাহার চোখের সম্মুখে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হইয়া দেখা দিল। সে দিন সুরেশের সংস্পর্শে পিতার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিকে সে অন্যায় উপদ্রব মনে করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত হইয়াছিল, কিন্তু আজ অকস্মাৎ সেই ধর্ম্মহীন পরস্ত্রীলুব্ধ সুরেশকেই যখন সতীত্বের পাদপদ্মে অমন করিয়া মাথা পাতিয়া প্রণাম করিতে দেখিল, তখন নিজের সত্যকার স্থানটাও আর তাহার দৃষ্টির অগোচর রহিল না।

আরও একটা জিনিস। সুস্পষ্ট বাক্যের শক্তি যে কত বৃহৎ, আজ এ সত্যও সে প্রথম উপলব্ধি করিল। সে শিক্ষিতা রমণী। স্বামীর প্রতি কায়মন-নিষ্ঠাই যে সতীত্ব, এ কথা তাহার অবিদিত ছিল না। শুধু দেহ বা শুধু মন কোনটাই যে একাকী সম্পূর্ণ নয়, ইহা সে ভাল করিয়াই জানিত। তথাপি মন যখন তাহার বিচলিত হইয়াছে, স্বামীকে ভালবাসে না, জিহ্বা যখন এ কথা উচ্চস্বরে ঘোষণা করিতেও সঙ্কোচ মানে নাই, তখনও কিন্তু কোনদিন তাহার আপনাকে ছোট বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু আজ যখন সুরেশের মুখের সুস্পষ্ট বাণী না জানিয়া তাহার নামের সঙ্গে অসতী শব্দটা যোগ করিয়া দিতে চাহিল, তখনই তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন এক বুক-ফাটা বেদনার আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাই বলিয়া মৃণালের প্রতি যে তাহার শ্রদ্ধা বাড়িল, তাহা নহে ; কিন্তু এই মেয়েটির প্রসঙ্গে যে চৈতন্য আজ লাভ করিল, ইহা সে জীবনে

কখনও বিস্মৃত হইবে না, ইহা আপনার কাছে আপনি বার বার প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল।

বাহিরে পিতার লাঠির আওয়াজ এবং পিছনে সুরেশের পদশব্দ সে শুনিতে পাইল। বুঝিল তাঁহারা মহিমকে দেখিতে চলিয়াছেন, এবং অল্পকাল পরেই পিতার কণ্ঠস্বরে তাহার আহ্বান শুনিয়া সে বেশ করিয়া আঁচলে চোখ-মুখ মুছিয়া দ্বার খুলিয়া ও-ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

কেদারবাবু তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, আজ ব্যাপার কি? দুটোর সময় সুরুয়া দেবার কথা, চারটে বাজে যে! ও কি, চোখ-মুখ অমন ভারী কেন? ঘুমুচ্ছিলে না কি?

অচলা উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রোগীকে সুরুয়া দিবার ব্যবস্থা হইবার পরে এই কাজটা মৃণালই করিত। চাকর চড়াইয়া দিত, সে আন্দাজ করিয়া যথাসময়ে নামাইয়া লইত। সে চলিয়া গেলে এ ভারটা অচলার উপরেই পড়িয়াছিল। আজ সে কথা তাহার মনেই ছিল না। ছুটিয়া গিয়া দেখিল, আগুন বহুক্ষণ নিবিয়া গিয়াছে এবং সমস্তটা শুকাইয়া পুড়িয়া রহিয়াছে।

বহুক্ষণ সেইখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন কেদারবাবু এ কথা শুনিয়া অচলাকে কিছুই না বলিয়া শুধু সুরেশকে লক্ষ্য করিয়া কঠিনভাবে বলিলেন, তখনি ত তোমাকে বলেছিলুম সুরেশ, এখন একজন ভাল নার্স না রাখলে মহিমকে বাঁচাতে পারবে না। নিজের মেয়েকে কি আমার চেয়ে তোমরা বেশি বোঝো?

সুরেশ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। কিন্তু মহিম যে এতক্ষণ নিঃশব্দে স্ত্রীর লজ্জিত ম্লান মুখখানির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল, তাহা কেহই দেখে নাই। সে এখন ধীরে ধীরে কহিল, নার্সের হাতে আমার ওষুধ পর্যান্ত খেতে প্রবৃত্তি হবে না সুরেশ। তবে ওঁকে সাহায্য করবার একজন লোক দাও। কাল-পরশু দুটো রাত্রিই ওঁকে সারা রাত্রি জাগতে

D.C. – Memari. Dist– (Burdwan).

হয়েছে। দিনের-বেলায় একটু বিশ্রামের অবকাশ না পেলে, কলের মানুষকে দিয়েও কাজ পাবে না ভাই।

কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য না হইলেও মিথ্যা নয়। সুরেশ খুসী হইয়া মুখ তুলিল, কিন্তু কেদারবাবু নিজের রূঢ়বাক্যে লজ্জা পাইয়া কোমল কিছু একটা বলিবার উদ্যোগ করিতেই অচলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে তাহার অনেকবার ইচ্ছা করিতে লাগিল, রুগ্ন স্বামীর কাছে বহু অপরাধের জন্য কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া একবার জিজ্ঞাসা করে, তাহার মত পাপিষ্ঠাকে তিরস্কার হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহার কি মাথাব্যথা পড়িয়াছিল! কিন্তু নিদারুণ লজ্জায় কোনমতেই এ প্রশ্ন তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না।

সুরেশের একটা কাজ ছিল, প্রতিদিন অনেক রাত্রে সে একবার করিয়া মহিমের ঘরে ঢুকিয়া প্রয়োজনীয় সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া তবে শুইতে যাইত। মৃণাল থাকিতে সে প্রায় সারারাত্রিই আনাগোনা করিত, এবং তাহার আবশ্যকও ছিল; কিন্তু কয়দিন হইতে দেখা গেল, সে সহজে আর ঘরে প্রবেশ করে না। প্রয়োজন হইলে দাসী পাঠাইয়া খবর লয়, শুধু সন্ধ্যার প্রাক্কালে ক্ষণকালের জন্য একটিবারমাত্র নিজে আসিয়া সংবাদ গ্রহণ করে। তাহার এই নূতন আচরণ সকলের অগ্রে অচলারই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; কিন্তু এ বিষয়ে সামান্য একটু মন্তব্য প্রকাশ করাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে, তাই সে মৌন হইয়াই ছিল; কিন্তু যেদিন মহিম নিজে ইহার উল্লেখ করিল, তখন তাহাকে বলিতেই হইল, আজকাল তিনি অধিকাংশ সময় বাটীতেও থাকেন না এবং ইহার হেতু কি, তাহাও সে জানে না। মহিম চুপ করিয়া শুনিল, কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করিল না।

পরদিন সকালে অচলা নিচে নামিতেছিল, এবং সুরেশও কি একটা

কাজে এই সিঁড়ি দিয়াই উপরে উঠিতেছিল ; মুখ তুলিয়া অচলাকে দেখিবামাত্রই অন্য দিকে সরিয়া গেল। সে যে সর্ব্বপ্রকারে তাহাকেই পরিহার করিয়া চলিতেছে, এ বিষয়ে আর তাহার সংশয়মাত্র রহিল না ; এবং একদিন যাহা সে সমস্ত মন দিয়া কামনা করিয়াছিল, আজ তাহার সেই মনই সুরেশের আচরণে বেদনায় পীড়িত হইয়া উঠিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

অচলার সমস্ত কাজকর্ম্ম, সমস্ত ওঠা-বসার মধ্যেও নিভৃত হৃদয়তলে যে কথাটা অনুক্ষণ জ্বালা করিতেই লাগিল, তাহা এই যে, সুরেশের মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন কাজ করিতেছে, যাহার সহিত তাহার নিজের কোন সম্বন্ধ নাই। যে উদ্দাম ভালবাসা একদিন তাহারই মধ্যে জন্মলাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, সে আজ জীর্ণ আশ্রয়ের ন্যায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাত্রা করিয়াছে। আপনাকে আপনি সে সহস্র তিরস্কার, সহস্র কটূক্তি করিয়া লাঞ্ছনা করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি এই বিদায়ের বেদনাকে আজ সে কোনক্রমেই মন হইতে দূরে সরাইতে পারিল না। এমন কি, মাঝে মাঝে বিকট ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত করিয়া এ সংশয় উঁকি মারিতে লাগিল, নিজের অজ্ঞাতসারে সেও সুরেশকে গোপনে ভালবাসিয়াছে কি না। প্রতিবারেই এ আশঙ্কাকে সে অসঙ্গত, অমূলক বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিল ; আপনাকে আপনি বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, এ অসম্ভব সম্ভব হইবার পূর্ব্বে সে গলায় দড়ি দিয়া মরিবে ; তথাপি ছায়ার মত এ কথা যেন তাহার মনের পিছনে লাগিয়াই রহিল, ঘুরিতে-ফিরিতেই যেন সে ইহাকে চোখে দেখিতে লাগিল এবং বোধ করি বা, এই বিভীষিকা হইতে আত্মরক্ষা করিতে সে স্নানাহারের সময়টুকু ব্যতীত দিবারাত্রির এতটুকু-কাল স্বামীর কাছ-ছাড়া হইতে সাহস করিল না। পাশের যে ঘরটা

তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, কয়দিনের মধ্যে সে ঘরে প্রবেশ করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না; এমন করিয়াও কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

মহিম প্রায় আরোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। শীঘ্রই জব্বলপুরে চেঞ্জে যাইবার কথাবার্ত্তা চলিতেছে। সে দিন সকাল-বেলা অচলা মেঝের উপর বসিয়া একটি ষ্টোভে স্বামীর জন্য দুধ গরম করিতেছিল, দুধ মুহুর্মুহুঃ উথলিয়া উঠিতেছে, কোন দিকে চাহিবার তাহার এতটুকু অবসর নাই, মহিম এতক্ষণ যে একদৃষ্টে তাহারই প্রতি চাহিয়া ছিল, ইহা সে জানিত না—হঠাৎ স্বামীর দীর্ঘশ্বাস কানে যাইতেই সে মুখ তুলিয়া একটিবারমাত্র চাহিয়াই পুনরায় নিজের কাজে মন দিল।

মহিম কোন দিন বেশি কথা কহে না; কিন্তু আজ সহসা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, বাস্তবিক অচলা, বড় দুঃখ ছাড়া কোন দিন কোন বড় জিনিস লাভ করা যায় না। আমার বাড়িও আবার হবে, রোগও একদিন সারবে; কিন্তু এর থেকেও যে অমূল্য বস্তুটি লাভ করলুম, সে তুমি। আজকাল আমার মনে হয়, তুমি ছাড়া আর বোধ হয়, আমার একটা দিনও কাটবে না।

অচলা নিঃশব্দে গরম দুধ বাটিতে ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিতে লাগিল, কোন উত্তর করিল না। মহিম একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিল, মৃণাল, সুরেশ এরা আমার সেবা কিছু কম করে নি, কিন্তু কি জানি, যখনি জ্ঞান হ'তো তখনই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতুম। কেবলি মনে হ'তো, হয় ত এদের কত কষ্ট, কত অসুবিধে হচ্ছে—এদের দয়ার ঋণ আমি কেমন ক'রে এ জীবনে শোধ দেব। কিন্তু ভগবানের হাতে-বাঁধা এমনি সম্বন্ধ যে, তোমার বিষয়ে কখনো মনে হয় না, এই সেবার দেনা একদিন আমাকে শুধতেই হবে? আমাকে বাঁচিয়ে তোলা যেন তোমার নিজেরই গরজ। বলিয়া মহিম একটুখানি হাসিল।

অচলা ঘাড় হেঁট করিয়া দুধ নাড়িতেই লাগিল, কোন কথা কহিল না।

মহিম বলিল, আর কত ঠাণ্ডা করবে, দাও?

তবুও অচলা জবাব দিল না, তেমনি অধোমুখেই বসিয়া রহিল। প্রথমটা মহিম একটুখানি বিস্মিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিল, স্বামীর কাছে অচলা চোখের জল গোপন করিবার জন্যই অমন করিয়া একভাবে অধোমুখে বসিয়া আছে।

কেন যে সুরেশ বড়-একটা আসে না, তাহার হেতু নিশ্চয় করিয়া মহিম না বুঝিলেও কতকটা অনুমান করে নাই, তাহা নহে। ইহাতে ক্ষোভ-মিশ্রিত একটা আনন্দের ভাবই তাহার মনের মধ্যে ছিল। কারণ অচলা যে সতর্ক হইয়াছে, নির্জনে অকস্মাৎ দেখা হইতে পারে, এই ভয়েই সে যে ঘর ছাড়িয়া সহজে অন্যত্র যাইতে চাহে না, ইহা সে মনে মনে অনুভব করিল। আজ তাই সারাদিন ধরিয়া মন যেন তাহার বসন্ত-বাতাসে উড়িয়া বেড়াইয়া কাটাইল। তাহার শয্যার কিছু দূরে একটা চৌকি ছিল। সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহার উপরে বসিয়া অচলা কি একখানা বই পড়িতেছিল, এবং ক্লান্তিবশতঃ, সেইখানেই অবশিষ্ট রাতটুকু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পরদিন সকালে মহিমের ডাকে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল, এবং জানালা দিয়া দেখিল, বেলা হইয়া গিয়াছে।

মহিম কি একটা কাজ বলিতে গিয়া সহসা চুপ করিয়া গেল, এবং স্ত্রীর আপাদ-মস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নিজের গায়ের কাপড় কি হ'লো?

অচলা ততোধিক বিস্ময়ে নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, এই-মাত্র ঘুম ভাঙিয়া যেখানা সে তাড়াতাড়ি নিজের গায়ে জড়াইয়া লইয়া উঠিয়া আসিয়াছে, সেখানা সুরেশের। স্বামীর প্রশ্নটা তাহাকে যেন চাবুক মারিল। লজ্জায়, ব্যথায় তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু এ যে কি করিয়া ঘটিল, তাহা কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। তাহার স্মরণ হইল,

গত রাত্রে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে সে নিজের শালখানা পাট করিয়া তাঁহার পায়ের উপর চাপা দিয়া অঞ্চলমাত্র গায়ে দিয়া পড়িতে বসিয়াছিল। ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে তাহার অত্যন্ত শীত করিতেছিল মনে পড়ে, তাহার পরে জাগিয়া উঠিয়া ইহাই দেখিতেছে।

কিন্তু স্ত্রীর একান্ত লজ্জিত ম্লান মুখের পানে চাহিয়া মহিম সস্নেহে সকৌতুকে হাসিল। কহিল, এতে লজ্জা কি অচলা? চাকরটাই হয় ত উল্টো-পাল্টা ক'রে তোমারটা তার ঘরে দিয়ে তারটা এখানে রেখে গিয়াছে। না হয় সুরেশ নিজেই হয় ত কাল বিকাল-বেলা ফেলে গিয়াছে, রাত্রে চিন্‌তে না পেরে তুমি গায়ে দিয়েচ। বেয়ারাকে ডেকে বদলে আন্‌তে ব'লে দাও।

দিই, বলিয়া সেখানা হাতে করিয়া অচলা বাহির হইয়া আসিল এবং পাশের ঘরে ঢুকিয়া যখন অবসন্নের মত বসিয়া পড়িল, তখন বুঝিতে কিছুই আর তাহার অবশিষ্ট ছিল না। অনেক রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে সুরেশ যে নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং শীতের মধ্যে তাহাকে ও-ভাবে নিদ্রিত দেখিয়া আপনার গাত্রবাসখানি দিয়া ঘুমন্ত তাহাকে সস্নেহে সযত্নে আচ্ছাদিত করিয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছিল, ইহাতে তাহার আর লেশমাত্র সংশয় রহিল না। সে চোখ বুজিয়া সেই আনত সতৃষ্ণ দৃষ্টি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, শুধু তাহাকেই দেখিবার জন্য এবং ভাল করিয়াই দেখিবার জন্য, যে অমন করিয়া আসিয়াছে, এবং হয় ত প্রতি-রাত্রেই আসিয়া থাকে, কেহ জানিতেও পারে না।

এই কদাচারে তাহার লজ্জার পরিসীমা রহিল না; এবং ইহাকে সে কুৎসিত বলিয়া, গর্হিত বলিয়া, অভদ্র বলিয়া, সহস্র প্রকারে অপমানিত করিতে লাগিল এবং অতিথির প্রতি গৃহস্বামীর এই চৌর্য্যবৃত্তিকে সে কোন দিন ক্ষমা করিবে না বলিয়া নিজের কাছে বারংবার প্রতিজ্ঞা

করিল; কিন্তু তথাপি তাহার সমস্ত মনটা যে এই অভিযোগে কোন-মতেই সায় দিতেছে না, ইহাও তাহার অগোচর রহিল না, এবং কোথায় কিসে যে তাহাকে এতদিন উঠিতে বসিতে বিঁধিতেছিল, তাহাও যেন একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল!

কেদারবাবুর এক বাল্যবন্ধু জব্বলপুর সহরে বাস করেন; তাঁহার নিকট হইতে উত্তর আসিল, জল-বায়ু ও প্রাকৃতিক দৃশ্যে এ স্থান অতি উৎকৃষ্ট। তাঁহার নিজের বাসাও খুব বড়; অতএব মহিমের যদি আসাই হয়, ত, সে স্বচ্ছন্দে তাঁহার কাছেই থাকিতে পারে।

একদিন সকালে কেদারবাবু আসিয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন; এবং মাঘমাস যখন শেষ হইয়াই আসিতেছে এবং পথে অল্প-স্বল্প ক্লেশও যখন সহ্য করিতে মহিম সমর্থ, তখন আর কাল-বিলম্ব না করিয়া তাহার যাত্রা করাই কর্ত্তব্য। যুবা-বয়সে তিনি নিজে একবার জব্বলপুরে গিয়াছিলেন, সেই স্মৃতি তাঁহার মনে ছিল, মহা উল্লাসে সেই সকল বর্ণনা করিয়া কহিলেন, জগদীশের স্ত্রী এখনো জীবিত আছেন, তিনি মায়ের মত মহিমকে যত্ন করিবেন, এবং চাই কি, এই উপলক্ষে তাঁহারও আর একবার দেশটা দেখা হইয়া যাইবে। মহিম চুপ করিয়া এই সকল শুনিল, কিন্তু কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করিল না। এই আগ্রহ-হীনতা শুধু অচলাই লক্ষ্য করিল। পিতা প্রস্থান করিলে, সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কেন জব্বলপুর ত বেশ জায়গা, তোমার যেতে কি ইচ্ছে নেই?

মহিম কহিল, তোমরা সকলে আমাকে যতটা সুস্থ সবল ভাবচ, ততটা এখনো আমি হই নি। কোন দিন হব কি না, তার আমি আশা করি নে।

অচলা বলিল, সেই জন্যই ত ডাক্তার তোমার চেঞ্জের ব্যবস্থা করেছেন। একবার ঘুরে এলেই সমস্ত সেরে যাবে।

মহিম ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। পরে কহিল, কি জানি। কিন্তু এ অবস্থায় আমার নিজের বা পরের উপর নির্ভর ক'রে স্বর্গে যেতেও ভরসা হয় না! অচলা, ভেতরে ভেতরে আমি বড় দুর্ব্বল, বড় অসুস্থ। তুমি কাছে না থাক্‌লে হয় ত আমি বেশি দিন বাঁচবো না। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর যেন সজল হইয়া উঠিল।

সে মুখ ফুটিয়া কখনো কিছু চাহে না, কখনো নিজের দুঃখ অভাব-ব্যক্ত করে না, তাহারই মুখের এই আকুল ভিক্ষা ঠিক যেন শূলের মত আঘাত করিয়া অচলার হৃদয়ে যত স্নেহ, যত করুণা, যত মাধুর্য্য এতদিন রুদ্ধ হইয়াছিল, সমস্ত একসঙ্গে এক মুহূর্ত্তে মুখ খুলিয়া দিল। সে নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া পাছে অসম্ভব কিছু একটা করিয়া বসে, এই ভয়ে চক্ষের জল চাপিতে চাপিতে একেবারে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। মহিম হতবুদ্ধির মত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্ময়ে ব্যথায় সে উন্মুক্ত দ্বারের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আবার ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

আবার যখন উভয়ে সাক্ষাৎ হইল তখন স্বামি-স্ত্রীর কেহই এ-সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না। পরদিন অচলা একখানা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আসিয়া হাসিমুখে কহিল, জগদীশবাবু টেলিগ্রামের জবাব দিয়েছেন, তাঁর বাসার কাছে আমাদের জন্যে তিনি একটা ছোট বাড়ি ঠিক করেছেন।

মহিম কথাটা ঠিক্ বুঝিতে না পারিয়া বলিল, তার মানে?

অচলা কহিল, বাবার বন্ধু ব'লে তোমাকেই না হয় তিনি বাড়িতে জায়গা দিতে পারেন। কিন্তু দুজনে গিয়ে ত তাঁর কাঁধে ভর করা যায় না! তাই কালই একটা বাসা ঠিক করবার জন্যে টেলিগ্রাম কর্‌তে বাবাকে চিঠি লিখে দিই। এই তার জবাব। বলিয়া সে হলদে খামখানা স্বামীর বিছানার উপর ছুড়িয়া দিল।

মহিম হাতে লইয়া সেখানা আগাগোড়া পড়িয়া শুধু বলিল, আচ্ছা অচলা যে স্বেচ্ছায় সঙ্গে যাইতে চাহে, ইহা সে বুঝিল। কিন্তু কন্যকার আচরণ, যাহা আজিও তাহার কাছে তেমনি দুর্বোধ্য, তেমনি দুর্জ্ঞেয়, তাহাই স্মরণ করিয়া কোনরূপ অযথা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

কিন্তু অচলার তরফ হইতে যাত্রার উদ্যোগ পুরা মাত্রায় চলিতে লাগিল। সেদিন দুপুর-বেলা সে এ বাটীতে আসিয়া তাহার জিনিস-পত্র গুছাইতেছিল, কেদারবাবু দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তোমার না গেলেই কি নয় মা?

অচলা চমকিয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাবা?

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দিক দিয়া তাহার সঙ্গে থাকাটা যে ঠিক সঙ্গত নয় পিতা হইয়া কন্যাকে এ কথা জানাইতে কেদারবাবু লজ্জা বোধ করিলেন। তাই তিনি মহিমের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, বেশি দিন ত নয়। তা ছাড়া, জগদীশের ওখানে তার কোন অসুবিধেই হ'তো না। এই অল্পকালের জন্যে বেশি কতকগুলো খরচপত্র করে—

আসল কথাটা অচলা বুঝিল না। সে পিতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিল, তিনি বল্‌ছিলেন বুঝি?

না না, মহিম কিছু বলেন নি, শুধু আমি ভাবছি—

তুমি কিছু ভেবো না বাবা, সে আমি সমস্ত ঠিক ক'রে নেবো, বলিয়া অচলা পুনরায় তাহার কাজের মধ্যে মনোনিবেশ করিল এবং পরদিনই লুকাইয়া তাহার দুখানা গহনা বিক্রী করিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিল।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি যাত্রার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু সুরেশের পিসিমা পুরোহিত ডাকাইয়া পাঁজি দেখাইয়া মাসের প্রথম সপ্তাহেই দিন-স্থির করিয়া দিলেন। সেই মতই সকলকে মানিয়া লইতে হইল।

যাইবার দিন-দুই পূর্ব্বে হইতেই অচলার সারা প্রাণটা যেন হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছুদিনের নিমিত্ত স্বামিগৃহবাস ব্যতীত তাহাকে জীবনে কখনো অন্যত্র যাইতে হয় নাই, আজিও সে পশ্চিমের মুখ দেখে নাই। সেখানে কত প্রাচীন কীর্ত্তি, কত বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, কত নদ-নদী, জলপ্রপাত, এমন কত কি আছে, যাহার গল্প লোকের মুখে শুনা ভিন্ন নিজে দেখিবার কল্পনা কোন দিন তাহার মনে স্থান পায় নাই। এইবার সেই সকল আশ্চর্য্য সে স্বচক্ষে দেখিতে চলিয়াছে। তাহা ছাড়া সেখানে তাহার স্বামী ভগ্ন-দেহ ফিরিয়া পাইবে, একাকী সে-ই সেখানে ঘরণী, গৃহিণী, সর্ব্বকার্য্যে স্বামীর সাহায্যকারিণী। সেখানে জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর, সেখানে জীবন-যাত্রার পথ সহজ ও সুগম, তিনি ভাল হইলে হয় ত একদিন তাহারা সেইখানেই তাহাদের ঘর-সংসার পাতিয়া বসিবে এবং অচির-ভবিষ্যতে যে সকল অপরিচিত অতিথিরা একে একে আসিয়া তাহাদের গৃহস্থালী পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে, তাহাদের কচি মুখগুলি নিতান্ত পরিচিতের মতই সে যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। এম্‌নি কত কি যে সুখের স্বপ্ন দিবানিশি তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তার ইয়ত্তা নাই। আর সকল কথার মধ্যে স্বামী যে তাহাকে ছাড়িয়া আর স্বর্গে যাইতেও ভরসা করেন না, এই কথাটা মিশিয়া যেন তাহার সমস্ত চিন্তাকেই একেবারে মধুময় করিয়া তুলিল। আর তাহার কাহারও বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ, কোন নালিশ রহিল না —অন্তরের সমস্ত গ্লানি ধুইয়া-মুছিয়া গিয়া হৃদয় গঙ্গাজলের মত নির্ম্মল ও পবিত্র হইয়া উঠিল। আজ তাহার বড় সাধ হইতে লাগিল, যাইবামাত্র আগে একবার মৃণালকে দেখে এবং সমস্ত বুক দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া জানা, অজানা সকল অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা মাগিয়া লয়। আজ সুরেশের জন্যও তাহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। সে যে পরম

বন্ধু হইয়াও লজ্জায় সঙ্কোচে তাহাদের দেখা দিতে পারে না, তাহার এই দুর্ভাগ্যের গোপন বেদনাটি সে আজ যেমন অনুভব করিল, এমন বোধ করি কোন দিন করে নাই। তাঁহারও কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা চাহিয়া বিদায় লইবার আছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া জানিল, তিনি কাল হইতেই গৃহে নাই।

যাইবার দিন সকাল হইতেই আকাশে মেঘ করিয়া টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। জিনিস-পত্র বাঁধা-ছাঁদা হইয়াছে, কিছু কিছু ষ্টেশনেও পাঠানো হইয়াছে, টিকিট পর্য্যন্ত কেনা হইয়া গিয়াছে। অচলার জন্যও সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট কেনার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু সে ঘোরতর আপত্তি তুলিয়া মহিমকে বলিয়াছিল, টাকা মিথ্যে নষ্ট করবার সাধ থাকে ত কিনতে দাও গে। আমি সুস্থ, সবল, তা ছাড়া কত বড় লোকের মেয়েরা ইন্‌টারক্লাসের মেয়েগাড়ীতে যাচ্চে, আর আমি পারিনে? আমি দেড়াভাড়ার বেশি কোনমতেই যাবো না।

সুতরাং সেইরূপ ব্যবস্থাই হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ দুটা দিন সুরেশের দেখা নাই। কিন্তু আজ সকালে দুর্য্যোগের জন্যই হোক, বা অপর কোন কারণেই হোক, সে তাহার পড়িবার ঘরে ছিল। এই আনন্দহীন কক্ষের মধ্যে অচলা ঠিক যেন একটা বসন্তের দমকা বাতাসের মত গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কণ্ঠস্বরে আনন্দের আতিশয্য উপ্‌চাইয়া পড়িতেছিল; বলিল, সুরেশবাবু, এ-জন্মে আমাদের আর মুখ দেখবেন না, না কি? এত বড় অপরাধটা কি করেছি, বলুন ত?

সুরেশ চিঠি লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহাদের বাড়ি পুড়িয়া গেলে আশে-পাশের গাছগুলার যে চেহারা অচলা আসিবার দিন চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিল, সুরেশের এই মুখখানা এম্‌নি করিয়াই তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিল যে, সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

বসন্তের হাওয়া ফিরিয়া গেল—সে কি বলিতে আসিয়াছিল, সব ভুলিয়া কাছে আসিয়া উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি অসুখ করেছে সুরেশবাবু? কৈ, আমাকে ত এ-কথা বল নি!

শুধু পলকের নিমিত্তই সুরেশ মুখ তুলিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ নত করিয়া কহিল, না, আমার কোন অসুখ করে নি, আমি ভালই আছি; বলিয়া সে বইখানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে পুনরায় কহিল, আজই ত তোমরা যাবে—সমস্ত ঠিক হয়েছে? কত কাল হয় ত আর দেখা হবে না।

কিন্তু মিনিট-খানেক পর্য্যন্ত অপর পক্ষ হইতে কোন উত্তর না পাইয়া সুরেশ বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া চাহিল। অচলার দুই চক্ষু জলে ভাসিতেছিল, চোখো-চোখি হইবামাত্রই বড় অশ্রুর ফোঁটা টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

সুরেশের ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত উন্মত্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে তাহার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া, আপনাকে সংযত করিয়া দৃষ্টি অবনত করিল।

অচলা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া গাঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, তোমার কথ্‌খনো শরীর ভাল নেই সুরেশবাবু, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।

সুরেশ মাথা নাড়িয়া শুধু বলিল, না।

না, কেন? তোমার জন্যে—কথাটা শেষ হইতে পাইল না। দ্বারের বাহির হইতে বেহারা ডাকিয়া কহিল, বাবু, আপনার চা—, বলিতে বলিতে সে পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং পরক্ষণেই অচলা অন্য-দিকে মুখ ফিরাইয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে সে তাহার স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিলে, মহিম জিজ্ঞাসা করিল, সুরেশ ক'দিন থেকে কোথায় গেছে, জানো? পিসিমাকেও কিছু ব'লে যায় নি; সে কি আজ আমার সঙ্গে দেখা করবে না, না কি?

অচলা আস্তে আস্তে কহিল, আজ ত তিনি বাড়িতেই আছেন।

মহিম কহিল, না! এইমাত্র আমাকে ঝি ব'লে গেল, সে সকালেই কোথায় বেরিয়ে গেছে।

অচলা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল পূর্ব্বেই যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, সে যে অতিশয় অসুস্থ, সে যে ছেলে-বেলার মত এবারও তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছে—শুধু কেবল এইটুকু কৃতজ্ঞতার জন্যও একবার তাহাকে আমাদের ওখানে আহ্বান করা উচিত—আর তাহাকে ভয় নাই—লজ্জিতাকে সংশয়ের চক্ষে দেখিয়া আর লজ্জা দিয়ো না—তাহার অন্তরের এই সকলের একটা কথাও জিহ্বা আজ উচ্চারণ করিতে পারিল না। সে স্বামীর মুখের প্রতি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে পর্য্যন্ত পারিল না; নিঃশব্দে নিরুত্তরে হাতের কাছে যে কোন একটা কাজের মধ্যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া দিল।

ক্রমশঃ ষ্টেশনে যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠিল। নিচে কেদার-বাবুর হাঁক-ডাক শোনা গেল এবং পিসিমা পূর্ণ-ঘট প্রভৃতি লইয়া ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চাকরেরা জিনিষ-পত্র গাড়ীর মাথায় তুলিয়া দিল, শুধু যিনি গৃহস্বামী, তাঁহারই কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। অথচ, এই লইয়া প্রকাশ্যে কেহ আলোচনা করিতেও সাহস করিল না—ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে এম্নিই যেন সকলকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কেদারবাবু কন্যাকে একটু নিরালায় পাইয়া মাথায় হাত দিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, সতীলক্ষ্মী হও মা, মায়ের মত হও। বুড়ো বয়সে না বুঝে অনেক মন্দ কথা বলেচি মা, রাগ করিস্ নে; বলিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন।

মহিম গাড়ীতে উঠিতে গিয়া অচলাকে একান্তে ক্ষুণ্ণস্বরে চুপি চুপি কহিল, সে সত্যিই আমাদের সঙ্গে দেখা কর্‌লে না। একটা কথা তাকে বল্‌বার জন্যে আমি দু'দিন পথ চেয়ে ছিলাম।

পিতার বাক্যে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, সে কেবল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

দ্বারের অন্তরালে পিসিমা দাঁড়াইয়া ছিলেন। অচলা প্রগাঢ় ভক্তি-ভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেই তিনি গদগদ-কণ্ঠে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক মা, স্বামীকে নীরোগ ক'রে শিগ্‌গির ফিরিয়ে এনো, এই প্রার্থনা করি!

এই আমার সব চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ পিসিমা! বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সে গাড়ীতে গিয়া বসিল। কথাটা কেদারবাবুরও কানে গেল। তিনি নিজের অমার্জ্জনীয় লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

হাওড়া ষ্টেশন হইতে পশ্চিমের গাড়ী ছাড়িতে মিনিট-দশেক মাত্র বিলম্ব আছে। বাহিরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, টিপি টিপি বৃষ্টির আর বিরাম নাই। লোকের পায়ে পায়ে জলে-কাদায় সমস্ত প্লাটফর্ম ভরিয়া উঠিয়াছে—যাত্রীরা পিছল বাঁচাইয়া, ভিড় ঠেলিয়া কোনমতে মোট-ঘাট লইয়া জায়গা খুঁজিয়া ফিরিতেছিল; এমনি সময়ে অচলা চাহিয়া দেখিল, প্রকাণ্ড একটা ব্যাগ হাতে করিয়া সুরেশ আসিতেছে।

বিস্ময়ে, দুশ্চিন্তায় কেদারবাবুর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল, সে কাছে আসিতে না আসিতে তিনি চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি সুরেশ? তুমি কোথায় চলেছ?

জবাবটা সুরেশ অচলাকে দিল। তাহারই মুখের প্রতি চাহিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, নাঃ—তোমার উপদেশ নিমন্ত্রণ কোনটাই অবহেলা করা চলে না দেখলুম। আজ সকাল-বেলা তুমি অমন ক'রে চোখে আঙ্গুল দিয়ে না দেখালে হয় ত ধরতেই পারতুম না, শরীর আমার কত

খারাপ হয়ে গেছে! চল, তোমাদের অতিথি হয়েই দিন-কতক দেখি, সাম্‌লে পারি কি না! বাস্তবিক বল্‌চি ম—

বেশ ত, বেশ ত সুরেশ। তা ছাড়া নূতন জায়গায় আমাদেরও ঢের সাহায্য হবে; বলিয়া মহিম পলকের জন্য একবার অচলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সেই মুহূর্তের নিঃশব্দ ব্যথিত দৃষ্টি যেন সকলকেই উচ্চকণ্ঠে শুনাইয়া অচলাকে কহিয়া উঠিল, আমাকে বলিলে না কেন? যাহার স্বাস্থ্য লইয়া মনে মনে এত উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়াছ, আজ সকাল-বেলা পর্য্যন্ত উভয়ে যে কথা আলোচনা করিয়াছ, আমাকে তাহা ঘুণাগ্রে জানিতে দাও নাই কেন? এই লুকোচুরির কি প্রয়োজন ছিল অচলা!

কিন্তু অচলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল এবং সুরেশ ক্ষণকাল বিমূঢ়ের মত থাকিয়া অকস্মাৎ ভিতরের উত্তেজনা বাহিরে ঠেলিয়া আনিয়া অকারণ ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিল, কিন্তু আর ত দেরি নেই। চল চল, গাড়ীতে উঠে তার পরে কথাবার্ত্তা। চলুন কেদার-বাবু; বলিয়া সে কেবলমাত্র সম্মুখের দিকেই চোখ রাখিয়া সকলকে একপ্রকার যেন ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

কেদারবাবু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা কহিলেন না। মহিমকে তাহার জায়গায় বসাইয়া দিয়া অচলাকে মেয়েদের গাড়িতে তুলিয়া দিলেন। শুধু গাড়ী ছাড়িবার সময় সুরেশ হেঁট হইয়া যখন তাঁহাকে নমস্কার করিয়া মহিমের পার্শ্বে গিয়া বসিল, তখনই তাহাকে বলিলেন, তুমিই সঙ্গে আছ, আশা করি, পথে বিশেষ কোন কষ্ট হবে না। মেয়েদের গাড়ীটা একটু দূরে রইল, মাঝে মাঝে খবর নিয়ো। সুরেশ এবং মহিমকে আর একবার সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন, পৌঁছেই খবর দিতে যেন ভুল হয় না—দেখো। আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকব, বলিয়া চোখের জল চাপিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার বিষণ্ণ মলিন মুখ ও স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দুই বন্ধুরই কানের মধ্যে বাজিতে লাগিল।

গাড়ী ছাড়িলে ঠাণ্ডার ভয়ে মহিম্ কম্বল মুড়ি দিয়া অবিলম্বে শুইয়া পড়িল, কিন্তু সুরেশ সেইখানে একভাবে বসিয়া রহিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবার সেখানে লোক কেহ ছিল না, থাকিলে, যে কেহ বলিতে পারিত, ওই দুটো চোখের দৃষ্টি আজ কোন মতেই স্বাভাবিক নয়—ভিতরে অতি বড় অগ্নিকাণ্ড না ঘটিতে থাকিলে মানুষের চোখ দিয়া কিছুতেই অমন কঠিন আলো ফুটিয়া বাহির হয় না।

শ্লো প্যাসেঞ্জার ছোট বড় প্রত্যেক ষ্টেশনেই ধরিতে ধরিতে মন্থর-গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বাহিরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সমভাবেই বর্ষিতে লাগিল। একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামিবার উপক্রম করিলে, মহিম তাহার আবরণের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া কহিল, ভিড় ছিল না, একটু শুয়ে নিলে না কেন সুরেশ? এমন সুবিধে ত বরাবর আশা করা যায় না।

সুরেশ চমকিয়া বলিল, হাঁ, এই যে শুই।

এই চমকটা এমনি অসঙ্গত ও অকারণে কুণ্ঠিত দেখাইল যে, মহিম সবিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল। সে যেন তাহার অগোচরে কি একটা অপরাধ করিতেছিল, ধরা পড়ার ভয়েই এমন ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই ভাবটা মহিম অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মন হইতে দূর করিতে পারিল না।

গাড়ী আসিয়া থামিল।

সুরেশ আপনার অবস্থাটা অনুভব করিয়া একটুখানি হাঁসির আভাসে মুখখানা সরস করিয়া কহিল, আমি ভেবেছিলুম, তুমি ঘুমোচ্ছ, তাই এম্‌নি চম্‌কে উঠেছিলুম—

মহিম শুধু কহিল, হুঁ; কিন্তু এই অনাবশ্যক কৈফিয়ৎটাও তাহার ভাল লাগিল না।

সুরেশ বলিল, তাঁর কিছু চাই কি না একবার খবর নিতে পারলে—

কিন্তু জল পড়চে না?

ও কিছুই নয় আমি চট্ ক'রে দেখে আস্‌চি, বলিয়া সুরেশ দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। সে মেয়েগাড়ীর সুমুখে আসিয়া দেখিল, অচলা ইতিমধ্যে একটি সমবয়সী সঙ্গী পাইয়াছে, এবং তাহারই সহিত গল্প করিতেছে। সেই অগ্রে সুরেশকে দেখিতে পাইয়া অচলার গা টিপিয়া দিয়া মুখ ফিরিয়া বসিল। অচলা চাহিয়া দেখিতেই সুরেশ কিছু চাই কি না, জিজ্ঞাসা করিল। অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। তোমার জলে ভিজতে হবে না, যাও। বলিয়াই কিন্তু নিজে জানালার কাছে উঠিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, কিন্তু যাঁর জন্যে ভাবনা, তাঁর প্রতি যেন দৃষ্টি থাকে।

সুরেশ কহিল, তা আছে; কিন্তু তোমার কিছু খাবার কিংবা শুধু একটু জল—

অচলা সহাস্যে বলিল, না গো না, আমার কিছু চাই নে। কিন্তু তুমি নিজে কি জলে ভিজে অসুখ করতে চাও না কি?

সুরেশ পলকমাত্র অচলার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু আনত করিল, কহিল, অনেক দিন থেকেই ত চাইচি, কিন্তু হতভাগ্যের কাছে অসুখ পর্য্যন্ত ঘেঁষতে চায় না যে!

কথা শুনিয়া অচলার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু পাছে সুরেশ মুখ তুলিয়াই তাহা দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় সে কোনমতে ইহাকে একটা পরিহাসের আকার দিতে জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, একবার চল না। তখন এমন খাটুনি খাটাবো যে—

কিন্তু কথাটাকে সে শেষ করিতে পারিল না, তাহার অদৃশ্য লজ্জা এই ছদ্ম রহস্যের বাহ্য প্রকাশকে যেন অর্দ্ধপথেই ধিক্কার দিয়া থামাইয়া দিল।

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল, সুরেশ কি বলিবার জন্য মুখ তুলিয়াও অবশেষে কিছু না বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, সহসা বাধা পাইয়া ফিরিয়া দেখিল, তাহার র‍্যাপারের একটা খুঁট অচলার হাতের মুঠার

মধ্যে। সে ফিস্ ফিস্ করিয়া অকস্মাৎ তর্জ্জন করিয়া উঠিল, তোমাকে যে আমি সঙ্গে যেতে ডেকেছি, এ কথা সকলের কাছে প্রকাশ ক'রে দিলে কেন? কেন আমাকে অমন অপ্রতিভ করলে?

ঠিক্ এই কথাটাই সুরেশ তখন হইতে সহস্রবার তোলাপাড়া করিয়া অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছিল, তাই প্রত্যুত্তরে কেবল করুণ-কণ্ঠে কহিল, আমি না বুঝে অপরাধ ক'রে ফেলেছি অচলা।

অচলা লেশমাত্র শান্ত না হইয়া তেমনি উত্তপ্তস্বরে জবাব দিল, না বুঝে বৈ কি! সকলের কাছে আমার শুধু মাথা হেঁট করবার জন্যেই তুমি ইচ্ছে ক'রে বলেচ।

ট্রেণ চলিতে সুরু করিয়াছিল; সুরেশ আর কথা কহিবার অবকাশ পাইল না; অচলা তাহার গায়ের কাপড় ছাড়িয়া দিতেই সে দুরু দুরু বক্ষে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল, সে কোন দিকে না চাহিয়া ছুটিয়া চলিল বটে, কিন্তু তাহাকে দৃষ্টি দ্বারা অনুসরণ করিতে গিয়া আর একজনের হৃৎস্পন্দন একেবারে থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল। অচলার চোখ পড়িয়া গেল, আর একটা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া মহিম ঠিক তাহাদের দিকেই চাহিয়া আছে। সে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া যখন উপবেশন করিল, সেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, উনিই বুঝি আপনার স্বামী?

অন্যমনস্ক অচলা শুধু একটা হুঁ দিয়াই আর একটা জানালার বাহিরে গাছ-পালা, মাঠ-ময়দানের প্রতি শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; যে গল্প অসমাপ্ত রাখিয়া সে সুরেশের কাছে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ করিবার আর তাহার প্রবৃত্তি মাত্র রহিল না।

আবার গ্রামের পর গ্রাম, সহরের পর সহর পার হইয়া যাইতে লাগিল, আবার তাহার মনের ক্ষোভ কাটিয়া গিয়া মুখ নির্ম্মল ও প্রশান্ত হইয়া উঠিল, আবার সে তাহার সঙ্গিনীর সহিত স্বচ্ছন্দচিত্তে কথা-বার্ত্তায়

যোগ দিতে পারিল; যে লজ্জা ঘণ্টা-কয়েকমাত্র পূর্ব্বে তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, সে আর তাহার মনেও রহিল না।

একটা বড় ষ্টেশনে সুরেশ খানসামার হাতে চা ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী উপস্থিত করিল। অচলা সেগুলি গ্রহণ করিয়া সস্নেহ অনুযোগের স্বরে কহিল, তোমাকে এত হাঙ্গামা করতে কে ব'লে দিচ্ছে বল ত? তোমার বন্ধুরত্নটি বুঝি?

এ বিষয়ে সুরেশ কাহারো যে বলার অপেক্ষা রাখে না, অচলা তাহা ভাল করিয়াই জানিত, তথাপি এই অযাচিত যত্নটুকুর পরিবর্ত্তে সে এই স্নিগ্ধ খোঁচাটুকু না দিয়া যেন থাকিতে পারিল না।

সুরেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল, অচলা ফিরিয়া ডাকিল। সে চাপা হাসির আভাসটুকু তখনও তাহার ওষ্ঠাধরে লাগিয়া ছিল; তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রই অচলা সহসা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই লজ্জায় কুণ্ঠায় রাঙা হইয়া উঠিল। এই আরক্ত আভাটুকু সুরেশ দুই চক্ষু দিয়া যেন আকণ্ঠ পান করিয়া লইল।

অচলা স্বামীর সংবাদের জন্যই সুরেশকে ফিরিয়া ডাকিয়াছিল; তাঁহার কোন প্রকার ক্লেশ বা অসুবিধা হইতেছে কি না, বা কিছু আবশ্যক আছে কি না—একবার আসিতে পারেন কি না এই সকল একটি একটি করিয়া জানিয়া লইতে সে চাহিয়াছিল; কিন্তু ইহার পরে এ সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন করিবারও তাহার শক্তি রহিল না। সে অসঙ্গত গাম্ভীর্য্যের সহিত শুধু জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের ত এলাহাবাদে গাড়ী বদল করতে হবে? কত রাত্রে সেখানে পৌঁছবে জানেন? একবার জেনে এসে আমাকে ব'লে যেতে পারবেন?

আচ্ছা, বলিয়া সুরেশ একটু আশ্চর্য্য হইয়াই চলিয়া গেল।

অচলা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সেই মেয়েটি তাহার জায়গা ছাড়িয়া

দূরে গিয়া বসিয়াছে। অচলা অন্তরের বিরক্তি গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, আপনাদের বাড়িতে বুঝি কেউ চা-রুটি খায় না ?

মেয়েটি সবিনয়ে হাসিয়া বলিল, হায় হায়, ও দৌরাত্ম্য থেকে বুঝি কোন বাড়ি নিস্তার পেয়েচে ভাবেন ? ও ত সবাই খায়।

অচলা কহিল, তবে যে বড় ঘৃণায় স'রে বসলেন ?

মেয়েটি লজ্জিত-স্বরে বলিল, না ভাই, ঘৃণায় নয়—পুরুষেরা ত সমস্ত খায়, তবে আমার শ্বশুর এ সব পছন্দ করেন না, আর—আমাদের মেয়েমানুষের ত—

একদিন এমনি একটা খাওয়া-ছোঁয়ার ব্যাপার লইয়া মৃণালের সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। সেদিনও সে যে কারণে নিজেকে শাসন করিতে পারে নাই, আজও সে তেমনি একটা অন্তর্জ্বালায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গেল, এবং মেয়েটির কথা শেষ না হইতেই রুক্ষ-স্বরে বলিয়া উঠিল, আপনাকে বিব্রত করতে আমি চাই নে, আপনি স্বচ্ছন্দে ফিরে এসে আপনার জায়গায় বসুন; বলিয়া চক্ষের নিমিষে চা এবং সমস্ত খাদ্যদ্রব্য জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। মেয়েটি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে চাহিয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল, তাহার পরে একেবারে সম্পূর্ণ মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। বোধ করি, সে ইহাই ভাবিল, এতক্ষণের এত আলাপ, এত কথা-বার্ত্তার যে বিন্দুমাত্র মর্য্যাদা রাখিল না, না জানি সে এ অশ্রু দেখিয়া আবার কি একটা করিয়া বসিবে।

কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থামিলেও আকাশে ঘন মেঘ উত্তরোত্তর জমা হইয়া উঠিতেছিল। অপরাহ্নের কাছাকাছি পুনরায় চাপিয়া জল আসিল। এই জলের মধ্যে মেয়েটি নামিয়া যাইবে, সে তাহার উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিল।

অচলা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, একেবারে তাহার কাছে

আসিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, নিজের ব্যবহারের জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আমাকে আপনি মাপ করুন।

মেয়েটি হাসিল, কিন্তু সহসা উত্তর দিতে পারিল না। অচলা পুনরায় কহিল, আমার মন খারাপ থাকলে কি যে করে ফেলি, তার কোন ঠিকানা থাকে না। স্বামী পীড়িত, তাঁকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে যাচ্ছি—ভাল হ'ন ভালই, না হ'লে ঐ বিদেশে কি যে হবে, তা শুধু ভগবানই জানেন। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া উঠিল।

মেয়েটি বিস্মিত হইয়া কহিল, কিন্তু আপনার স্বামীকে দেখলে ত পীড়িত বলে মনে হয় না।

অচলা কহিল, আমার স্বামী এই গাড়ীতেই আছেন, কিন্তু আপনি তাঁকে দেখেন নি। উনি আমার স্বামীর বন্ধু।

মেয়েটি অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

এই বন্ধুটি তাহার স্বামী কি না, জিজ্ঞাসা করায় সে যে হুঁ বলিয়া সায় দিয়াছিল, এ কথা অচলার মনেই ছিল না, কিন্তু মেয়েটি তাহা বিস্মৃত হয় নাই। কিন্তু তাহার বিস্ময়কে অচলা সম্পূর্ণ অন্যভাবে গ্রহণ করিল। সুরেশের সহিত তাহার আচরণ ও বাক্যালাপে নিজের অন্তরের জ্বালা দিয়া বিকৃত করিয়া হিন্দুনারীর চক্ষে ইহা কিরূপ বিসদৃশ দেখাইয়াছে, তাহাই কল্পনা করিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল এবং একান্ত নিরর্থক ও বিশ্রী জবাবদিহির স্বরূপে বলিয়া ফেলিল, আমরা হিন্দু নই—ব্রাহ্ম।

মেয়েটি তবুও মৌন রহিল দেখিয়া অচলা সসঙ্কোচে তাহার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া কহিল, আমাদের আচার-ব্যবহার আপনারা সমস্ত বুঝতে না পার্‌লেই আমাদের অদ্ভুত ব'লে ভাববেন না!

এইবার মেয়েটি হাসিল, কহিল, আমরা ত ভাবি নে, বরঞ্চ আপনারাই যে কোন কারণে হোক্, আমাদের থেকে দূরে থাকতে চান। কেমন

ক'রে জানলুম ? আমাদেরই দুই-একটি আত্মীয় আছেন, যাঁরা আপনাদের সমাজের। তাঁদের কাছ থেকেই আমি জানতে পেরেচি, বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, সে কারণটি কি ?

মেয়েটি কহিল, সে আপনি নিশ্চয়ই জানেন। না জানেন ত সমাজের কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন; বলিয়া হাসিয়া প্রসঙ্গটা অকস্মাৎ চাপা দিয়া কহিল, আচ্ছা, অত দূরে না গিয়ে আপনার স্বামীকে নিয়ে কেন আমাদের ওখানে আসুন না।

কোথায়, আরায় ?

মা গো! সেখানে কি মানুষ থাকে! আমার উনি ঠিকেদারী কাজ করেন বলেই আমাকে মাঝে মাঝে আরায় গিয়ে থাকতে হয়। আমি ডিহরীর কথা বলচি। শোণ নদীর ওপর আমাদের ছোট বাড়ী আছে, সেখানে দুদিন থাকলে আপনার স্বামী ভাল হয়ে যাবেন। যাবেন সেখানে? বলিয়া মেয়েটি অচলার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া উত্তরের আশায় তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

এই অপরিচিতার ঔৎসুক্য ও আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়া অচলা মুগ্ধ হইয়া গেল। কহিল, কিন্তু আপনার স্বামীর ত অনুমতি চাই। তিনি না বললে ত যেতে পারি নে।

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, ইস্, তাই বৈ কি! আমরা সেবা করতে দাসী বলে বুঝি সবতাতেই দাসী? মনেও করবেন না। হুকুম দেবার বেলায় আমরাই ত কর্ত্তা। সে দেশ পছন্দ না হ'লে সোজা ডিহরীতে চলে আসবেন—এতটুকু চিন্তা করবেন না, এই আপনাকে ব'লে দিলুম। অনুমতি নিতে হয়, আমি নেব, আপনার কি গরজ? বলিয়া এই স্বামী-সৌভাগ্যবতী মেয়েটি তাহার আনন্দের আতিশয্যে অচলাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল।

আরা ষ্টেশন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, তাহা ট্রেনের মন্দগতিতে বুঝা গেল। সে অচলার হাত দুটি পুনরায় নিজের ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবেগ ভরে বলিল, আমার সময় হ'ল, আমি চল্লুম, কিন্তু আপনি ভেবে ভেবে মিথ্যে মন খারাপ করতে পাবেন না, ব'লে যাচ্ছি। আপনার কোন ভয় নেই, স্বামী আপনার খুব শিগ্‌গির ভাল হয়ে উঠবেন। কিন্তু কথা দিন, ফেরবার পথে একটিবার আমার ওখানে পায়ের ধূলো দিয়ে যাবেন?

অচলা চোখের জল চাপিয়া বলিল, সেদিন যদি পাই, নিশ্চয় আপনাকে একবার দেখে যাবো।

মেয়েটি বলিল, পাবেন বৈ কি, নিশ্চয় পাবেন। আপনাকে আমি চিন্‌তে পেরেচি। এই আমি ব'লে যাচ্চি, আপনার এতবড় ভক্তি-ভালবাসাকে ভগবান কখনো বিমুখ করবেন না, এমন হতেই পারে না।

অচলা জবাব দিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া একটা উচ্ছ্বসিত বাষ্পোচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া লইল।

বৃষ্টির মধ্যে গাড়ী আসিয়া প্লাটফর্ম্মে থামিল। মেয়েটির ছোট দেবর অন্যত্র ছিল, সে আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। অচলা তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল, আপনার স্বামীর নাম ত মুখে আন্‌বেন না জানি, কিন্তু আপনার নিজের নামটি কি বলুন ত? যদি কখনো ফিরে আসি, কি ক'রে আপনার খোঁজ পাব?

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া কহিল, আমার নাম রাক্ষসী। ডিহরীতে এসে কোন বাঙালীর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেই সে আমার সন্ধান ব'লে দেবে। কিন্তু দুজনে একবার এসো ভাই। আমার মাথার দিব্যি রইল, আমি পথ চেয়ে থাকবো। শোণ নদীর উপরেই আমাদের

বাড়ি। এই বলিয়া মেয়েটি দুই হাত জোড় করিয়া হঠাৎ একটা নমস্কার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে বাহির হইয়া গেল।

বাষ্পীয় শকট আবার ধীরে ধীরে যাত্রা করিল। এই মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে; কিন্তু অবিশ্রাম বারিপাতের সঙ্গে বাতাস যোগ দিয়া এই দুর্যোগের রাত্রিকে যেন শতগুণ ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। জানালার কাচের ভিতর দিয়া চাহিয়া তাহার দৃষ্টি পীড়িত হইয়া উঠিল—তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই সুচিভেদ্য অন্ধকার তাহার আদি অন্ত যেন গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। আলোর মুখ, আনন্দের মুখ আর সে কখনও দেখিবে না—ইহা হইতে এ জীবনে আর তাহার মুক্তি নাই। সঙ্গিবিহীন নির্জ্জন কক্ষের মধ্যে সে একটা কোণের মধ্যে আসিয়া গায়ের কাপড়টা আগাগোড়া টানিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল এবং এইবার তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কেন যে এই চোখের জল, ঠিক কি যে তাহার এত বড় দুঃখ, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু কান্নাকেও সে কোন মতে আয়ত্ত করিতে পারিল না। অদম্য তরঙ্গের মত সে তাহার বুকের ভিতরটা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া গর্জ্জিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার পিতাকে মনে পড়িল, তাহার ছেলে-বেলার সঙ্গী-সাথীদের মনে পড়িল, পিসিমাকে মনে পড়িল, মৃণালকে মনে পড়িল, এইমাত্র যে মেয়েটি রাক্ষসী বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিয়া গেল, তাহাকে মনে পড়িল—বহু চাকরটা পর্য্যন্ত যেন তাহার চোখের উপর দিয়া বার বার আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সকলের নিকট সে যেন জন্মের শোধ বিদায় লইয়া কোথায় কোন নিরুদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে, বক্ষের মধ্যে তাহার এমনি ব্যথা বাজিতে লাগিল।

এইভাবে নিরন্তর অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া, গাড়ী যখন পরের ষ্টেশনে আসিয়া থামিল, তখন বেদনাতুর হৃদয় তাহার অনেকটা শান্ত হইয়া

গিয়াছে। সে উঠিয়া বসিয়া ব্যাকুলদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, যদি কোন স্ত্রীলোক যাত্রী এই দুর্যোগের রাত্রেও তাহার কক্ষে দৈবাৎ পদার্পণ করে। ভিজিতে ভিজিতে কেহ কেহ নামিয়া গেল, কেহ কেহ উঠিলও বটে, কিন্তু তাহার কামরার সন্নিকটেও কেহ আসিল না।

গাড়ী ছাড়িলে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া সে তাহার জায়গায় ফিরিয়া আসিল এবং আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়া পূর্ব্ববৎ শুইয়া পড়িতেই এবার কোন অচিন্তনীয় কারণে তাহার দুঃখার্ত্ত চিত্ত অকস্মাৎ সুখের কল্পনায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু ইহা নতুন নহে; যেদিন বায়ুপরিবর্ত্তনের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়, সেদিনও সে এমনি স্বপ্নই দেখিয়াছিল। আজও সে তেমনি তাহার রুগ্ন স্বামীকে স্মরণ করিয়া, তাঁহারই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুঃ কামনা করিয়া এক অপরিচিত স্থানের মধ্যে আনন্দ ও সুখ শান্তির জাল বুনিতে বুনিতে বিভোর হইয়া গেল।

কখন্ এবং কতক্ষণ যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার স্মরণ নাই। সহসা নিজের নাম কানে যাইবামাত্রই সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল, দ্বারের কাছে সুরেশ দাঁড়াইয়া এবং সেই খোলা দরজার ভিতর দিয়া অজস্র জল-বাতাস ভিতরে ঢুকিয়া প্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছে।

সুরেশ চীৎকার করিয়া কহিল, শিগ্‌গির নেমে পড়, প্লাটফর্ম্মে গাড়ী দাঁড়িয়ে। তোমার নিজের ব্যাগটা কোথায়?

অচলার দুই চক্ষে ঘুম তখনও জড়াইয়া ছিল, কিন্তু তাহার মনে পড়িল, এলাহাবাদ ষ্টেশনে জব্বলপুরের গাড়ী বদল করিতে হইবে। সে ব্যাগটা দেখাইয়া দিয়া শশব্যস্তে নামিয়া পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া কহিল, কিন্তু এত জলের মধ্যে তাঁকে নামাবে কি ক'রে? এখানে পাল্‌কী-টাল্কী কিছু কি পাওয়া যায় না? নইলে অসুখ যে বেড়ে যাবে সুরেশবাবু!

সুরেশ কি যে জবাব দিল, জলের শব্দে তাহা বুঝা গেল না। সে এক হাতে ব্যাগ ও অপর হস্তে অচলার একটা হাত দৃঢ়মুষ্টিতে

চাপিয়া ধরিয়া ও-দিকের প্লাটফর্ম্মের উদ্দেশ্যে দ্রুতবেগে টানিয়া লইয়া চলিল। এই ট্রেনটা ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারই একটা যাত্রিশূন্য ফাষ্টক্লাস কামরার মধ্যে অচলাকে ঠেলিয়া দিয়া সুরেশ তাড়াতাড়ি কহিল, তুমি স্থির হয়ে ব'সো, তাঁকে নামিয়ে আনি গে।

তা হ'লে আমার এই মোটা গায়ের কাপড়টা নিয়ে যাও, তাঁকে বেশ করে ঢেকে এনো। বলিয়া অচলা হাত বাড়াইয়া তাহার গাত্রবস্ত্রটা সুরেশের গায়ের উপর ফেলিয়া দিতেই সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি যায়, অচলা সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, পোষ্টের উপর দূরে দূরে ষ্টেশনের লণ্ঠন জ্বলিতেছে; কিন্তু এই প্রচণ্ড জলের মধ্যে সে আলোক এমনি অস্পষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার সাহায্যে কিছুই প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। জলে ভিজিয়া যাত্রীরা ছুটাছুটি করিতেছে, কুলিরা মোট বহিয়া আনাগোনা করিতেছে, কর্ম্মচারীরা বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে—ঝাপ্সা ছায়ার মত তাহা দেখা যায় মাত্র। ক্রমশঃ তাহাও বিরল হইয়া আসিল, ষ্টেশনের ঘণ্টা তীক্ষ্ণরবে বাজিয়া উঠিল এবং যে ট্রেন হইতে অচলা এইমাত্র নামিয়া আসিয়াছে, ভীষণ অজগরের ন্যায় ফোঁস ফোঁস শব্দে তাহা আকাশ বাতাস কম্পিত করিয়া প্লাটফর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল এবং অখণ্ড অন্ধকার ব্যতীত সম্মুখে আর কোন ব্যবধানই রহিল না।

আবার ঘণ্টায় ঘা পড়িল। ইহা যে এ-গাড়ীর জন্য, অচলা তাহা বুঝিল, কিন্তু তাঁহারা উঠিলেন কি না, কোথায় উঠিলেন, জিনিষ-পত্র সমস্ত তোলা হইল কি না কিছু রহিয়া গেল, কিছুই জানিতে না পারিয়া সে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিল।

একজন পিয়াদা সর্ব্বাঙ্গে কম্বল ঢাকিয়া নীল লণ্ঠন হাতে বেগে চলিয়াছে; সুমুখে পাইয়া অচলা ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, সমস্ত প্যাসেঞ্জার

উঠিয়াছে কি না। প্রথম শ্রেণীর কামরা দেখিয়া লোকটা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হাঁ মেমসাহেব।

অচলা কতকটা সুস্থির হইয়া সময় জিজ্ঞাসা করায়, লোকটা কহিল, নয় বাজকে—

নয় বাজকে? অচলা চমকিয়া উঠিল। কিন্তু এলাহাবাদে পৌঁছিতে ত রাত্রি প্রায় শেষ হইবার কথা। ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিল, এলাহাবাদ—

কিন্তু লোকটা আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। উপরে ছাদ ছিল না, তাই আকাশের বৃষ্টি ছাড়া গাড়ীর ছাদ হইতে জল ছিটাইয়া তাহার চোখ-মুখে সূচের মত বিঁধিতেছিল; সে হাতের আলোটা সবেগে নাড়িয়া দিয়া মোগলসরাই! মোগলসরাই! বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এমনি সময়ে সুরেশ তাহার সম্মুখ দিয়া ছুটিতে ছুটিতে বলিয়া গেল—ভয় নেই—আমি পাশের গাড়ীতেই আছি।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

সুরেশ পাশের গাড়ীতে গিয়া উঠিল সত্য, কিন্তু তিনি? এই ত সে চোখ মেলিয়া নিরন্তর বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে—তাঁহার চেহারা তা সে যত অস্পষ্টই হোক, সে কি একবারও তাহার চোখে পড়িত না? আর এলাহাবাদের পরিবর্তে এই কি-একটা নূতন ষ্টেশনেই গাড়ী বদল করা হইল কিসের জন্য? জলের ছাটে তাহার মাথার চুল, তাহার গায়ের জামা সমস্ত ভিজিয়া উঠিতে লাগিল, তবুও সে খোলা জানালা দিয়া বার বার মুখ বাহির করিয়া একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে

অন্ধকারের মধ্যে কি যে দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল তাহা সেই জানে; কিন্তু এ-কথা মন তাহার কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিল না যে, এ-গাড়ীতে তাহার স্বামী নাই—সে একেবারে অনন্য-নির্ভর, একান্ত ও একাকী সুরেশের সহিত কোন এক দিগ্‌হীন নিরুদ্দেশ যাত্রার পথে বাহির হইয়াছে। এমন হইতে পারে না! এই গাড়ীতেই তিনি কোথাও না কোথাও আছেনই আছেন।

সুরেশ যাই হোক, এবং সে যাই করুক, একজন নিরপরাধা রমণীকে তাহার সমাজ হইতে, ধর্ম্ম হইতে, নারীর সমস্ত গৌরব হইতে ভুলাইয়া এই অনিবার্য্য মৃত্যুর মধ্যে ঠেলিয়া দিবে, এত বড় উন্মাদ সে নয়। বিশেষতঃ ইহাতে তাহার লাভ কি? অচলার যে দেহটার প্রতি তাহার এত লোভ সেই দেহটাকে একটা গণিকার দেহে পরিণত দেখিতে অচলা যে বাঁচিয়া থাকিবে না, এই সোজা কথাটুকু যদি সে না বুঝিয়া থাকে ত ভালবাসার কথা মুখে আনিয়াছিল কোন মুখে? না না, ইহা হইতেই পারে না! ইঞ্জিনের দিকে কোথাও তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়াছেন, সে দেখিতে পায় নাই।

সহসা একটা প্রবল ঝাপ্টা তাহার চোখে-মুখে আসিয়া পড়িতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া কোণের দিকে সরিয়া আসিল এবং তৎক্ষণে নিজের প্রতি চাহিয়া দেখিল, সর্ব্বাঙ্গে শুষ্ক বস্ত্র কোথাও আর এতটুকু অবশিষ্ট নাই! বৃষ্টির জলে এমন করিয়াই ভিজিয়াছে যে, অঞ্চল হইতে, জামার হাতা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। এই শীতের রাতে সে না জানিয়া যাহা সহিয়াছিল, জানিয়া আর পারিল না এবং কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিবার মানসে কম্পিতহস্তে ব্যাগটা টানিয়া লইয়া যখন চাবি খুলিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় গাড়ীর গতি অতি মন্দ হইয়া আসিল এবং অনতিবিলম্বে তাহা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। জল সমানে পড়িতেছে, কোন্ ষ্টেশন জানিবার উপায় নাই; তবুও ব্যাগ

খোলাই পড়িয়া রহিল, সে ভিতরের অদম্য উদ্বেগের তাড়নায় একেবারে দ্বার খুলিয়া বাহিরে নামিয়া অন্ধকারে আন্দাজ করিয়া ভিজিতে ভিজিতে দ্রুতপদে সুরেশের জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

চীৎকার করিয়া ডাকিল, সুরেশবাবু!

এই কামরায় জন-দুই বাঙ্গালী ও একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ছিলেন। সুরেশ একটা কোণে জড়সড়ভাবে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল। অচলার বোধ করি ভয় ছিল, হয় ত তাহার গলা দিয়া সহজে শব্দ ফুটিবে না। তাই তাহার প্রবল উদ্যমের কণ্ঠস্বর ঠিক যেন আহত জন্তুর মত তীব্র আর্তনাদের মত শুধু সুরেশকেই নয় উপস্থিত সকলকেই একেবারে চমকিত করিয়া দিল। অভিভূত সুরেশ চোখ মেলিয়া দেখিল, দ্বারে দাঁড়াইয়া অচলা তাহার অনাবৃত মুখের উপর একই কালে অজস্র জলধারা এবং গাড়ীর উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া এমনই একটা রূপের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে যে, সমস্ত লোকের মুগ্ধ দৃষ্টি বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক হইয়া গিয়াছে! সে ছুটিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইতেই অচলা প্রশ্ন করিল, তাঁকে দেখচি নে—কৈ তিনি? কোন্ গাড়ীতে তাঁকে তুলেচ?

চল দেখিয়ে দিচ্চি, বলিয়া সুরেশ বৃষ্টির মধ্যেই নামিয়া পড়িল এবং যে দিক্ হইতে অচলা আসিয়াছিল, সেই দিক্ পানেই তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বাঙালী দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া একটু হাসিল, ইংরাজ কিছুই বুঝে নাই, কিন্তু নারী-কণ্ঠের আকুল প্রশ্ন তাহার মর্ম স্পর্শ করিয়াছিল; সে ভূলুণ্ঠিত কম্বলটা পায়ের উপর টানিয়া লইয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল এবং স্তব্ধমুখে বাহিরের অন্ধকারের প্রতি চাহিয়া রহিল।

অচলার কামরার সম্মুখে আসিয়া সুরেশ থমকিয়া দাঁড়াইল, ভিতরের

দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, তোমার ব্যাগ খোলা কেন? এবং প্রত্যুত্তরের জন্য এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করিয়া দরজাটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া অচলাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া ভিতরে তুলিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

সুরেশ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, এটা খুললে কে?

অচলা কহিল, আমি। কিন্তু ও-থাক—তিনি কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও—না হয়, শুধু ব'লে দাও কোন্ দিকে, আমি নিজে খুঁজে নিচ্ছি; বলিতে বলিতে সে দ্বারের দিকে পা বাড়াইতেই সুরেশ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, অত ব্যস্ত কেন? গাড়ী ছেড়ে দিয়েচে দেখতে পাচ্চো?

অচলা বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়াই বুঝিল, কথাটা সত্য। গাড়ী চলিতে সুরু করিয়াছে। তাহার দুই চক্ষে নিরাশা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল। সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া যে দৃষ্টি দিয়া শুধু পলকের জন্য সুরেশের একান্ত পাণ্ডুর শ্রীহীন মুখের প্রতি চাহিল এবং পরক্ষণেই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সশব্দে মেঝের লুটাইয়া পড়িয়া দুই বাহু দিয়া সুরেশের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কোথায় তিনি? তাঁকে কি তুমি ঘুমন্ত গাড়ী থেকে ফেলে দিয়েচ? রোগা মানুষকে খুন ক'রে তোমার—

এত বড় ভীষণ অভিযোগের শেষটা কিন্তু তখনও শেষ হইতে পাইল না। অকস্মাৎ তাহার বুক-ফাটা কান্নায় যেন শতধারে ফাটিয়া সুরেশকে একেবারে পাষাণ করিয়া দিয়া চতুর্দ্দিকের ইহারই মত ভয়াবহ এক উন্মত্ত যামিনীর অভ্যন্তরে গিয়া বিলীন হইয়া গেল এবং সেইখানে, সেই গদি-আঁটা বেঞ্চের গায়ে হেলান দিয়া সুরেশ অসহ্য বিস্ময়ে শুধু স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। তারপর তাহার পদতলে কি যে ঘটিতেছিল, কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা যেন উপলব্ধি করিতেই পারিল না। অনেকক্ষণ পরে সে

তাহার সত্য দৃষ্টিকে এমন করিয়া আবৃত করিয়া এই ভুলের মধ্যেই বারংবার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই ছলনাময়ীর বিরুদ্ধেও তাহার সমস্ত অন্তর একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই আজ সে অচলার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিল, বোধ হয় আমরা সশরীরে নরকেই যাচ্চি। যে অধঃপথে পথ দেখিয়ে এতদূর পর্য্যন্ত টেনে এনেচ, তার মাঝখানে ত ইচ্ছে করলেই দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যাবে না! এখন শেষ পর্য্যন্ত যেতেই হবে।

কথা শুনিয়া অচলার আপাদ-মস্তক একবার কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে সে নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। যে মিথ্যাচারী কাপুরুষ পরস্ত্রীকে এমন করিয়া বিপথে ভুলাইয়া আনিয়াও অসঙ্কোচে এত বড় নির্লজ্জ অপবাদ মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারে, তাহাকে বলিবার আর কাহার কি থাকে!

সুরেশ আবার পায়চারি করিতে লাগিল। বোধ হয় এই পাষাণ-প্রতিমার সুমুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিবার তাহার শক্তি ছিল না। বলিতে লাগিল, তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছ, যেন একা তোমারই সর্ব্বনাশ। কিন্তু সর্ব্বনাশ বল্‌তে যা বোঝায়, তা আমার পক্ষে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে জানো? আমি তোমাদের মত ব্রহ্মজ্ঞানী নই, আমি নাস্তিক। আমি পাপপুণ্যের ফাঁকা আওয়াজ করি নে, আমি নিরেট সত্যিকার সর্ব্বনাশের কথাই ভাবি। তোমার রূপ আছে, চোখের জল আছে, মেয়েমানুষের যা কিছু অস্ত্র-শস্ত্র, তোমার তূণে সে সব প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত আছে, তোমার কোন পথেই বাধা পড়বে না। কিন্তু আমার পরিণাম কল্পনা করতে পারো? আমি পুরুষমানুষ—তাই আমাকে জেলের পথ বন্ধ করতে নিজের হাতে এইখানে গুলী করতে হবে। বলিয়া সুরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বুকের মাঝখানে হাত দিয়া দেখাইল।

অচলা কি একটা বলিতে উদ্যত হইয়া মুখ তুলিয়াও নিঃশব্দে মুখ

ফিরাইয়া লইল। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা যে উপচাইয়া পড়িতেছিল, তাহা দেখিতে পাইয়া সুরেশ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, ময়ূরপুচ্ছ পাখায় গুঁজে দাঁড়কাক কখনো ময়ূর হয় না অচলা। ও চাহনি আমি চিনি, কিন্তু সে তোমাকে সাজে না। যাকে সাজতো, সে মৃণাল, তুমি নয়! তুমি অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দুর ঘরের কুল-বধূ নও, এতটুকুতে তোমাদের জাতি যাবে না। তুমি যেখানে খুসি নেমে চ'লে যাও। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, মহিমকে দেখিও, সে ঘরে নেবে। টাকা দিচ্ছি, তোমার বাপকে দিয়ো—তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। তোমার চিন্তা কি অচলা, এ এম্‌নি কি বেশি অপরাধ?

সে আবার পায়চারি করিতে লাগিল, একবার চাহিয়াও দেখিল না, তাহার জ্বলন্ত শূল কোথায় কি কাজ করিল। খাবারের লোভে বন্যপশু ফাঁদে পড়িয়া অন্ধ ক্রোধে যাহা পায়, তাহাই যেমন নিষ্ঠুর দংশনে ছিঁড়িতে থাকে, ঠিক সেইভাবে সুরেশ অচলাকে একেবারে যেন টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে চাহিল। হঠাৎ মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, এ এমনি কি ভয়ানক অপরাধ? স্বামীর ঘরে দাঁড়িয়ে তার মুখের উপরে বলেছিলে, একজন পর-পুরুষকে ভালবাসা—সে কি ভুলে গেছ? যে লোক ঘরে আগুন দিয়ে তোমার স্বামীকে পোড়াতে চেয়েছিল ব'লে তোমার বিশ্বাস, তার সঙ্গেই চ'লে আস্‌তে চেয়েছিলে—এবং এলেও তাই; স্মরণ হয়? তার ঘরে, তার আশ্রয়ে বাস ক'রে গোপনে কেঁদে তাকেই সঙ্গে আস্‌তে সেধেছিলে মনে পড়ে? তার চেয়েও কি এটা বেশি অপরাধ? আরও কত কি প্রতিদানের অসংখ্য খুঁটিনাটি! তাই আজ আমার এত সাহস! আসলে তুমি একটা গণিকা, তাই তোমাকে ভুলিয়ে এনেচি! ভেবেছিলুম প্রথমে একটুখানি চমকে উঠ্‌বে মাত্র। তার বেশি তোমার কাছে আশা করি নি! তোমাকে বার বার ব'লে দিচ্ছি অচলা, তুমি সতী-সাবিত্রী নও। সে তেজ, সে দর্প, তোমার সাজে না, মানায়

না—সে তোমার একান্ত অনধিকারচর্চ্চা! বলিয়া সুরেশ রুদ্ধশ্বাসে নির্জ্জীব হইয়া থামিতেই অচলা মুখ তুলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, আপনি থামবেন না সুরেশবাবু, আরও বলুন। আমাকে দুই পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে সংসারে যত কটু কথা, যত কুৎসিত বিদ্রূপ, যত অপমান আছে, সব করুন; বলিয়া মেঝের উপর অকস্মাৎ উপুড় হইয়া পড়িয়া অবরুদ্ধ রোদনের বিদীর্ণ-স্বরে বলিতে লাগিল, এই আমি চাই, এই আমার দরকার! এই আমাদের সত্যিকার সম্বন্ধ! পৃথিবীর কাছে, ভগবানের কাছে, আপনার কাছে এই আমার একমাত্র প্রাপ্য।

সুরেশ দেওয়ালে ঠেস দিয়া কাঠ হইয়া চাহিয়া রহিল। অচলার সুদীর্ঘ কেশভার স্রস্ত-বিপর্য্যস্ত হইয়া মাটীতে লুটাইতে লাগিল, তাহার জলসিক্ত গাত্রবাস ধূলার-কাদায় মলিন, কদর্য্য হইয়া উঠিল, কিন্তু সে দিকে সুরেশ পা বাড়াইতে পারিল না। নূতন শিকারী তাহার প্রথম ভূপতিত পক্ষিণীর মৃত্যুযন্ত্রণা যেমন অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখে, তেমনি দুই মুগ্ধ চক্ষের অপলক দৃষ্টি দিয়া সে যেন কোন এক মরণাহত নারীর শেষ মুহূর্ত্তের সাক্ষ্য দাঁড়াইয়া রহিল।

আবার গাড়ীর গতি মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া ধীরে ধীরে ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। সুরেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া শান্ত সহজ গলায় বলিল, লোকে তোমাকে এ অবস্থায় দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। তুমি উঠে ব'সো, আমি আমার ঘরে চল্লুম। সকাল হ'লে তুমি যেখানে নামতে চাইবে আমি নামিয়ে দেব, যেখানে যেতে চাইবে, আমি পাঠিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু একটা করবার চেষ্টা ক'রো না, তাতে কোন ফল হবে না। বলিয়া সুরেশ কপাট খুলিয়া নিচে নামিয়া গেল এবং সাবধানে তাহা বন্ধ করিয়া কি ভাবিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, তুমি আমার কথা বুঝবে না,

কিন্তু এইটুকু শুনে রাখো যে, এ সমস্যার মীমাংসার ভার আমিই নিলুম। আর তোমার কোন অমঙ্গল ঘটতে দেব না—এর সমস্ত ঋণ আমি কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ ক'রে যাবো, বলিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার নিজের কামরার দিকে প্রস্থান করিল।

ট্রেনের টানা ও একঘেয়ে শব্দের বিরামের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারই সুরেশের তন্দ্রা ভাঙিতেছিল বটে, কিন্তু চোখের পাতার ভার ঠেলিয়া চাহিয়া দেখিবার শক্তি আর যেন তাহাতে ছিল না। ভিজা কাপড়ে তাহার অত্যন্ত শীত করিতেছিল, বস্তুতঃ সে যে অসুখে পড়িতে পারে এবং বর্তমান অবস্থায় সে যে কি ভীষণ ব্যাপার, ইহা ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতেও ছিল, কিন্তু ব্যাগ খুলিয়া বস্ত্রপরিবর্তনের উদ্যম একটা অসাধ্য অভিলাষের মতই তাহার মনের মধ্যে অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। ঠিক এমনি সময়ে তাহার কানে গিয়া একটা সুপরিচিত কণ্ঠের ডাক পৌঁছিল—কুলী! কুলী! সে অর্দ্ধসজাগভাবে চোখ মেলিয়া দেখিল, গাড়ী কোন্ একটা ষ্টেশনে থামিয়া আছে, এবং কখন অন্ধকার কাটিয়া গিয়া ক্ষান্ত-বর্ষণ ধূসর মেঘের মধ্য দিয়া এক প্রকারের ঘোলাটে আলোকে সমস্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে পাইল, অনেকে নামিতেছে, অনেকে চড়িতেছে, এবং তাহারই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একটি শোকাচ্ছন্ন রমণীমূর্ত্তি কিসের তরে আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। এ অচলা। একজন কুলি ঘাড়ে একটা মস্ত চামড়ার ব্যাগ লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইতে সে তাহাকে কি একটা জিজ্ঞাসা করিয়া গেটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

এতক্ষণ পর্যান্ত সুরেশ নিশ্চেষ্টভাবে শুধু চাহিয়াই ছিল। বোধ হয় তাহার চোখের দেখা ভিতরে ঢুকিবার পথ পাইতেছিল না। কিন্তু গাড়ী ছাড়িবার বেলের শব্দ প্লাটফর্মের কোন্ এক প্রান্ত হইতে সহসা ধ্বনিয়া উঠিয়া তড়িৎস্পর্শের মত তাহার অন্তর-বাহিরকে এক মুহূর্ত্তে এক করিয়া

তাহার সমস্ত জড়িমা ঘুচাইয়া দিল, এবং পলকের মধ্যে নিজের ব্যাগটা টানিয়া লইয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল।

টিকিটের কথা অচলার মনেই ছিল না। সে দ্বারের মুখে টিকিট-বাবুকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইতেই সুরেশ পিছন হইতে স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, দাঁড়িয়ো না, চল আমি টিকিট দিচ্ছি।

তাহার আগমন অচলা টের পায় নাই। মুহূর্তের জন্য কুণ্ঠায়, ভয়ে তাহার পা উঠিল না, কিন্তু এই সঙ্কোচ অপরের লক্ষ্য-বিষয়ীভূত হওয়ার পূর্ব্বেই সে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া উভয়ের নিম্নলিখিত মত কথাবার্ত্তা হইল।

সুরেশ কহিল, আমি ভেবেছিলাম, তুমি সোজা কল্‌কাতাতেই ফিরে যেতে চাইবে, হঠাৎ এই ডিহরীতে নেমে পড়লে কেন? এখানে কি পরিচিত কেউ আছেন?

অচলা অন্যদিকে চাহিয়াছিল, সেই দিকে চাহিয়াই জবাব দিল, কল্‌কাতায় আমি কার কাছে যাবো?

কিন্তু এখানে?

অচলা চুপ করিয়া রহিল। সুরেশ নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আমার কোন কথা হয় ত আর তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, আর সে জন্য আমার নালিশও কিছু নেই, আমি কেবল তোমার কাছে শেষ সময়ে কিছু ভিক্ষা চাই।

অচলা তেমনি নীরবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেশ কহিল, আমার কথা কাউকে বোঝাবারও নয়, আমি বোঝাতেও চাই নি। আমার জিনিস আমার সঙ্গেই যাক! যেখানে গেলে এখানের আগুন আর পোড়াতে পারবে না, আমি সেই দেশের জন্যই আজ পথ ধরলুম, কিন্তু আমার শেষ সম্বলটুকু আমাকে দাও, আমি হাত যোড় ক'রে তোমার কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।

তথাপি অচলার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না; সুরেশ কহিতে লাগিল, আমি নিজে তোমাকে অনেক কটু কথা বলেচি, অনেক দুঃখ দিয়েচি; কিন্তু পরে যে ভালো থাকার দম্ভে ওপরে ব'সে তোমার মাথায় কলঙ্কের কালি ছিটিয়ে কালো ক'রে তুলবে, সে আমি মরেও সইতে পারবো না। আমার জন্যে তোমাকে আর না দুঃখ পেতে হয়, বিদায় হবার আগে আমাকে এইটুকু সুযোগ ভিক্ষে দিয়ে যাও অচলা।

তাহার কণ্ঠস্বরে কি যে ছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন, অকস্মাৎ তপ্ত-অশ্রুতে অচলার দুই চক্ষু ভাসিয়া গেল। কিন্তু তবুও সে নিজের কণ্ঠ প্রাণপণে অবিকৃত রাখিয়া মৃদুস্বরে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কি করতে হবে বলুন?

সুরেশ পকেট হইতে টাইম-টেবিলখানা বাহির করিয়া গাড়ীর সময়টা দেখিয়া লইয়া কহিল, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কিন্তু সন্ধ্যার আগে যখন কোন দিকে যাবারই উপায় নেই, তখন এইটুকু কাল আর আমাকে অবিশ্বাস ক'রো না, এই শুধু আমি চাই। আমা হ'তে তোমার আর কোন অকল্যাণ হবে না, এ কথা তোমার নাম করেই আজ আমি শপথ করছি।

প্রত্যুত্তরে সে কোন কথাই কহিল না, কিন্তু সে যে সম্মত হইয়াছে, তাহা বুঝা গেল।

লোকের দৃষ্টি এবং কৌতূহল আকর্ষণ করিবার আশঙ্কায় ষ্টেশনে ফিরিয়া তাহার ক্ষুদ্র বসিবার ঘরে গিয়া অপেক্ষা করিতে দুজনের কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। সন্ধান লইয়া জানা গেল, বড় রাস্তার উপরে সম্রাট শের সাহের নামে প্রচলিত সরাইয়ের অস্তিত্ব আজিও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। শহরের এক প্রান্তে তাহারই একটার উদ্দেশে দুজনে ক্ষণ-কালের জন্য নিজেদের মর্ম্মান্তিক দুঃখ বিস্মৃত হইয়া একখানা গরুর গাড়ী করিয়া যাত্রা করিল।

পথে কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিল না, কেহ কাহারও মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল না। শুধু গো-শকট আসিয়া যখন সরাইয়ের প্রাঙ্গণে থামিল, তখন নামিতে গিয়া পলকের জন্য সুরেশের মুখের প্রতি অচলার দৃষ্টি পড়িয়া মনে মনে শুধু কেবল আশ্চর্য্য নয়, উদ্বিগ্ন হইল। তাহার দুই চোখ ভয়ানক রাঙা, অথচ মুখের উপর কিসে যেন কালি মাখাইয়া দিয়াছে। সংসারের অনেক ঝড়-ঝাপটের মধ্যেই সে তাহাকে দেখিয়াছে, কিন্তু তাহার এ মূর্ত্তি সে আর কখনও দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারিল না।

গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া বিদায় করিয়া সুরেশ মণি-ব্যাগটা সেইখানে রাখিয়া দিয়া বলিল, এটা আপাততঃ তোমার কাছে রইল, যদি কিছু দরকার মনে হয়, নিতে লজ্জা ক'রো না।

অচলার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করে, এ কথার অর্থ কি। কিন্তু পারিল না। সুরেশ কহিল, এই সুমুখের ঘরটাই সম্ভবতঃ কিছু ভালো, তুমি একটুখানি বিশ্রাম কর, আমি পাশের কোন একটা ঘর থেকে এই জামাকাপড়গুলো ছেড়ে আসি। কি জানি, এইগুলোর জন্যেই বোধ করি এ রকম বিশ্রী ঠেক্‌চে; বলিয়া সে অচলার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি আর লেশমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজের ব্যাগটা হাতে লইয়া ঠিক মাতালের মত টলিয়া টলিয়া বারান্দা পার হইয়া পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সে চলিয়া গেলে অচলা একাকী পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। তাই সে অনেক কষ্টে নিজের ভারি ব্যাগটা টানিয়া টানিয়া সম্মুখের ঘরের মধ্যে আনিয়া ফেলিল, এবং তাহারই উপরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রাস্তার উপরে লোক-চলাচল দেখিতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সেই ঘরের সম্মুখে ব্যাগের উপরে বসিয়া আশা ও আশ্বাসের স্বপ্ন দেখিয়া অচলার কোথায় দিয়া যে দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহা সে জানিতে পারিল না। কিছুক্ষণ সূর্য্য উঠিয়াছে। শীতের দিনের ধূলি-ধূসরিত তরুশ্রেণী কল্যকার ঝড়-জলে স্নাত ও নির্ম্মল হইয়া প্রভাত-সূর্য্যকিরণে ঝল্‌মল্ করিতেছে। সিক্ত-স্নিগ্ধ রাজপথের উপর দিয়া বিগত-ক্লেশ পান্থ প্রফুল্লমুখে চলিতে সুরু করিয়াছে; কদাচিৎ দুই-একটা এক্কাগাড়ী ছোট ছোট ঘণ্টার শব্দে চারিদিক্ মুখরিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; মাঝে মাঝে রাখাল-বালকেরা গো-মহিষের দল লইয়া অদ্ভুত ও অসম্ভব আত্মীয়সম্বন্ধের অস্তিত্ব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া কোন্ গ্রামপ্রান্তে যাত্রা করিয়াছে; অদূরবর্ত্তী কোন এক কুটীর হইতে গমভাঙা যাঁতার শব্দে মিশিয়া হিন্দুস্থানী গৃহস্থ-বধূর অশ্রান্ত অপরিচিত সুর ভাসিয়া আসিতেছে। সবশুদ্ধ লইয়া এই যে একটি নূতন দিনের কর্ম্ম-স্রোত তাহার চেতনায় ধীরে ধীরে গতিশীল হইয়া উঠিতেছিল, ইহাই বিচিত্র প্রবাহে তাহার দুঃখ, তাহার দুর্ভাগ্য, তাহার দুশ্চিন্তা কিছুক্ষণের নিমিত্ত কোথায় যেন ভাসিয়া গিয়াছিল। ঠিক কিসের জন্য, কেন সে এখানে এ ভাবে বসিয়া, তাহার স্মরণ ছিল না। অকস্মাৎ মনে পড়িল, জন-দুই পল্লী-বালকের বিস্মিত দৃষ্টিপাতে! তাহারা আঙ্গিনার এক প্রান্ত হইতে শুধু বিস্ফারিত-চক্ষে নিঃশব্দে চাহিয়া ছিল। এই জীর্ণ মলিন পান্থশালার প্রাচীন দিনের গৌরব ইতিহাস ছেলে দুটার জানা ছিল না; কিন্তু তাহাদের জ্ঞান হওয়া অবধি এরূপ বিশিষ্ট অতিথির সমাগম যে এ গৃহে কখনো ঘটে নাই, তাহাদের নীরব চোখের চাহনি সে কথা স্পষ্ট করিয়া অচলাকে জানাইয়া দিল। ঘুম ভাঙিয়া নিত্য-নিয়মিত খেলা করিতে আসিয়া আজ সহসা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার তাহাদের চোখে পড়িয়া গিয়াছে।

অচলা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বোধ হয় কিছু প্রশ্ন করিতে

চাহিয়াছিল, কিন্তু ছেলে দুটা নিমিষে অন্তর্ধান হইয়া গেল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তাহার মনে পড়িল প্রায় ঘণ্টা-দুই পূর্ব্বে সেই যে সুরেশ কাপড় ছাড়িবার নাম করিয়া পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, আর দেখা দেয় নাই। এতক্ষণ ধরিয়া সে একাকী কি করিতেছে, জানিবার জন্য সে তখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সেই কক্ষের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল এবং অবরুদ্ধ কবাটের ভিতর হইতে কোন প্রকার সাড়া-শব্দ না পাইয়া সে মিনিট-দুই চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর আস্তে আস্তে দ্বার ঠেলিয়া সামনেই যাহা দেখিতে পাইল তাহাতে একই কালে মুক্তির তীব্র আবেগে ও বিকট ভয়ে ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহার সমস্ত দেহমন যেন পাষাণ হইয়া গেল। ঘরটা অন্ধকার, শুধু ওদিকের একটা ভাঙা জানালা দিয়া খানিকটা আলো ঢুকিয়া মেঝের উপর পড়িয়াছে। সেইখানে আলো-আঁধারের মধ্যে একান্ত অপরিচ্ছন্ন ধূলা-বালির উপরে সুরেশ চিৎ হইয়া শুইয়া আছে। তাহার গায়ে তখনও সেই সব জামা-কাপড়, শুধু কেবল খোলা ব্যাগটার ভিতর হইতে কতকগুলা জিনিষ-পত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো।

চক্ষের পলকে তাহার শেষ কথাগুলা অচলার মনে পড়িল, সে ডাক্তার, সে শুধু মানুষের জীবনটা ধরিয়া রাখিবার বিদ্যাই শিখিয়াছিল, তাহা নয়, তাহাকে নিঃশব্দে বাহির করিয়া দিবার কৌশলও তাহার অবিদিত ছিল না। মনে পড়িল, নিদারুণ ভুলের জন্য তাহার সেই উৎকট আত্মগ্লানি; মনে পড়িল, তাহার সেই বিদায় চাওয়া, সেই আশ্বাস দেওয়া—সর্ব্বোপরি তাহার সেই বারংবার প্রায়শ্চিত্ত করার নিষ্ঠুর ইঙ্গিত; সমস্তই একসঙ্গে এক নিশ্বাসে যেন ওই অবলুণ্ঠিত দেহটার কেবল একটিমাত্র পরিণামের কথাই তাহার কানে কানে কহিয়া দিল। সেইখানে সেই দ্বার ধরিয়া সে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল—তাহার এমন সাহস হইল না যে, আর ঘরে প্রবেশ করে।

কিন্তু এইবার ওই অচেতন দেহটার প্রতি চাহিয়া তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। যে তাহারই জন্য এত বড় দুর্নামের বোঝা মাথা লইয়া হতাশ্বাসে এমন করিয়া এই পৃথিবী হইতে চিরদিনের তরে বিদায় লইয়া গেল, অপরাধ তাহার যত গুরুতরই হোক, তাহাকে মার্জ্জনা করিতে পারে না, এত বড় কঠিন হৃদয় সংসারে অল্পই আছে; এবং আজই প্রথম তাহার কাছে তাহার নিজের অপরাধও সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল।

সুরেশের সহিত সেই প্রথম দিনের পরিচয় হইতে সে দিন পর্য্যন্ত যত কিছু কামনা-বাসনা, যত ভুল-ভ্রান্তি, যত মোহ, যত ছলনা, যত আগ্রহ-আবেগ উভয়ের মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে, সমস্ত একে একে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখা দিতে লাগিল। তাহার নিজের আচরণ, তাহার পিতার আচরণ—অকস্মাৎ সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া মনে হইল, শুধু কেবল নিজের নয়, অনেকের অনেক পাতকের গুরুভার বহন করিয়াই আজ সুরেশ যে বিচারকের পদপ্রান্তে গিয়া উপনীত হইয়াছে, সেখানে সে নিঃশব্দে মুখ বুজিয়া সমস্ত শাস্তি স্বীকার করিয়া লইবে, কিংবা একটি একটি করিয়া সকল দুঃখ, অভিযোগ ব্যক্ত করিয়া তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবে!

ওই লোকটির সংসার উপভোগ করিবার অনেক সাজ-সরঞ্জাম অনেক উপকরণই সঞ্চিত ছিল, তথাপি এই যে নীরবে, লেশমাত্র আড়ম্বর না করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, ইহার গভীর বেদনা অচলাকে আজ ফিরিয়া ফিরিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে যে যথার্থই প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল, সে কথা আজ ওই মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিবার, অবিশ্বাস করিবার আর এতটুকু অবকাশ রহিল না।

আবার তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া দর দর ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। গত রাত্রে গাড়ীর মধ্যে তাহাদের বিস্তর কঠিন কটু কথা, বিস্তর ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়-অন্যায়ের বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে সকল যে কত বড় অর্থহীন

প্রলাপ, অচলা তখন তাহার কি জানিত। ভালবাসার যে জাতি নাই, ধর্ম্ম নাই, বিচার-বিবেক ভাল-মন্দ বোধ কিছুই নাই, যে এমন করিয়া মরিতে পারে, সে যে এই সব সমাজের হাতে-গড়া আইন-কানুনের অনেক উপরে, এ সকল বিধি-নিষেধ যে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এই মরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ এ কথা সে অস্বীকার করিবে কেমন করিয়া ?

অচলা আঁচল দিয়া চোখ মুছিতেছিল, সহসা তাহার বুকের ভিতরটা ছ্যাৎ করিয়া মনে হইল, মৃতদেহটা যেন একটুখানি নড়িয়া উঠিল, এবং পরক্ষণেই একটা অস্ফুট আর্ত্তস্বরের সঙ্গে সুরেশ পাশ ফিরিয়া শুইল। সে মরে নাই—জীবিত আছে ; একটা প্রচণ্ড আগ্রহ-বেগে অচলা ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে পড়িল এবং ভগ্ন-কণ্ঠে কহিল, সুরেশবাবু !

আহ্বান শুনিয়া সুরেশ দুই আরক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

অচলাও আর কোন কথা বলিতে পারিল না, শুধু অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া অশ্রুর আকারে দুই চক্ষু দিয়া নিরন্তর ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের অশ্রুর সহিত এ অশ্রুর কতই না প্রভেদ !

অথচ তাহার সকল চিন্তার মধ্যে যে চিন্তাটা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত সঙ্গোপনে পীড়া দিতেছিল, তাহা ইহার বাস্তব দিকটা। এই অজানা অপরিচিত স্থানে সুরেশের মৃতদেহ লইয়া সে কি উপায় করিবে, কাহাকে ডাকিবে, কাহাকে বলিবে—হয় ত অনেক অপ্রীতিকর আলোচনা, অনেক কুৎসিত প্রশ্ন উঠিবে—সে তাহার কাহাকে কি জবাব দিবে, হয় ত পুলিসে টানাটানি করিয়া সকল কথা বাহির করিয়া আনিবে—সেই সকল অনাবৃত প্রকাশ্যতার লজ্জায় তাহার সমস্ত দেহ-মন যে অন্তরে অন্তরে কিরূপ পীড়িত, কিরূপ ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার

সমস্তটা বোধ করি সে নিজেও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে নাই। এখন সেই বিপদের অপরিমেয় লাঞ্ছনা হইতে অকস্মাৎ অব্যাহতি পাইয়া তাহার কান্না যেন আর থামিতে চাহিল না, এবং সে মরে নাই, শুধু ইহাতেই তাহার প্রতি অচলার সমস্ত হৃদয় কানায় কানায় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিলে, সুরেশ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কাঁদচ কেন অচলা?

অচলা ভগ্ন-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কেন তুমি এমন ক'রে শুয়ে রইলে? কেন গেলে না? কেন আমাকে এত ভয় দেখালে?

তাহার কণ্ঠস্বরে যে স্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তাহা এমনই করুণ, এমনই মধুর যে শুধু সুরেশের নয়, অচলার নিজের মধ্যেও কেমন এক প্রকার মোহের সঞ্চার করিল। সে পুনরায় কহিল, তোমার যদি এতই ঘুম পেয়েছিল, আমাকে বল্‌লে না কেন? আমি ত ওদিকের বড় ঘরটা পরিষ্কার ক'রে যা হোক কিছু পেতে তোমার একটা বিছানা তৈরি ক'রে দিতে পারতুম। ট্রেণের সময় হ'তে ত ঢের দেরি ছিল!

সুরেশ কোন জবাব দিল না, শুধু বিগলিত স্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া অচলার ডান হাতখানি তুলিয়া নিজের উত্তপ্ত ললাটের উপর রাখিয়া কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

অচলা চকিত হইয়া কহিল, এ যে ভয়ানক গরম। তোমার কি জ্বর হয়েছে না কি।

সুরেশ কহিল, হুঁ। তা ছাড়া এ জ্বর সহজে সারবে বলেও আমার মনে হয় না। বোধ হয়—

অচলা হাতখানি আস্তে আস্তে টানিয়া লইল, এবং প্রত্যুত্তরে তাহার মুখ দিয়াও এবার কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাসই পড়িল। তাহার উদ্বেলিত

সমস্ত স্নেহ-মমতা এক মুহূর্তে জমিয়া যেন পাথর হইয়া গেল। সহ্য করিবার, ধৈর্য্য ধরিবার তাহার যে কিছু শক্তি ছিল, সমস্ত একত্র করিয়া সে স্থির হইয়া আজিকার বেলাটুকু গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে, ইহাই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু এই অচিন্তনীয় ও অভাবিতপূর্ব্ব বিপদের মেঘে তাহার আশার ক্ষীণ রশ্মি-রেখাটুকু যখন নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তখন মৃত্যু ভিন্ন জগতে আর প্রার্থনীয় বস্তু তাহার দ্বিতীয় রহিল না।

ইহাকে এইভাবে এখানে একাকী ফেলিয়া যাওয়ার কথা সে কল্পনা করিতেও পারিল না; কিন্তু যাহার পীড়ার সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব, সমস্ত গুরুভার তাহার মাথায় পড়িল, তাহাকে লইয়া এই অপরিচিত স্থানে সে কি করিবে, কোথায় কাহার কাছে কি সাহায্য ভিক্ষা চাহিবে, কি পরিচয়ে মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে, অহর্নিশি কি অভিনয় করিবে, এই সকল চিন্তা বিদ্যুৎবেগে তাহার মাথায় প্রবাহিত হওয়ায় সে ছুটিয়া পলাইবে, না ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবে, না সজোরে মাথা কুটিয়া এই অভিশপ্ত জীবনের পালাটা হাতে হাতে চুকাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, ইহার কোনটারই যেন কূল-কিনারা পাইল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সে দিন ষ্টেশন হইতে পথে কিছু কিছু জলে ভিজিয়া কেদারবাবু সাত-আট দিন গাটের বাত ও সর্দ্দিজ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কন্যা-জামাতার কুশল-সংবাদের অভাবে অতিশয় চিন্তিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি জব্বলপুরের বন্ধুকে একখানা পোষ্টকার্ড লেখা ভিন্ন বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আজ তাহার জবাব আসিয়াছে। কেহই আসে নাই এবং তিনি কাহারও কোন খবর জানেন না, এইটুকু মাত্র

খবর দিয়াছেন। ছত্র কয়টি কেদারবাবু বার বার পাঠ করিয়া বিবর্ণ-মুখে শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া শুধু চশমার কাঁচদুটা ঘন ঘন মুছিতে লাগিলেন। তাহাদের কি হইল, কোথায় গেল, সংবাদের জন্য তিনি কাহাকে ডাকিবেন, কোথায় চিঠি লিখিবেন, কাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার সকল আপদে-বিপদে যে ব্যক্তি কায়মন দিয়া সাহায্য করিত সেই সুরেশও নাই, সে-ও সঙ্গে গিয়াছে।

ঠিক এমনি সময়ে বেহারা আসিয়া আর একখানি পত্র তাঁহার সুমুখেই রাখিয়া দিল। কেদারবাবু কোনমতে নাকের উপর চশমা-খানা তুলিয়া দিয়া ব্যগ্র হস্তে চিঠিখানি তুলিয়া দেখিলেন, চিঠি তাঁহার কন্যা অচলার নামে। মেয়েলি হাতের চমৎকার স্পষ্ট লেখা। এ পত্র কে লিখিল, কোথা হইতে আসিল, জানিবার আগ্রহে অপরের চিঠি খোলা-না-খোলার প্রশ্নও তাঁহার মনে আসিল না, তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া প্রথমেই লেখিকার নাম পড়িয়া দেখিলেন, লেখা আছে, 'তোমার মৃণাল।' তাহার পরে এখানিও তিনি আদ্যোপান্ত বার বার পাঠ করিয়া বাহিরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া চশমা মোছার কাজে লাগিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল তাহা জগদীশ্বর জানেন। বহুক্ষণে চশমা পরিষ্কারের কাজটা স্থগিত রাখিয়া পুনরায় তাহা যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া আর একবার চিঠিখানি আগাগোড়া পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। মৃণাল স্ত্রীর সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তীব্র মধুর বহুপ্রকার উপদেশ দিয়া শেষের দিকে লিখিয়াছে—

সেজদা তোমার সম্বন্ধে কিছুই বলেন না সত্য, জিজ্ঞাসা করিলেও ভয়ানক গম্ভীর হইয়া উঠেন বটে, কিন্তু আমি ত মেয়েমানুষ, আমি ত সব বুঝিতে পারি! আচ্ছা সেজদি, ঝগড়া বিবাদ কাহার না হয় ভাই? কিন্তু তাই বলিয়া এত অভিমান! তোমার স্বামী তাঁহার শরীর-

মনের বর্ত্তমান অবস্থায় না বুঝিয়া রাগ করিতেও পারেন, অধীর হইয়া অন্যায় করিয়া চলিয়া আসিতেও পারেন, কিন্তু তুমি ত এখনো পাগল হও নাই যে, তিনি যাই বলিতেই তুমি স্বচ্ছন্দে সায় দিয়া বলিলে, আচ্ছা, তাই হোক, যাও তোমার সেই বনবাসে। তাই আমি কেবল ভাবি সেজদি, কি করিয়া প্রাণ ধরিয়া তোমার মৃত-কল্প স্বামীটিকে এত সহজে এই বনের মধ্যে বিসর্জ্জন দিলে এবং দিয়া স্থির হইয়া এই সাত-আট দিন বলি কেন, সাত-আট বৎসর নিশ্চিন্ত মনে বাপের বাড়ি বসিয়া রহিলে! সত্য বলিতেছি, সেদিন যখন তিনি জিনিস-পত্র লইয়া বাড়ি ঢুকিলেন, আমি হঠাৎ চিনিতে পারি নাই! তোমাদের কেন ঝগড়া হইল, কবে হইল, কিসের জন্য পশ্চিমে যাওয়ার বদলে তিনি দেশে চলিয়া আসিলেন, এ সকল আমি কিছুই জানি না এবং জানিতে চাই না। কিন্তু আমার মাথার দিব্য রহিল তুমি পত্র-পাঠ মাত্র চলিয়া আসিবে। জানই ত ভাই, আমার শাশুড়ীকে ছাড়িয়া কোথাও যাইবার যো নেই। তবুও হয় ত আমি নিজে গিয়া তোমার পা ধরিয়া টানিয়া আনিতাম, যদি না সেজদা এতটা অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। একবার এস, একবার নিজের চোখে তাকে দেখ, তখন বুঝিবে, এই অসঙ্গত মান করিয়া কতদূর অন্যায় করিয়াছ! এ বাড়িও তোমার, আমিও তোমার, সেই জন্য এ বাড়িতে আসিতে কোন দ্বিধা করিবে না। তোমার পথ চাহিয়া রহিলাম, শ্রীচরণে শত কোটী প্রণাম। আর একটা কথা। আমার এই পত্র লেখার কথা সেজদা যেন শুনিতে না পান, আমি লুকাইয়া লিখিলাম। ইতি—তোমার মৃণাল।

পত্র শেষ করিয়া মৃণাল একটা পুনশ্চ দিয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছে যে, যেহেতু স্বামীর অনুপস্থিতে তুমি একটা বেলাও সুরেশবাবুর বাটীতে থাকিবে না জানি, তাই তোমার বাপের বাটীর ঠিকানাতে লিখিলাম। ভরসা করি, এ পত্র তোমার হাতে পড়িতে বিলম্ব হইবে না।

কেদারবাবুর হাত হইতে চিঠিখানা স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল, তিনি আর একবার শূন্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার চশমা মোছার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। এটুকু বুঝা গিয়াছে, মহিম জব্বলপুরের পরিবর্ত্তে এখন তাহার গ্রামে রহিয়াছে, এবং অচলা তথায় নাই। সে কোথায়, তাহার কি হইল, এ সকল কথা হয় মহিম জানে না, না হয় জানিয়াও প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে না।

হঠাৎ মনে হইল, সুরেশই বা কোথায়? সে যে তাহাদের অতিথি হইবে বলিয়া সঙ্গ লইয়াছিল। সে নিশ্চয়ই বাটীতে ফিরে নাই, তাহা হইলে একবার দেখা করিতই। তাহার পরে পিতার বুকের মধ্যে যে আশঙ্কা অকস্মাৎ শূলের মত আসিয়া পড়িল, সে আঘাতে তিনি আর সোজা থাকিতে পারিলেন না, সেই আরাম-কেদারাটায় হেলান দিয়া পড়িয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

দুপুর-বেলা দাসী সুরেশের বাটী হইতে সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, তাঁহার পিসিমা কিছুই জানেন না। কোন চিঠিপত্র না পাইয়া তিনিও অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া আছেন।

রাত্রে নিভৃত শয়ন-কক্ষে কেদারবাবু প্রদীপের আলোকে আর একবার মৃণালের পত্রখানি লইয়া বসিলেন। ইহার প্রতি অক্ষর তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন, যদি দাঁড়াইবার মত কোথাও এতটুকু জায়গা পাওয়া যায়। না হইলেও যে তিনি কোথায় গিয়া কি করিয়া মুখ লুকাইবেন, ইহা জানিতেন না। চিরদিন পুরুষানুক্রমে কলিকাতাবাসী; কলিকাতার বাহিরে কোথাও যে কোন ভদ্রলোক বাঁচিতে পারে, এ কথা তিনি ভাবিতে পারিতেন না। সেই আজন্ম-পরিচিত স্থান, সমাজ, চিরদিনের বন্ধু-বান্ধব সমস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া কোথাও অজ্ঞাতবাসে যদি শেষ-জীবনটা অতিবাহিত করিতেই হয়, তবে সেই দুঃসহ দুর্ভর দিন কয়টা যে কি করিয়া কাটিবে, সে তাঁহার চিন্তার

অতীত এবং কন্যা হইয়া যে দুর্ভাগিনী এই শাস্তির বোঝা তাহার রুগ্ন বৃদ্ধ পিতার অশক্ত শিরে তুলিয়া দিল, তাহাকে যে তিনি কি বলিয়া অভিশাপ দিবেন, তাহাও তাঁহার চিন্তার অতীত।

সারারাত্রির মধ্যে তিনি একবার চোখে-পাতায় করিতে পারিলেন না এবং ভোর নাগাদ তাঁহার অম্বলের ব্যথাটা আবার দেখা দিল; কিন্তু আজ যখন নিজের বলিয়া মুখ চাহিতে দুনিয়ায় আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন নির্জীবের মত শয্যাশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকিতেও তাঁহার ঘৃণা বোধ হইল। এত বড় বেদনাকেও আজ তিনি শান্তমুখে লুকাইয়া অন্যদিনের মত বাহিরে আসিলেন এবং রেলওয়ে ষ্টেশনের জন্য গাড়ী ডাকিতে পাঠাইয়া তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় গুছাইয়া লইতে বেহারাকে আদেশ করিলেন।

এই ধাক্কা এত খাওয়ার ব্যথাটা চোখে দেখিয়া তাহার মনের মধ্যে সূচ বিঁধিতে লাগিল।

সুরেশ ধনীর সন্তান এবং মহিমকে সে অকপটে ভালবাসিত। তাহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা, কোনমতে সে বন্ধুর একটা কাজে লাগে। কিন্তু মহিমকে সে কোন দিন সাহায্য লইতেই স্বীকার করাইতে পারে নাই—আজিও পারিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বছর-পাঁচেক পরে দুই বন্ধুতে এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল।

তোমার উপর আমার যে কতবড় শ্রদ্ধা ছিল মহিম, তা বলতে পারি না।

বলবার জন্য তোমাকে ত পীড়াপীড়ি করচি না সুরেশ।

সে শ্রদ্ধা বুঝি আর থাকে না।

না থাকলে তোমাকে দণ্ড দেব, এমন ভয় ত কখনও দেখাই নি।

তোমাকে কপটতা দোষ দিতে তোমার অতি-বড় শত্রুও কখনো পারত না।

শত্রু পারত না ব'লে কাজটা যে মিত্রও পারবে না, দর্শন-শাস্ত্রের এমন অনুশাসন ত নেই।

ছি ছি, শেষকালে কি না একটা ব্রাহ্ম-মেয়ের কাছে ধরা দিলে? কি আছে ওদের? ঐ শুকনো কাঠপানা চেহারা, বই মুখস্থ ক'রে ক'রে গায়ে কোথাও এক ফোঁটা রক্ত পর্যন্ত যেন নেই। ঠেলা দিলে আধখানা দেহ খসে পড়ছে ব'লে ভয় হয়—গলার স্বরটা পর্যন্ত এমনি চিঁচিঁ করে যে শুনলে ঘৃণা হয়।

তা হয় সত্য।

দেখ মহিম, ঠাট্টা কর গে তোমাদের পাড়াগাঁয়ের লোককে, ব্রাহ্ম-মেয়ে কখনো চোখে দেখে নি; মেয়েমানুষ ইংরাজীতে ঠিক লিখতে পারে শুনলে যারা আশ্চর্য্য অবাক হয়ে যায়—তিনি চ' গেলে যারা সসম্ভ্রম দূরে সরে দাঁড়ায়। বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে দ গে তোমার গ্রামের লোককে, যারা এঁকে দেব-দেবী মনে ক'রে মা লুটিয়ে দেবে। কিন্তু আমাদের বাড়ি ত পাড়াগাঁয়ে নয়—আমাদে ত অত সহজে ভুলানো যায় না।

আমি তোমাকে শপথ ক'রে বল্‌চি সুরেশ, তোমাদের সহরে লোককে ভুলোবার আমার কোন দুরভিসন্ধি নেই। আমি তাঁ আমাদের পাড়াগাঁয়ে নিয়েই রাখব। তাতে ত তোমার আপত্তি নাই

সুরেশ রাগিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, আপত্তি নেই? শ সহস্র, লক্ষ, কোটি আপত্তি আছে। তুমি সমস্ত জগতের বরেণ্য পূজনীয় হিন্দুর সন্তান হয়ে কি না একটা রমণীর মোহে জাত দেবে মোহ! একবার তার জুতো মোজা, সৌখীন পোষাক ছাড়িয়ে নি আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের রাঙা শাড়ীখানি পরিয়ে দেখ দেখি, মোহ কা কি না! তখন ঐ নির্জ্জীব কাঠের পুতুলটার রূপ দেখে তোমার ভাঙে কি না! কি আছে তার? কি পারে সে? বেশ ত, তোম যদি সেলাই আর পশমের কাজই এত দরকার, কলকাতা সহরে দর্জ্জি অভাব নেই। একখানা চিঠির ঠিকানা লেখবার জন্য ত তোমা ব্রাহ্ম-মেয়ের দ্বারস্থ হ'তে হবে না। তোমার অসময়ে সে কি বাট বেটে, কুটনো কুটে তোমাকে এক মুঠো ভাত রেঁধে দেবে? রো তোমার কি সেবা করবে? সে শিক্ষা কি তাদের আছে? ভগব না করুন, কিন্তু, সে দুঃসময়ে সে যদি না তোমাকে ছেড়ে চ' আসে ত আমার সুরেশ নামের বদলে যা ইচ্ছে ব'লে ডেক, আ দুঃখ করব না।

মহিম চুপ করিয়া রহিল। সুরেশ পুনরায় কহিতে লাগিল, মহিম, তুমি ত জান, আমি তোমার মঙ্গল ভিন্ন কখনো ভুলেও অমঙ্গল-কামনা করতে পারিনে। আমি অনেক ব্রাহ্ম-মহিলা দেখেছি। দু-একটি ভালও যে দেখি নি, তা নয়; কিন্তু আমাদের হিন্দুঘরের মেয়ের সঙ্গে তাঁদের তুলনাই হয় না। তোমার বিবাহেই যদি প্রবৃত্তি হয়েছিল, আমাকে বল্লে না কেন? আচ্ছা, যা হবার হয়েছে, আর তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নাই। আমি কথা দিচ্ছি, এক মাসের মধ্যে তোমাকে এমন কন্যা বেছে দেব যে, জীবনে কখনো দুঃখ পেতে হবে না; যদি না পারি, তখন না হয় তোমার যা ইচ্ছা করো—এর শ্রীচরণেই মাথা মুড়িও, আমি বাধা দেব না। কিন্তু এই একটা মাস তোমাকে ধৈর্য্য ধ'রে আমাদের আশৈশব বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখতেই হবে। বল রাখবে?

মহিম পূর্ব্ববৎ মৌন হইয়া রহিল—হাঁ, না, কোন কথাই কহিল না। কিন্তু বন্ধু যে বন্ধুর শুভকামনায় কিরূপ মর্ম্মান্তিক বিচলিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অনুভব করিল।

সুরেশ কহিল, মনে ক'রে দেখ দেখি মহিম, ব্রাহ্ম না হয়েও তুমি যখন প্রথম ব্রাহ্ম-মন্দিরে যাতায়াত সুরু করলে, তখন কি তোমাকে বারংবার নিষেধ করি নি? তোমার জন্যে এত বড় এই কলকাতা সহরের মধ্যে কি একটাও হিন্দু-মন্দির ছিল না যে, এই কপটতার কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল? এমনিতর একটা-না-একটা বিড়ম্বনার ভেতরে যে অবশেষে জড়িয়ে পড়বে, আমি তখনই সন্দেহ করেছিলাম।

মহিম এবার একটুখানি হাসিয়া কহিল, তা যেন করেছিলে, কিন্তু আমি ত তা করি নাই যে, আমার যাওয়ার মধ্যে কপটতা ছিল। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সুরেশ, তুমি ত নিজে ভগবান পর্য্যন্ত মান না,

যে হিন্দুর ঠাকুর-দেবতা মান্‌বে! আমি ব্রাহ্মের মন্দিরেই যাই, আর হিন্দুর মন্দিরেই যাই তাতে তোমার কি আসে যায়!

সুরেশ দৃপ্তস্বরে কহিল, যা নেই, তা আমি মানি নে। ভগবান্ নেই, ঠাকুর-দেবতা মিছে কথা। কিন্তু যা আছে, তাদের ত অস্বীকার করি নে! সমাজকে আমি শ্রদ্ধা করি, মানুষকে পূজা করি। আমি জানি, মানুষের সেবা করাই মনুষ্যজন্মের চরম সার্থকতা। যখন হিন্দুর বংশে জন্মেছি, তখন হিন্দুসমাজ রক্ষা করাই আমার কাজ। আমি প্রাণান্তে তোমাকে ব্রাহ্মঘরে বিবাহ ক'রে ব্রাহ্মের দল-পুষ্টি কর্‌তে দেব না। কেদার মুখুয্যের মেয়েকে বিবাহ কর্‌বে বলে কি কথা দিয়েছ?

না, কথা যাকে বলে, তা এখনও দিই নি।

দাও নি ত! বেশ! তবে চুপ ক'রে ব'সে থাক গে, আমি এই মাসের মধ্যেই তোমার বিবাহ দিয়ে দেব।

আমি বিবাহের জন্য পাগল হয়ে উঠেছি, তোমাকে কে বললে? তুমিও চুপ ক'রে ব'সে থাক গে, আর কোথাও বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কেন অসম্ভব? কি করেছ? এই স্ত্রীলোকটাকে ভালবেসেছ?

আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু এই ভদ্র-মহিলার সম্বন্ধে সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বল সুরেশ!

সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বল্‌তে আমি জানি, আমাকে শেখাতে হবে না। আমি সেই সম্ভ্রান্ত মহিলাটির বয়স কত জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি?

জানি না।

জান না? কুড়ি, পঁচিশ, ত্রিশ, চল্লিশ কিংবা আরও বেশি—কিছুই জান না?

না।

তোমার চেয়ে ছোট, না বড়—তাও বোধ করি জান না?

না।

যখন তোমাকে ফাঁদে ফেলেছেন, তখন নিতান্ত কচি হবে না—অনুমান করা বোধ করি অসঙ্গত নয়। কি বল?

না। তোমার পক্ষে কিছুই অসঙ্গত নয়। কিন্তু আমার এখন একটু কাজ আছে সুরেশ, একবার বাইরে যেতে চাই।

সুরেশ কহিল, বেশ ত মহিম, আমারও এখন কিছু কাজ নেই—চল, তোমার সঙ্গে একটু ঘুরে আসি।

দুই বন্ধুই পথে বাহির হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চলার পর সুরেশ ধীরে ধীরে কহিল, তোমাকে আজ যে ইচ্ছে করেই ব্যথা দিলাম, এ কথা বোধ করি বুঝিয়ে বল্‌বার প্রয়োজন নেই?

মহিম কহিল, না।

সুরেশ তেম্‌নি মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কেন দিলাম মহিম?

মহিম হাসিল। কহিল, পূর্ব্বেরটা যদি না বুঝালেও বুঝে থাকি, আশা করি, এটাও তোমাকে বুঝাতে হবে না।

তাহার একটা হাত সুরেশের হাতের মধ্যে ধরা ছিল। সুরেশ আর্দ্রচিত্তে তাহাতে ঈষৎ একটু চাপ দিয়া বলিল, না মহিম, তোমাকে বুঝাতে চাই না। সংসারে সবাই ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। তবু আজ আমি তোমার মুখের উপরেই বল্‌চি, তোমাকে আমি যত ভালবেসেছি, তুমি তার অর্দ্ধেকও পার নি। তুমি গ্রাহ্য কর না বটে, কিন্তু তোমার এতটুকু ক্লেশও আমি কোন দিন সইতে পারি না। ছেলে-বেলায় এই নিয়ে কত ঝগড়া হয়ে গেছে, একবার মনে ক'রে দেখ। এখন এতকাল পরে যার জন্যে আমাকেও পরিত্যাগ করছ মহিম, তাকে নিয়েই জীবনে সুখী হবে যদি নিশ্চয় জান্‌তাম, আমার সমস্ত দুঃখ আমি হাসিমুখে সহ্য করতে পারতাম, কখনও একটা কথা কইতাম না।

মহিম কহিল, তাঁকে নিয়ে সুখী না হ'তে পারি, কিন্তু তোমাকে ত্যাগ করব কেমন ক'রে জান্‌লে ?

তুমি কর, বা না কর, আমি তোমাকে ত্যাগ করব।

কেন ? আমি ত তোমার ব্রাহ্ম-বন্ধু হতেও পারতাম।

না, কোনমতেই না। ব্রাহ্মদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না— আমার ব্রাহ্ম-বন্ধু একটিও নেই।

তাদের দেখতে পার না কেন ?

অনেক কারণ আছে। একটা এই যে, যারা আমাদের সমাজকে মন্দ ব'লে ফেলে গেছে, তাদের ভাল ব'লে আমি কোনমতেই কাছে টানতে পারি না। তুমি ত জান, আমাদের সমাজের প্রতি আমার কত মমতা। সে সমাজকে যারা দেশের কাছে, বিদেশের কাছে, সকলের কাছে হেয় ব'লে প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের ভাল তাদের থা আমার তারা শত্রু।

মহিম মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল ; কহিল, এখন কি করতে বল তুমি ?

সুরেশ কহিল, তাই ত এতক্ষণ ধ'রে ক্রমাগত বল্‌চি।

আচ্ছা, আরও একবার বল।

এই যুবতীটির মোহ তোমাকে যেমন ক'রে হোক্‌ কাটাতে হবে। অন্ততঃ একটা মাস দেখা করতে পারবে না।

কিন্তু তাতেও যদি না কাটে ? যদি মোহের বড় আরও কিছু থাকে ?

সুরেশ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, ও সব আমি বুঝি না মহিম। আমি বুঝি, তোমাকে ভালবাসি ; এবং আরও কত বেশি ভালবাসি আমার আপনার সমাজকে। তবে একটিবার ভেবে দেখ, তোমার ছেলে-বেলার সেই বসন্তের কথাটা, আর মুঙ্গেরের গঙ্গায় নৌকা ডুবে যখন

দুজনেই মন্ত্রে বসেছিলাম। বিস্মৃত কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিলাম ব'লে আমাকে মাপ করো মহিম। আমার আর কিছু বল্‌বার নেই, আমি চল্‌লাম। বলিয়া সুরেশ অত্যন্ত অকস্মাৎ দ্রুতবেগে পিছন ফিরিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুরেশের একদিকে গায়ে জোর ছিল যেমন অসাধারণ, অন্যদিকে অন্তরটা ছিল তেমনি কোমল, তেমনি স্নেহশীল। পরিচিত-অপরিচিত কাহারও কোন দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিলে, তাহার কান্না আসিত। সে ছেলে-বেলায় কখনো একটা মশামাছি পর্য্যন্ত মারিতে পারিত না। জৈন ড়ওয়ারীদের দেখাদেখি, কতদিন সে পকেট ভরিয়া সুজি এবং চিনি লইয়া, স্কুল কামাই করিয়া, গাছতলায় গাছতলায় ঘুরিয়া পিপীলিকা-ভোজন করাইয়াছে। জীবনে কতবার যে মাছ-মাংস ছাড়িয়াছে এবং ধরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। যাহাকে ভালবাসিত, তাহার জন্য কি করিয়া যে কি করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইত না। স্কুলে মহিম ছিল ক্লাসের মধ্যে সকলের চেয়ে ভাল ছেলে। অথচ তাহার গায়ের জামা-কাপড় ছেঁড়া-খোঁড়া, পায়ের জুতা জীর্ণ পুরাতন, দেহটি শীর্ণ, মুখখানি ম্লান—এই সব দেখিয়াই সে তাহার প্রতি প্রথমে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই উভয়ের এই আকর্ষণ বন্যার জলের মত এম্‌নি বাড়িয়া উঠে যে, সমস্ত বিদ্যালয়ের ছেলেদের তাহা একটা আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। মহিম ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া, এই চারিটি টাকা মাত্র সম্বল করিয়া কলিকাতায় আসে এবং স্বগ্রামস্থ এক জন মুদীর দোকানে থাকিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হয়। এই সময় হইতেই সুরেশ অনেকপ্রকারে বন্ধুকে নিজের বাটীতে আনিয়া রাখিবার চেষ্টা করে;

কিছুতেই তাহাকে রাজী করাইতে পারে নাই। এইখানে থাকিয়াই মহিম কোনদিন আধপেটা খাইয়া, কোনদিন উপবাস করিয়া এণ্ট্রান্স পাশ করে। ইহার পরের ঘটনা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

সেই দিন হইতে সপ্তাহমধ্যে সুরেশ মহিমের দেখা না পাইয়া, তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল। বাসায় আসিয়া শুনিল, মহিম সেই যে সকালে বাহির হইয়াছে, এখনো ফিরে নাই। সে যে পটলডাঙ্গার কেদার মুখুয্যের বাটীতেই ছুটীর দিনটা কাটাইতে গিয়াছে, সুরেশের তাহাতে সংশয়মাত্র রহিল না।

যে নির্লজ্জ বন্ধু তাহার আশৈশব সখ্যের সমস্ত মর্য্যাদা সামান্য একটা স্ত্রীলোকের মোহে বিসর্জ্জন দিয়া সাতটা দিনও ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না—ছুটিয়া গেল, মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষের বহ্নি সুরেশের বুকের মধ্যে আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল বিচার না করিয়াই, গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া, সোজা পটলডাঙ্গার দিকে হাঁকাইতে কোচম্যান্‌কে হুকুম করিয়া দিল এবং মনে মনে বলিতে লাগিল, "ওরে বেহায়া! ওরে অকৃতজ্ঞ! তোর যে প্রাণটা আজ এই স্ত্রীলোকটাকে দিয়ে ধন্য হয়েছিস, সে প্রাণটা তোর থাকত কোথায়? নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে দুই-দুইবার কে তোকে তা ফিরিয়ে দিয়েছে? তার কি এতটুকু সম্মানও রাখতে নাই রে!"

কেদার মুখুয্যের বাড়ির গলিটা সুরেশের জানা ছিল, সামান্য দুই-একটা জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা গাড়ী ঠিক জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অবতরণ করিয়া সুরেশ বেহারাকে প্রশ্ন করিয়া সোজা উপরে বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। নিচে ঢালা বিছানার উপর এক জন বৃদ্ধ-গোছের ভদ্রলোক তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে-

ছিলেন ; তিনি চাহিয়া দেখিলেন, সুরেশ নমস্কার করিয়া নিজের পরিচয় দিল—আমার নাম শ্রীসুরেশচন্দ্র [illegible] মহিমের বাল্যবন্ধু।

বৃদ্ধ প্রতি-নমস্কার করিয়া [illegible] বলিলেন, বসুন।

সুরেশ আসন গ্রহণ করিয়া কহিল, মহিমের বাসায় এসে শুন্‌লাম, সে এখানেই আছে ; তাই মনে কর্‌লাম, এই সুযোগে মহাশয়ের সঙ্গেও একবার পরিচিত হয়ে যাই।

বৃদ্ধ বলিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য—আপনি এসেছেন। কিন্তু মহিমও এদিকে দশ-বারদিন আসেন নি। আমরা আজ সকালে ভাবছিলুম, কি জানি, তিনি কেমন আছেন ?

সুরেশ মনে মনে একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কিন্তু তার বাসার লোক যে বল্‌লে—

বৃদ্ধ কহিলেন, আর কোথাও গেছেন বোধ হয়। যা হোক, ভাল আছেন শুনে নিশ্চিন্ত হলেম।

পথে আসিতে আসিতে সুরেশ যে সকল উদ্ধত সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বৃদ্ধের সম্মুখে তাহাদের ঠিক রাখিতে পারিল না। তাঁহার শান্তমুখে ধীর-মৃদু কথাগুলি তাহার ভিতরের উত্তাপ অনেক পরিমাণে শীতল করিয়া দিল। তথাপি সে নিজের কর্ত্তব্যও বিস্মৃত হইল না। সে মনে মনে এই বলিয়া নিজেকে উত্তেজিত করিতে লাগিল যে, ইনি যত ভালই হোন্, ব্রাহ্ম ত বটে ! সুতরাং ইঁহার সমস্ত শিষ্টাচারই কৃত্রিম। ইহারা এমনি করিয়াই নির্ব্বোধ ভুলাইয়া নিজেদের কাজ আদায় করিয়া লয়। অতএব এই সমস্ত শীকারী প্রাণীদের সম্মুখে কোনমতেই আত্মবিস্মৃত হইয়া কাজ ভুলিলে চলিবে না—যেমন করিয়াই হোক, ইহাদের গ্রাস হইতে বন্ধুকে মুক্ত করিতে হইবে। সে কাজের কথা পাড়িল ; কহিল, মহিম আমার ছেলে-বেলার বন্ধু। এমন বন্ধু আমার

আর নেই। যদি অনুমতি করেন, তাঁর সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে দুই-একটা কথার আলোচনা করি।

বৃদ্ধ একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, স্বচ্ছন্দে করতে পারেন। আপনার নাম আমি তাঁর মুখে শুনেছি।

সুরেশ কহিল, মহিমের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে?

বৃদ্ধ কহিলেন, হাঁ, সে এক রকম স্থির বৈ কি।

সুরেশ কহিল, কিন্তু মহিম ত আপনাদের ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত নয়। তবুও বিবাহ দেবেন?

বৃদ্ধ চুপ করিয়া রহিলেন। সুরেশ কহিল, আচ্ছা সে কথা এখন থাক। কিন্তু তার কিরূপ সঙ্গতি, স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করবার যোগ্যতা আছে কি না, পাড়াগাঁয়ে বরুদ্ধ হিন্দু-সমাজের মধ্যে ভাঙা মেটে-বাড়ির মধ্যে আপনার কন্যা বাস করতে পারবেন কি না, না পারলে তখন মহিম কি উপায় করবে, এই সকল চিন্তা করে দেখেছেন কি?

বৃদ্ধ কেদার মুখুয্যে একেবারে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, কই, এ সকল ব্যাপার ত আমি শুনি নি। মহিম কোন দিন ত এ সব কথা বলেন নি?

সুরেশ কহিল, কিন্তু আমি এ সকল চিন্তা ক'রে দেখেছি, মহিমকে বলেছি এবং আজ এই সকল অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার জন্যেই আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আপনার কন্যার বিষয় আপনি চিন্তা করবেন; কিন্তু আমার পরম বন্ধু যে এই দারিদ্র্য কাঁধে নিয়ে অসহ্য ভারে চিরদিন জীবন্মৃত হয়ে থাকবেন, সে ত আমি কোনমতেই ঘটতে দিতে পারি নে।

কেদারবাবু পাংশুমুখে কহিলেন, আপনি বলেন কি সুরেশবাবু?

বাবা?—একটী সতেরো-আঠারো বৎসরের মেয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া

পিতার কাছে এক জন অপরিচিত যুবককে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থামিয়া গেল।

কে, অচলা? এস মা, ব'স। লজ্জা কি মা; ইনি আমাদের মহিমের পরম বন্ধু!

মেয়েটি একটুখানি অগ্রসর হইয়া হাত তুলিয়া সুরেশকে নমস্কার করিল। সুরেশ দেখিল, মেয়েটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে পাতলা গঠন। কপোল, চিবুক, ললাট—সমস্ত মুখের ডৌলটিই অতিশয় সুশ্রী এবং সুকুমার। চোখ দুটির দৃষ্টিতে একটি স্থির-বুদ্ধির আভা। নমস্কার করিয়া সে অদূরে উপবেশন করিল। সুরেশ তাহার মুখের পানে চাহিয়া চক্ষের পলকে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার পিতা বলিয়া উঠিলেন, মহিমের ব্যাপারটা শুনেছ মা? আমরা ভেবে মরছিলাম, সে আসে না কেন? ঐ শোন! ইনি পরম বন্ধু ব'লেই ত কষ্ট ক'রে জানাতে এসেছিলেন, নইলে কি হ'ত বল ত? কে জানত, সে এমন বিশ্বাসঘাতক, এমন মিথ্যাবাদী। তার পাড়াগাঁয়ে শুধু একটা মেটে ভাঙ্গা-বাড়ি। তোমাকে খাওয়াবে কি—তার নিজেরই মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান নেই। উঃ—কি ভয়ানক! এমন লোকের মনের মধ্যেও এত বিষ ছিল অ্যাঁ!

কথা শুনিয়া অচলার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, কিন্তু সুরেশের মুখের উপরেও কে যেন কালি লেপিয়া দিল। সে নির্ব্বাক্ কাঠের পুতুলের মত মেয়েটির পানে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুরেশের একবার মনে হইল, তাহার নিষ্ঠুর সত্য অচলার বুকের ভিতর গিয়া যেন গভীর হইয়া বিঁধিল। কিন্তু পিতা সে দিকে দৃক্‌পাতও করিলেন না। বরঞ্চ কন্যাকেই ইঙ্গিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, সুরেশ-বাবু, আপনি যে প্রকৃত বন্ধুর কর্ত্তব্য করতে এসেছেন, একথা আমরা

কেউ যেন ভ্রমেও না অবিশ্বাস করি। হোক্ না অপ্রিয়, হোক্ না কঠোর, কিন্তু তবুও এই যথার্থ ভালবাসা। মা যখন তাঁর পীড়িত শিশুকে অন্ন থেকে বঞ্চিত করেন, সে কি তাঁর কঠোর ঠেকে না? কিন্তু তবু ত সে কাজ তাঁকে কর্‌তে হয়! সত্য বল্‌চি সুরেশবাবু! মহিম যে আমাদের প্রতি এত বড় অন্যায় কর্‌তে পারেন, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। বছর-দুই পূর্ব্বে সমাজে যখন তাঁর কথায় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে আমি নিজেই তাঁকে সসম্মানে বাড়িতে ডেকে এনে অচলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই; সে কি এমনি ক'রেই তার প্রতিফল দিলে! উঃ—এত বড় প্রবঞ্চনা আমার জীবনে দেখি নি! বলিয়া কেদারবাবু ভিতরের আবেগে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিলেন। সুরেশ এবং অচলা উভয়েই নীরবে এবং অধোমুখে বসিয়া রহিল। কেদারবাবু হঠাৎ একসময়ে দাঁড়াইয়া পড়িয়া, মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না মা অচলা, এ চল্‌বে না। কোনমতেই না। সুরেশবাবু, আপনি যেমন কর্ত্তব্য সকলের উপরে রেখে বন্ধুর কাজ করতে এসেছেন, আমিও সেই কর্ত্তব্যকেই সুমুখে রেখে পিতার কাজ করব। অচলার সঙ্গে মহিমের সম্বন্ধটা যতদূর অগ্রসর হয়েচে, তাতে যদি বিনা প্রমাণে আমার বাড়ির দরজা তার মুখের উপর বন্ধ ক'রে দিই, ঠিক হবে না। সেই জন্য একটা প্রমাণ চাই। আপনি মনে করবেন না সুরেশবাবু, আপনার কথায় আমরা বিশ্বাস কর্‌তে পারি নি; কিন্তু এটাও আমার কর্ত্তব্য। কি, মা অচলা! একটা প্রমাণ নেওয়া আমাদের উচিত কি না?

উভয়েই তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল, উচিত অনুচিত কোন মন্তব্যই কেহ প্রকাশ করিল না। কেদারবাবু ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়াই বলিলেন, কিন্তু এ প্রমাণের ভার আপনারই উপর সুরেশবাবু। মহিমের সাংসারিক অবস্থা জানা ত দূরের কথা, কোন্ গ্রামে যে তার বাড়ি তাই আমরা জানি নে।

বেহারা আসিয়া জানাইল, নিচে বিকাশবাবু অপেক্ষা করিতেছেন।

সংবাদ শুনিয়া কেদারবাবু শুষ্ক হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আজ ত তাঁর আসবার কথা ছিল না। আচ্ছা, বল গে, আমি যাচ্চি। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, সুরেশবাবু, আমাকে মিনিট-পাঁচেক মাপ করতে হবে—লোকটাকে বিদায় ক'রে আসি। যখন এসেছে, তখন দেখা না ক'রে ত নড়বে না। মা অচলা, সুরেশবাবুকে আমাদের পরম বন্ধু ব'লে মনে করবে। যা তোমার জানবার প্রয়োজন, এঁর কাছে জেনে নাও—আমি এলাম ব'লে। বলিয়া তিনি নিচে নামিয়া গেলেন।

তখন মুহূর্তকালের জন্য চোখাচোখি করিয়া উভয়েই মাথা হেঁট করিল। সুরেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমরা উভয়ে আশৈশব বন্ধু। কিন্তু তার ব্যবহারে আপনাদের কাছে আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

অচলা মৃদুকণ্ঠে কহিল, তাঁর জন্যে আপনার কোন লজ্জার কারণ নেই!

সুরেশ কহিল, আপনি বলেন কি! তার এই কপট আচরণে, এই পাষণ্ডের মত ব্যবহারে আমি বন্ধু হয়ে যদি লজ্জা না পাই ত আর কে পাবে বলুন দেখি? কিন্তু তখনই ত আমার বোঝা উচিত ছিল যে, সে যখন আমাকেই আগাগোড়া গোপন ক'রে গেছে, তখন ভিতরে কোথাও একটা বড় রকমের গলদ আছেই।

অচলা কহিল, আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের। কিন্তু আপনি এ সমাজের কোন লোকের কোন সংস্রবে থাকতে চান না ব'লেই বোধ করি তিনি আমাদের উল্লেখ আপনার কাছে করেন নি।

কথাটা সুরেশের ভাল লাগিল না। অচলা যে তাহারই মুখের উপর মহিমের দোষ-ক্ষালনের চেষ্টা করিবে, ইহা সে ভাবে নাই। শুষ্ক-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, এ খবর আপনি মহিমের কাছে শুনেচেন আশা করি।

অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, তিনিই একদিন বলেছিলেন।

সুরেশ বলিল, আমার দোষের কথা সে বল্‌তে ভোলে নি দেখ্‌চি।

অচলা ম্লান ভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, এ আর দোষের কথা কি? সকল মানুষের প্রবৃত্তি এক রকমের নয়। যারা আপনাদের সংস্রব ছেড়ে চ'লে গেছে, তাদের যদি আপনাদের ভাল না লাগে ত আমি দোষের মনে কর্‌তে পারি নে।

এই উত্তরটা যদিচ সুরেশের মনের মত, এবং আর কোথাও শুনিলে হয় ত সে লাফাইয়া উঠিত, কিন্তু এই সংযতবাদিনী, তরুণী ব্রাহ্ম-মহিলার মুখ হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি তাহার একান্ত বিতৃষ্ণার কথা শুনিয়া আজ তাহার কিছুমাত্র আনন্দোদয় হইল না। বস্তুতঃ এই সব দলাদলির মীমাংসা শুনিতে সে কথাটা বলেও নাই। বরঞ্চ প্রত্যুত্তরে নিজের সম্বন্ধে ইহাও জানিতে চাহিয়াছিল, মহিমের মুখ হইতে তাহার আর কোন সদ্‌গুণের বিবরণ তাহার কানে গিয়াছে কিনা অচলা বোধ করি এই প্রচ্ছন্ন অভিলাষ অনুমান করিতে পারিল না; তাই প্রশ্নটার সোজা জবাব দিয়াই চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, আপনাদের প্রতি আমার সামাজিক বিদ্বেষ আছে কি না, সে আলোচনা মহিম করুক; কিন্তু তার ওপর আমার যে লেশমাত্র বিদ্বেষ নেই, এ কথাটা আপনি আমার মুখ থেকেও অবিশ্বাস কর্‌বেন না। তবুও হয় ত আমি তার সাংসারিক প্রসঙ্গ এখানে তুল্‌তে আস্‌তাম না—যদি না সে আমার কাছে সে দিন সত্য কথাটা অস্বীকার কর্‌ত।

অচলা সুরেশের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া অবিচলিত স্বরে কহিল, কিন্তু তিনি ত কখনই মিথ্যা বলেন না।

এইবার সুরেশ বাস্তবিকই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মেয়েমানুষের মুখ দিয়া যে এমন শান্ত অথচ দৃঢ় প্রতিবাদ বাহির হইতে পারে, ক্ষণকাল ইহা যেন ভাবিয়াই পাইল না। কিন্তু সে ঐ মুহূর্ত্তকালের জন্য। জীবনে

সে সংযমশিক্ষা করে নাই ; তাই পরক্ষণেই আত্মবিস্মৃত হইয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, আমাকে মাপ করবেন, কিন্তু সে আমার বাল্যবন্ধু। আপনার চেয়ে তাকে আমি কম জানি নে। এখানে নিজেকে আবদ্ধ ক'রে স্পষ্ট অস্বীকার করাটাকে আমি সত্যবাদিতা বল্‌তে পারি নে।

অচলা তেমনি শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, তিনি ত এখানে নিজেকে আবদ্ধ করেন নি।

সুরেশ কহিল, আপনার বাবা ত তাই বল্‌লেন। তা ছাড়া নিজের হীন অবস্থা আপনাদের কাছে গোপন করাটাকেও ঠিক সত্যপ্রিয়তা বলা চলে না। স্ত্রীপুত্রপ্রতিপালন করবার অক্ষমতা অপরের কাছে না হোক্, অতঃপর আপনার কাছেও ত তার অকপটে প্রকাশ করা উচিত ছিল।

অচলা নীরব হইয়া রহিল। সুরেশ বলিতে লাগিল, আপনি যে এত ক'রে তার দোষ ঢাকচেন, আপনিই বলুন দেখি, সমস্ত কথা পূর্ব্বাহ্ণে জান্‌তে পারলে কি তাকে এতটা প্রশ্রয় দিতে পারতেন ?

অচলা তেম্‌নি নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার কাছে কোন প্রকার জবাব না পাইয়া সুরেশ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিতে লাগিল, আমার কাছে সে নিজের মুখে স্বীকার করেছে যে, এই কল্‌কাতা সহরে আপনাকে প্রতিপালন করবার তার সাধ্যও নেই, সঙ্কল্পও নেই। তার সেই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গ্রামে একটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ হিন্দু-সমাজের মধ্যে সে যে আপনাকে একখানা অস্বচ্ছল ভাঙা মেটে-বাড়িতে টেনে নিয়ে যেতে চায়, সে কথা কি আপনাকে তার বলা কর্ত্তব্য নয় ? এত দুঃখ আপনি সহ্য করতে প্রস্তুত কি না, এও কি জিজ্ঞাসা করা সে আবশ্যক বিবেচনা করে না ? বলিয়া উত্তরের জন্য চোখ তুলিয়া দেখিল, অচলা চিন্তিত, অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। জবাব না পাইলেও সুরেশ বুঝিল, তাহার কথায় কাজ হইয়াছে। কহিল, দেখুন, আপনার কাছে এখন আমি

সত্য কথাই বল্‌ব। আজ আমি আমার বন্ধুকে বাঁচাবার সঙ্কল্প করেই শুধু এসেছিলুম—সে বিপদে না পড়ে, এই ছিল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু এমন দেখ্‌ছি, তাকে বাঁচানোর চেয়ে আপনাকে বাঁচানো আমার ঢের বেশি কর্ত্তব্য। কারণ, তার বিপদ ইচ্ছাকৃত, কিন্তু আপনি ঝাঁপ দিচ্চেন অন্ধকারে। এইমাত্র আপনার বাবা যখন আমাকেই প্রমাণ করবার ভার দিলেন, তখন মনে হয়েছিল, বন্ধুর বিরুদ্ধে এ ভার আমি গ্রহণ করব না ; কিন্তু এখন দেখছি, এ কাজ আমাকে করতেই হবে—না করলে অন্যায় হবে।

অচলা কহিল, কিন্তু তিনি শুনলে কি দুঃখিত হবেন না ?

সুরেশ কহিল, উপায় নেই। যে লোক পাষণ্ডের মত আপনাকে এত বড় প্রবঞ্চনা করেচে, বন্ধু হ'লেও তার সুখ-দুঃখ চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করি নে। কিন্তু বিপদ হয়েচে এই যে, আমি তাদের গ্রামের নামটাও জানি নে। কোন উপায়ে আজ যদি সেইটে মাত্র জান্‌তে পাই, কাল সকালেই নিজে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হব এবং সমস্ত প্রমাণ টেনে এনে আপনার বাবার সম্মুখে উপস্থিত ক'রে বন্ধুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

অচলা কহিল, কিন্তু আপনি কেন এত কষ্ট করবেন ? বাবাকে বলুন না, তিনি তাঁর বিশ্বাসী কোন লোক দিয়ে সমস্ত সংবাদ এনে নিন্ ; চব্বিশ-পরগণার রাজপুর গ্রাম ত বেশি দূর নয়।

সুরেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, রাজপুর! তা হ'লে গ্রামের নামটা যে আপনি জানেন দেখচি! আর কিছু জানেন ?

অচলা সহজভাবে কহিল, আপনি যা বল্‌লেন, আমিও ঐটুকু জানি। রাজপুরের উত্তরপাড়ায় একখানি মেটে-বাড়ি আছে। ভিতরে গুটি-তিনেক ঘর বাইরে চণ্ডীমণ্ডপ—তাতে গ্রামের পাঠশালা বসে।

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, মহিমের সাংসারিক অবস্থা ?

অচলা কহিল, সে বিষয়েও আপনি যা বল্‌লেন, তাই। সামান্য কিছু সম্পত্তি আছে, তাতে কোনমতে দুঃখ-কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন চলে মাত্র।

সুরেশ কহিল, আপনি ত তা হ'লে সমস্তই জানেন দেখ্‌চি।

অচলা কহিল, এইটুকু জানি, কারণ এইটুকুই তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম। আর আপনি ত জানেন, তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না।

সুরেশ সমস্ত মুখ কালিবর্ণ করিয়া কহিল, যখন সমস্তই জানেন, তখন আপনাদের সতর্ক করতে আসাটা আমার পক্ষে নিতান্তই একটা বাহুল্য কাজ হয়েচে। দেখ্‌চি, আপনাকে সে ঠকাতে চায় নি।

অচলা কহিল, আমি কিছু কিছু জানি বটে, কিন্তু আপনি ত আমাকে জানাতে আসেন নি; আপনি যাঁকে জানাতে এসেছিলেন, তিনি এখনো জানেন না। তবে যদি বলেন, আমি যতটুকু জানি, বাবাকে জানাতে পারি।

সুরেশ উদাস-কণ্ঠে কহিল, আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে গিয়ে মহিমকে সমস্ত কথা জানিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তবে আমি স্থির হ'তে পার্‌ব।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, তার কি কিছু আবশ্যক আছে?

সুরেশ পুনরায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কহিল, আবশ্যক নেই? না জেনে তার ওপর যে সকল মিথ্যা দোষারোপ আজ করেচি, সে অপরাধ আমার কত বড়, আপনি কি মনে মনে তা বোঝেন নি? তাকে জুয়াচোর, মিথ্যাবাদী কিছু বল্‌তেই বাকি রাখি নি—এ সকল কথা তার কাছে স্বীকার না ক'রে কেমন ক'রে আমি পরিত্রাণ পাব?

অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, বরঞ্চ আমি বলি এ সবের কিছুই দরকার নেই সুরেশবাবু! মনে মনে ক্ষমা চাওয়ার চেয়ে প্রকাশ্যে চাওয়াই যে সকল সময়ে সব চেয়ে বড় জিনিস, এ আমি স্বীকার

করি নে। তিনি শুনতে পেলেই যখন ব্যথা পাবেন, তখন কাজ কি তাঁকে শুনিয়ে? আমি বাবাকেও বরঞ্চ নিষেধ ক'রে দেব, যেন আপনার কথা তাঁকে না বলেন।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা। তার পরে অচলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমি একটা জিনিস বরাবর লক্ষ্য করেচি যে, মহিম কোন কারণেই এতটুকু ব্যথা না পায়, এই আপনার একমাত্র চেষ্টা। বেশ তাই হোক, আমি তাকে কোন কথাই বলব না। আজ তার সম্বন্ধে আমার মনে যত কথা উঠচে, তাও বলতে চাই নে, কিন্তু আপনাকে একটা কথা না ব'লে কিছুতেই বিদায় হ'তে পারচি নে।

অচলা স্নিগ্ধ চক্ষু দুটি তুলিয়া কহিল, বেশ, বলুন।

সুরেশ কহিল, তার কাছে ক্ষমা চাইতে পেলুম না, কিন্তু আপনার কাছে চাইচি, আমায় মাপ করুন। বলিয়া সে হঠাৎ দুই হাত যুক্ত করিল।

ছি ছি, ও কি করেন! বলিয়া অচলা চক্ষের নিমিষে হাত দুটি ধরিয়া ফেলিয়াই তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিয়া কহিল, এ কি বিষম অন্যায় বলুন ত! বলিতে বলিতেই তাহার সমস্ত মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

সুরেশের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই আশ্চর্য্য স্পর্শ, সলজ্জ মুখের অপরূপ রক্তিমদীপ্তি চক্ষের পলকে তাহাকে একেবারে অবশ করিয়া ফেলিল। সে অচলার অবনত মুখের পানে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কহিল, না, আমি কোন অন্যায় করি নি। বরঞ্চ আমার সহস্র-কোটি অন্যায়ের মধ্যে যদি কোন ঠিক কাজ হয়ে থাকে ত সে এই। আপনি ক্ষমা করলেই আমার মনের সমস্ত ক্ষোভ ধুয়ে-মুছে যাবে।

অচলা কাতর হইয়া কহিল আপনি অমন কথা কিছুতে বলবেন না। যাঁকে দু'দুবার মৃত্যুর গ্রাস থেকে ফিরিয়ে এনেচেন—

তাও শুনেচেন?

শুনেচি। আপনার মত সুহৃৎ তাঁর আর কে আছে ?

না, বোধ হয়, আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। আর সেই সুবাদে আমরা দুজন—

অচলার মুখের উপর আবার একটুখানি রাঙা আভা দেখা দিল। সে কহিল, হাঁ, বন্ধু। আপনি তাঁকে মরণের পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। তাই তাঁর সম্বন্ধে আপনার কোন কাজই আমি অন্যায় ব'লে ভাবতে পারি নে। মনের মধ্যে কোন ক্ষোভ, কোন লজ্জা আপনি রাখবেন না—ক্ষমা কথাটা উচ্চারণ কর্‌লে আপনার যদি তৃপ্তি হয়, আমি তাও বল্‌তে রাজী ছিলুম, যদি না আমার মুখে বাধ্‌ত।

আচ্ছা, কাজ নেই! বলিয়া সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনার বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল না, তিনি বোধ হয় ব্যস্ত আছেন। মহিমের সঙ্গে হয় ত আবার কোন দিন আস্‌তেও পারি। নমস্কার!

অচলা একটুখানি হাসিয়া কহিল, নমস্কার। কিন্তু তাঁর সঙ্গেই যে আস্‌তে হবে, এর ত কোন মানে নেই।

সত্যি বল্‌চেন ?

সত্যি বল্‌চি।

আমার পরম সৌভাগ্য! বলিয়া সুরেশ আর একবার নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাহিরে আসিয়া যেন নেশার মত তাহার সমস্ত দেহ-মন টলিতে লাগিল। আকাশের খর রৌদ্র তখন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল; সে গাড়ী ফিরাইয়া দিয়া একাকী পদব্রজে বাহির হইয়া পড়িল; ইচ্ছা, কলিকাতার জনাকীর্ণ কোলাহলময় রাজপথের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ মগ্ন করিয়া দিয়া অবস্থাটা একবার ভাবিয়া লয়।

অচলার মুখ, অবয়ব, ভাষা, ব্যবহার, সমস্তই তাহার সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ মনে পড়িয়া নিজেকে যেন ছোট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সে মুখে সৌন্দর্য্যের অলৌকিকত্ব ছিল না; কথায়, ব্যবহারে, জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধির অপরূপত্ব কোথাও এতটুকু প্রকাশ পায় নাই; তথাপি কেমন করিয়া যেন কেবলই মনে হইতে লাগিল, এমন একটা বিস্ময়কর বস্তু এইমাত্র সে দেখিয়া আসিয়াছে, যাহা এত দিন কোথাও তাহার চোখে পড়ে নাই। পথে চলিতে চলিতে আপনাকে আপনি অনুক্ষণ এই প্রশ্নই করিতে লাগিল—এ বিস্ময় কিসের জন্য? কিসে তাহাকে আজ এতখানি অভিভূত করিয়া দিয়াছে?

এই তরুণীর মধ্যে এমন কোন জিনিস আজ সে দেখিতে পাইয়াছে, যাহাতে আপনাকে আপনি দীন মনে করিয়াও তাহার সমস্ত অন্তরটা কি এক অপরিজ্ঞাত সার্থকতায় ভরিয়া গিয়াছে! ঐ মেয়েটির সত্যকার কোন পরিচয়ই এখনো তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই বটে, কিন্তু সে যে বড়, অনেক বড়, তাহাকে লাভ করা যে-কোন পুরুষের পক্ষেই যে দুর্ভাগ্য নয়, এ সংশয় একটিবারও তাহার মনে উদয় হয় না কেন? ভাবিতে-ভাবিতে হঠাৎ এক সময়ে তাহার চিন্তার ধারা ঠিক জায়গাটিতে আঘাত করিয়া বসিল। তাহার মনে হইল, এই যে মেয়েটি শিক্ষায়, জ্ঞানে, বয়সে, হয় ত সকল বিষয়েই তাহার অপেক্ষা ছোট হইয়াও এই দণ্ড-কয়েকের আলাপেই তাহাকে এমন করিয়া পরাজিত করিয়া ফেলিল, সে শুধু তাহার অসাধারণ সংযমের বলে। তাই সে এত শান্ত হইয়াও এত দৃঢ়, এত জানিয়াও এমন নির্ব্বাক। মহিমের সম্বন্ধে সে নিজে যখন প্রগল্‌ভের মত অবিশ্রাম বকিয়া গিয়াছে, তখন এই মেয়েটি অধোমুখে শুনিয়াছে, সহিয়াছে, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও চঞ্চল হইয়া তর্ক করিয়া, কলহ করিয়া, আপনাকে লঘু করে নাই। সর্ব্বক্ষণই আপনাকে দমন করিয়াছে,

গোপন করিয়াছে, অথচ কিছুই তাহার অবিদিত ছিল না। মহিমকে সে যে কতখানি ভালবাসে, তাহা জানিতে দিল না সত্য, কিন্তু তাহার অবিচলিত শ্রদ্ধা যে কিছুতেই তিলার্দ্ধ ক্ষুণ্ণ হয় নাই, সে কথা কতই না সহজে সংক্ষেপে জানাইয়া দিল।

এ বিদ্যা যে মহিমের কাছেই শেখা এবং ভাল করিয়াই শেখা, এ কথা সে বহুবার আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল; এবং তাহার নিজের মধ্যে শিশুকাল হইতেই সংযম জিনিসটার একান্ত অভাব ছিল বলিয়া, ইহারই এতখানি প্রাচুর্য্য আর এক জনের মধ্যে দেখিতে পাইয়া তাহার শিক্ষিত ভদ্র অন্তঃকরণ আপনা-আপনিই এই গৌরবময়ীর পদ-তলে মাথা নত করিয়া ধন্য বোধ করিল।

অনেক রাস্তা গলি ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া, সুরেশ সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিল। বসিবার ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, মহিম চোখের উপর হাত চাপা দিয়া একটা কোচের উপর পড়িয়া আছে, উঠিয়া বসিয়া কহিল, এস সুরেশ।

এই যে! বলিয়া সুরেশ ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া একটা চৌকি টানিয়া বসিল।

মহিম কালে-ভদ্রে আসে। সুতরাং সে আসিলেই সুরেশের অভ্যর্থনা কিঞ্চিৎ উগ্র হইয়া উঠিত। আজ কিন্তু তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথাই বাহির হইল না। মহিম মনে মনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, বাসায় ফিরে এসে শুনি, তুমি গিয়েছিলে। তাই মনে করলুম—

দয়া ক'রে একবার দেখা দিয়ে আসি। না হে! কতদিন পরে এলে, মনে করতে পার?

মহিম হাসিয়া কহিল, পারি। কিন্তু সময় ক'রে উঠতে পারি নি যে। বলিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল, গ্যাসের আলোকে সুরেশের মুখের চেহারা অত্যন্ত ম্লান এবং কঠিন দেখাইতেছে। তাহাকে প্রসন্ন করিবার

অভিলাষে স্নিগ্ধস্বরে পুনরায় কহিল, তোমার রাগ হ'তে পারে, এ আমি হাজার বার স্বীকার করি সুরেশ। কিন্তু বাস্তবিক সময় পাই নে। আজকাল পড়াশুনার চাপও একটু আছে, তা ছাড়া সকালে-বিকালে গোটা-দুই টিউসনি—

আবার টিউসনি নেওয়া হয়েছে ?

মহিম তাহার ঠিক জবাবটা এড়াইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে খুঁজেছিলে, বিশেষ কিছু দরকার ছিল কি ?

সুরেশ কহিল, হুঁ। তুমি আজ না এলে আমাকে আবার কাল সকালে যেতে হ'ত।

মহিম কারণ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসু মুখে চাহিয়া রহিল। সুরেশ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে তাহার পায়ের জুতা-জোড়ার পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তুমি এর মধ্যে বোধ করি কেদারবাবুর বাড়িতে আর যাও নি ?

মহিম কহিল, না।

কেন যাও নি, আমার জন্যে ত ? আচ্ছা, তোমার সেই প্রতিশ্রুতি থেকে তোমাকে আমি মুক্তি দিলুম। তোমার ইচ্ছামত সেখানে যেতে পার।

মহিম হাসিল ; কহিল, যাব না, এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলেম ব'লে ত আমার মনে হয় না।

সুরেশ বলিল, না হয় ভালই ; তবুও আমার তরফ থেকে যদি কোন বাধা থাকে ত সে আমি তুলে নিলুম।

এটা অনুগ্রহ না নিগ্রহ সুরেশ ?

তোমার কি মনে হয় মহিম ?

চিরকাল যা মনে হয়, তাই।

সুরেশ কহিল, তার মানে আমার খামখেয়াল। এই না ? তা

বেশ, তোমার যা ইচ্ছে মনে কর্‌তে পার, আমার আপত্তি নেই! শুধু যে বাধাটা আমি দিয়েছিলুম, সেইটেই আজ সরিয়ে দিলুম।

কিন্তু তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

খেয়ালের কি কারণ থাকে যে, তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌লেই আমাকে বল্‌তে হবে!

মহিম ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, কিন্তু সুরেশ, তোমার খেয়ালের বসেই যে সমস্ত সংসারে বাধা পড়বে, আর উঠে যাবে, এ হ'লে হয় ত ভালই হয়; কিন্তু বাস্তব ব্যাপারে তা হয় না। তোমার যেখানে বাধা নেই, আমায় সেখানে বাধা থাকৃতে পারে।

তার মানে?

তার মানে, তুমি সেদিন ব্রাহ্ম-মহিলাদের সম্বন্ধে যত কথা বলেছিলে, আমি তা ভেবে দেখেচি। ভাল কথা, সে দিন বলেছিলে, এক মাসের মধ্যে আমার জন্য পাত্রী স্থির ক'রে দেবে তার কি হ'ল?

সুরেশ মুখ তুলিয়া দেখিল, মহিম গাম্ভীর্য্যের আড়ালে তীব্র পরিহাস করিতেছে। সেও গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, আমি ত ভেবে দেখ্‌লুম মহিম, ঘটকালী করা আমার ব্যবসা নয়। তার পরে হাসিয়া কহিল, কিন্তু তামাসা থাক্। এ ক'দিন আমার মান রেখেচ ব'লে তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ, কিন্তু আজ যখন আমার হুকুম পেলে, তখন কাল সকালেই একবার সেখানে যাচ্চ ত?

না, কাল সকালে আমি বাড়ি যাচ্চি।

কখন্ ফির্‌বে?

দশ-পনেরো দিনও হ'তে পারে, আবার মাস-খানেক্ দেরি হ'তেও পারে।

মাস-খানেক! না মহিম, সে হবে না। বলিয়া অকস্মাৎ সুরেশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া মহিমের ডানহাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া

কহিল, আর আমার অপরাধ বাড়িয়ো না মহিম, কাল সকালেই একবার যাও। তিনি হয় ত তোমার পথ চেয়ে ব'সে আছেন। বলিতেই তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

মহিমের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। সুরেশের আকস্মিক আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর, এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্ম-মহিলা সম্বন্ধে এই সসম্ভ্রম উল্লেখে সে যেন বিহ্বল হইয়া গেল। কিছুক্ষণ বন্ধুর মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে আমার পথ চেয়ে ব'সে আছে সুরেশ? কেদারবাবুর মেয়ে?

সুরেশ সহসা আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, থাক্‌তেও ত পারেন?

মহিম আবার কিছুক্ষণ সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে যে ইতিমধ্যে ব্রাহ্ম-বাড়িতে গিয়া অনাহূত পরিচয় করিয়াও আসিতে পারে, এ সম্ভাবনা তাহার কোনমতেই মনে উদয় হইল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, না সুরেশ, আমি হার মান্‌ছি—তোমার আজকের মেজাজ বাস্তবিক আমার বুদ্ধির অগম্য। ব্রাহ্মমেয়ে পথ চেয়ে ব'সে আছে, এ কথা তোমার মুখ থেকে বোঝা আমার দ্বারা অসম্ভব।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা, সে কথা একদিন বুঝিয়ে দেব। তুমি বল, কাল সকালেই একবার দেখা দেবে?

না, কাল অসম্ভব। আমাকে সকালের গাড়িতেই যেতে হবে।

মিনিট-কয়েকের জন্যও কি দেখা দিতে পার না?

না তাও পারি নে। কিন্তু তোমার কি হয়েছে বল দেখি?

সে কথা আর একদিন বল্‌ব—আজ নয়। আচ্ছা, আমি নিজে গিয়ে তোমার কথা ব'লে আস্‌তে পারি কি?

মহিম অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, পার, কিন্তু তার ত কিছু দরকার নেই।

৩১

সুরেশ কহিল, না থাক্ দরব

পরিচয় দিলে তাঁরা চিন্‌তে পারবেন

একজন নিশ্চয়ই পারবেন।

সুরেশ বলিল, তা হ'লে

মহিম বলিল, হাঁ।

সুরেশ এই

চিন্‌বেন

চা

প

সুরেশ কহিল, একটা চিঠি লিখেও ত সে আপনাকে জানাতে পারত।

অচলা ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, না। চিঠি তিনি লেখেন না।

সুরেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল; বলিল, কি প্রয়োজন, তাও কখনো বলে না। তার সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সমস্তই তার একার। স্বার্থপর! কখনো কাউকে তার ভাগ দিলে না। এই নিয়ে কত দুঃখ সে যে ছেলে-বেলা থেকে আমাকে দিয়ে এসেছে বোধ করি, তার সীমা নেই। নিষ্ঠুর! দিনের পর দিন নিজে উপোস ক'রে, আমার প্রতিদিনের খাওয়া-পরা তিক্ত বিষাক্ত করেচে—কিন্তু কখনো কোন দিন আমার মুখ চেয়েও আমার হাত থেকে কিছু নেয় নি। আমার ভয় হয়, যে-পাষাণকে নিয়ে আমি কখনো সুখ পাই নি, তাকে নিয়ে আপনিই কি সুখী হতে পারবেন? বলিতে বলিতেই অকস্মাৎ তাহার চোখ দুটো অশ্রুজলে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, দেখুন, আমার বাইরেটা ভারি শক্ত দেখ্‌তে, কিন্তু ভিতরটা তেমনি দুর্ব্বল। মহিমের ঠিক তার উল্টো— তবুও আমাদের মত বন্ধুত্ব সংসারে বোধ করি খুব কমই ছিল।

অচলা নতমুখে মৃদুকণ্ঠে বলিল, সে আমি জানি সুরেশবাবু, এবং আরও জানি যে, সে বন্ধুত্ব আজও তেমনি অক্ষয় হয়ে আছে।

শৈশবের সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতি সুরেশের বুকের ভিতর আলোড়িত হইয়া উঠিল, সে অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যখন জানেনই, তখন এই ভিক্ষা আজ আমাকে দিন যে, অজ্ঞানে যে শত্রুতা আপনাদের করেচি, সে অপরাধ আর যেন আমার বুকে না বেঁধে!

তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে পুনরায় রুদ্ধ হইয়া আসিল এবং এই একান্ত ব্যাকুলতায় অচলার নিজের অন্তরটাও যেন দুলিয়া দুলিয়া উঠিল। সে উদ্গত অশ্রু গোপন করিতে অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়াই দেখিল, তাহার পিতা দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

কেদারবাবু সুরেশকে দেখিয়া খুসী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এই যে সুরেশবাবু!

সুরেশ দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল।

কেদারবাবু আসন গ্রহণ না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, মহিমের খবর কি? তাকে ত দেখচি নে!

সুরেশ বলিল, মহিম অত্যন্ত প্রয়োজনে সকালের গাড়ীতেই বাড়ি চ'লে গেল—এই খবর জানাবার জন্যেই আমি এলুম।

কেদারবাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন—বাড়ি চ'লে গেল! বলিয়াই সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিতে লাগিলেন—সে বাড়ি যাক্, থাক্, আমাদের তাতে আর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তুমি বাবা সুরেশ, যখন সময় পাবে বাড়ির ছেলের মত এখানে এসো, যেয়ো—আমার বড় আনন্দ হবে—কিন্তু তোমার সেই মিথ্যাচারি বন্ধু-রত্নটি যেন আর কখন এ বাড়িতে মুখ না দেখায়। দেখা হ'লে ব'লে দিয়ো তার আর কোন লজ্জা না থাকে—অন্ততঃ অপমানের ভয়টা যেন থাকে। সুরেশ ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, তাহার মনের ভাব অনুমান করিবার চেষ্টা করিয়া কেদার-বাবু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, না না, সুরেশ, তোমার লজ্জা বোধ করবার ত এতে কোনই কারণ নেই। বরঞ্চ কর্ত্তব্য করার গৌরব আছে। তুমি বুঝতে পারছ না যে, কি বিপদ থেকে আমাদের পরিত্রাণ করেছ এবং কত দূর পর্য্যন্ত আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

মেয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, আমি কাল থেকে এই বড় আশ্চর্য্য হচ্চি অচলা, সে লোকটা সুরেশের মত ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল কি ক'রে, আর কি ক'রেই বা এতদিন ধ'রে সেটা বজায় রেখেছিল। একটু-খানি থামিয়া বলিলেন, যে এ পারে, সে যে আমাদের মত দুটি নিরীহ মানুষকে ভুলিয়ে রাখবে, এ বেশি কথা নয়, মানি, কিন্তু এও বড় অদ্ভুত যে, এই লোকটা বাস্তবিক কি, কেমন—এটুকু অনুসন্ধান করার

কথাও আমার মত প্রবীণ বয়সের লোকের মনেও একটা দিন ওঠে নি। আশ্চর্য্য !

সুরেশ কথা কহিল না, কেদারবাবুর মুখের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিতে পর্য্যন্ত পারিল না। কেদারবাবু ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া নিজের পোষাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আমার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে বাবা ; একটু বসো, আমি এইগুলো ছেড়ে আসি ; বলিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেই সুরেশ কহিল, আমার বেলা হয়ে গেছে। আজ যাই, আর একদিন আসব, বলিয়া ব্যস্ত হইয়াই উঠিয়া পড়িল এবং কোন মতে একটা নমস্কার সারিয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু পরদিন সকালেই আবার তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল এবং পরদিনও ঠিক এই সময়েই তাহার গাড়ীর শব্দ নিচে আসিয়া থামিল।

কিন্তু ইহার পরদিনও আবার যখন তাহার গাড়ীর শব্দ শুনা গেল, তখন বেলা হইয়াছে। পিতাকে স্নানাহারের তাগিদ দিয়া অচলা উঠিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু তাঁহার আর উঠা হইল না, তিনি সুরেশকে সানন্দে আহ্বান করিয়া লইয়া গল্প সুরু করিয়া দিলেন।

সুরেশ ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল বলিয়াই দুই-চারিটা সাধারণ কথা-বার্ত্তার পরে যখন উঠিতে গেল, তখন তাহার শুষ্ক রুক্ষ মাথার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আজ অকস্মাৎ এক নিমেষেই কেদারবাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, এখনো ত তোমার স্নানাহার হয় নি সুরেশবাবু ? সুরেশ সহাস্যে কহিল, আমার আহার একটু বেলাতেই হয়। কেদারবাবু তাহা কানেই লইলেন না, বলিতে লাগিলেন, এবং এক নিমিষেই একেবারে ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন—অ্যাঁ, এখনও নাওয়া-খাওয়া হয় নি ? না আর এক মিনিট দেরি নয় সুরেশ ! এইখানেই স্নান ক'রে যা পারো দুটো খেয়ে নাও। মা অচলা, একটু

তাড়া দাও—বেলা বারোটা বেজে গেছে। বেয়ারা ইত্যাদি উচ্চকণ্ঠে ডাকাডাকি করিতে করিতে তিনি নিজেই বাহির হইয়া গেলেন।

অচলা এতক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখনও কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। পিতা চলিয়া যাইবার পর আস্তে আস্তে বলিল, আপনি আমাদের এখানে কি কিছু খেতে পারবেন?

সুরেশ মুখ তুলিয়া অচলার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আপনি কি বলেন?

আপনি কখনই ত ব্রাহ্ম-বাড়িতে খান না।

না, খাই নে। কিন্তু আপনি এনে দিলে খাবো। একটুখানি থামিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় ভাবচেন, আমি তামাসা করছি; কিন্তু তা নয়। আপনি হাতে ক'রে দিলে আমি সত্যিই খাবো; বলিয়া চাহিয়া রহিল। এইবার অচলা একটুখানি মুখ নিচু করিয়া হাসি গোপন করিল; কহিল, যথার্থই আমি ভেবেছিলুম আপনি ঠাট্টা করচেন। কাল পর্য্যন্তও যাদের বাড়িতে খেতে আপনার ঘৃণার অবধি ছিল না, আজ তাদেরই একজনের ছোঁয়া খেতে কি ক'রে আপনার প্রবৃত্তি হবে, আমি ত ভেবে পাচ্ছি নে সুরেশবাবু!

সুরেশ ম্লান-মুখে ব্যথিত স্বরে কহিল, তবে এতক্ষণ পরে কি এই ভেবে পেলেন যে, আপনার হাতে খেতে আমার ঘৃণা হবে?

অচলা বলিল, কিন্তু এই ভাবনাই ত স্বাভাবিক সুরেশবাবু। আপনার মত একজন উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোকের চিরদিনের বদ্ধমূল সামাজিক সংস্কার হঠাৎ একদিনে অকারণে ভেসে যাবে, এইটেই কি ভাবতে পারা সহজ?

সুরেশ কহিল, না, সহজ নয়। কিন্তু অকারণে ভেসে যাচ্ছে—তাই বা ভাবচেন কেন? কারণ থাকতেও ত পারে, বলিয়া এমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল যে, জবাব দিতে গিয়া অচলা একেবারে বিস্মিত হইয়া

গেল। তাহার কথাটায় সে যে আঘাত পাইয়াছে, তাহা সে মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিল; এবং এক প্রকারের হিংস্র আনন্দও উপভোগ করিতেছিল। কিন্তু সে বেদনা যে অকস্মাৎ এক মুহূর্তে তাহার সমস্ত মুখখানাকে একেবারে ছাইয়ের মত শুষ্ক করিয়া দিতে পারে—তা সে ভাবেও নাই, ইচ্ছাও করে নাই। তাই নিজেও ব্যথা পাইয়া কথাটাকে সহজ রহস্যালাপে পরিণত করিতে, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, ভেবেই দেখুন আপনার মত কঠোর-প্রতিজ্ঞ লোকও—

সুরেশ বলিল, হাঁ, ভেসে যায়। তাহার গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল; কহিল, আপনি একটা দিনের কথা বল্‌ছিলেন—কিন্তু জানেন আপনি, একদিনের ভূমিকম্পে অর্দ্ধেক দুনিয়াটা পাতালের মধ্যে ডুবে যেতে পারে? একটা দিন কম দিন নয়। বলিয়া আবার নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল। অচলা ভীত হইয়া উঠিল। সুরেশের মুখের উপর কি একপ্রকার শুষ্ক পাণ্ডুরতা—কপালের শির দুটো রক্তে স্ফীত, চোখ দুটো জ্বল্‌ জ্বল্‌ করিতেছে—যেন কি একটা সে ছোঁ মারিয়া ধরিতে চায়!

একে এই গরম, তাহাতে এত বেলা পর্য্যন্ত স্নানাহার নাই—গত রাত্রে এতটুকু ঘুমাইতে পারে নাই—তাহার পায়ের নিচের মাটীটা পর্য্যন্ত যেন অকস্মাৎ দুলিয়া উঠিল। আরক্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, ব্রাহ্মদের ঘৃণা করি কি না, সে জবাব ব্রাহ্মদের দেব, কিন্তু আপনি আমার কাছে তাদের অনেক, অনেক উপরে—তাহার উন্মাদ ভঙ্গীতে অচলা ভয়ে কাঠ হইয়া উঠিল। কোনমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য সভয়ে কহিতে গেল, বেহারাটা—

কিন্তু সে অস্ফুট মৃদুস্বর সুরেশের উত্তপ্ত উচ্চকণ্ঠে ঢাকা পড়িয়া গেল। সে অমনি তীব্রস্বরে কহিতে লাগিল, দুটো দিনের পরিচয়! তা বটে! কিন্তু জানো অচলা, দিন, ঘণ্টা, মিনিট দিয়ে মহিমকে মাপা

যায়—কিন্তু সুরেশকে যায় না। সে স্থানকালের অতীত! তুমি ভূমিকম্প দেখেছ? যা পৃথিবী গ্রাস করে—

অচলা ব্যাধভীত হরিণীর মত চক্ষের পলকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনার স্নানের জোগাড়—, বলিয়া পা বাড়াইতে সুরেশ সহসা সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অচলার ডান হাত ধরিয়া টান দিল। সেই উন্মত্ত ও আকস্মিক আকর্ষণ সহ্য করা স্ত্রীলোকের সাধ্য নয়। সে উপুড় হইয়া সুরেশের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। ভয় ও বিস্ময় অতিক্রম করিয়া তাহার আর্ত্তকণ্ঠের অস্ফুট 'মা গো!' আহ্বান তাহার কম্পিত ওষ্ঠপুট ত্যাগ করিতে না করিতে সুরেশ তাহার দুই হাত নিজের বুকের উপর সজোরে টানিয়া লইয়া ডাকিল, অচলা!

অচলা চোখ তুলিয়া মূর্চ্ছিত মায়ামুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল এবং সুরেশও ক্ষণকালের জন্য কথা কহিতে পারিল না—শুধু তাহার অপরিমেয়, পিপাসা-দগ্ধ ওষ্ঠাধর হইতে কেমন যেন একটা শুষ্ক তীব্র জ্বালা ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত এইভাবে থাকিয়া সুরেশ আর একবার অচলার দুই হাত বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিল, অচলা, একটিবার ভূমিকম্পের এই প্রচণ্ড হৃৎস্পন্দন নিজের দুটি হাতে অনুভব ক'রে দেখ—কি ভীষণ তাণ্ডব এই বুকের ভেতরটায় তোলপাড় করে বেড়াচ্চে। এ কি পৃথিবীর কোন ভূমিকম্পের চেয়ে ছোট? বল্‌তে পার অচলা, পৃথিবীতে কোন্ জাত, কোন্ ধর্ম্ম, কোন্ মতামত আছে, যা এই বিপ্লবের মধ্যে পড়েও ডুবে রসাতলে তলিয়ে যাবে না!

ছেড়ে দিন—বাবা আসছেন, বলিয়া জোর করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া অচলা তাহার চৌকিতে ফিরিয়া গিয়া শান্ত হইয়া বসিল, এবং পরক্ষণেই কেদারবাবু ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, তাই ত, একটু দেরি হয়ে গেল—আর এই বেয়ারা ব্যাটা যে থেকে থেকে কোথায়

যায়, তার ঠিকানা নেই। মা অচলা—ও কি রে, তোর কি কোন অসুখ করেছে? মুখ শুকিয়ে যেন একেবারে—

অচলা কোনমতে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, বাবা, অসুখ করবে কেন?

তবু মাথা-ধরা-টরা? যে গরম পড়েছে, তা—

না, আমি বেশ আছি বাবা, আমার কিছুই হয় নি।

কেদারবাবু নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, তবু ভাল। মুখ দেখে আমার ভয় লেগে গিয়েছিল। তবে, তুমি একটু দেখ দেখি মা, যদি—

অচলা বলিল, বেশ ত বাবা, আমি এক মিনিটে সমস্ত জোগাড় ক'রে দিচ্চি। কিন্তু এইমাত্র আমি জিজ্ঞাসা করছিলুম সুরেশবাবুকে—আমাদের এখানে নাওয়া-খাওয়া করতে তাঁর ত আপত্তি নেই?

কেদারবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, আপত্তি কেন থাকবে? না—না, সুরেশ, আমি ত তোমাকে বলেইছি যে, একদিনেই তোমাকে আমি ঘরের ছেলে মনে করেচি। এ বাড়ি তোমার নিজের বাড়ি। মেয়ের দিকে চাহিয়া সগর্ব্বে কহিলেন, আর তাই যদি না হবে অচলা, আমাদের উদ্ধার করবার জন্য ভগবান ওঁকে পাঠাবেন কেন? কিন্তু আর দেরি ভাল হবে না বাবা, এসো আমার সঙ্গে—স্নানের ঘরটা তোমাকে দেখিয়ে দিই গে। কিন্তু সেই যে সুরেশ, কেদারবাবু প্রবেশ করা পর্য্যন্ত মাথা হেট করিয়াছিল, কিছুতেই আর সে মাথা সোজা করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারিল না।

অচলা বলিল, কাজ কি বাবা পীড়াপীড়ি করে। আমাদের ব্রাহ্ম-বাড়িতে খেতে হয় ত ওঁর বিশেষ বাধা আছে। তা ছাড়া অপ্রবৃত্তির ওপর খেলে অসুখ করতেও পারে।

কেদারবাবু একেবারে মুসড়িয়া গেলেন। সুরেশ বড়লোকের ছেলে—স্বাধীন। ঘরের গাড়ী করিয়া যাতায়াত করে। তাহাকে খাওয়াইয়া-

মাথাইয়া যেমন করিয়া হোক আত্মীয় করা যে তার চাই-ই; হঠাৎ তাহার আনত মুখের একাংশে নজর পড়ায় কেদারবাবু বিস্ময়ে একেবারে চমকিয়া উঠিলেন—অ্যাঁ! এ কি হয়েছে কি সুরেশ? শুকিয়ে সমস্ত মুখখানা যে একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেছে! ওঠো, ওঠো—মাথায় মুখে জল দিতে আর এক মিনিট বিলম্ব ক'রো না। বলিয়া হাত ধরিয়া একপ্রকার জোর করিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আহারাদির পর কোনমতেই কেদারবাবু এই রৌদ্রের মধ্যে সুরেশকে ছাড়িয়া দিলেন না। বিশ্রামের নামে সমস্ত দুপুরটা একটা ঘরে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। সে চোখ বুজিয়া কোচের উপর পড়িয়া রহিল, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। ঘরের বাহিরে মধ্যাহ্নসূর্য্য আকাশে জ্বলিতে লাগিল, ভিতরে অসংযমের আত্মগ্লানি ততোধিক ভীষণ তেজে সুরেশের বুকের ভিতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এমনি করিয়া সমস্ত বেলাটা অন্তরে-বাহিরে পুড়িয়া আধমরা হইয়া যখন সে উঠিয়া বসিয়া সুমুখের জানালাটা খুলিয়া দিল, তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। কেদারবাবু প্রসন্নমুখে ঘরে ঢুকিয়া জোর করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ—গরমটা একবার দেখছ—সুরেশ! আমার এতটা বয়সে কলকাতায় কস্মিনকালেও এমন দেখি নি! বলি, ঘুমটুম্ একটু হয়েছিল কি?

সুরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, দিনের-বেলায় আমি ঘুমোতে পারি নে।

কেদারবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, আর পারা উচিতও নয়। ভয়ানক স্বাস্থ্যহানি হয়। তবুও আমি তিন-চারবার উঠে উঠে দেখি, তোমার

পাখাওয়ালা টান্‌চে না ঘুমোচ্চে। এরা এত বড় সয়তান যে, যে মুহূর্ত্তে তুমি একটু চোখ বুজবে, সেই মুহূর্ত্তেই সেও চোখ বুজবে। যা হোক্, একটু সুস্থ হতে পেরেচ ত? আমি নিশ্চয় জানতুম—এ রোদে বাইরে বেরুলে, আর তুমি বাঁচতে না!

সুরেশ চুপ করিয়া রহিল। কেদারবাবু ঘরের অন্যান্য জানালাগুলা একে একে খুলিয়া দিয়া, বসিবার চৌকিখানা কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, আমি ভাবচি সুরেশ, আর গড়ি-মসির প্রয়োজন নেই। সমস্ত স্পষ্ট ক'রে, মহিমকে একখানা চিঠি লিখে দিই। কি বল?

প্রশ্নটা সুরেশের পিঠের উপর যেন মর্ম্মান্তিক চাবুকের বাড়ি মারিল। সে এমনি চমকিয়া উঠিল যে, কেদারবাবু দেখিতে পাইয়া বলিলেন, নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য যে কি ক'রে করতে হয়, সে শিক্ষা ত তুমিই আমাকে এতকাল পরে দিলে সুরেশ; এখন তোমার ত পেছুলে চল্‌বে না বাবা।

এ ত ঠিক কথা। সুরেশ কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, কিন্তু আপনার কন্যারও এ সম্বন্ধে একটা মতামত নেওয়া চাই।

কেদারবাবু অল্প হাসিয়া কহিলেন, চাই বই কি।

তিনি কি স্পষ্ট করে চিঠি লিখে দিতেই বলেন?

কেদারবাবু ইহার সোজা জবাবটা না দিয়া কহিলেন, তা একরকম তাই বই কি। এ সব বিষয়ে মুখোমুখি সওয়াল-জবাব করাটা সকলের পক্ষেই কষ্টকর। কিন্তু সে ত বড় হয়েছে; রীতিমত শিক্ষাও পেয়েছে; এ সকল ব্যাপার দিন থাক্‌তে পরিষ্কার ক'রে না নিলে এর পাগলামিটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, এ ত সে বোঝে। তাই ভাবচি, আজ রাত্রেই কাজটা সেরে ফেলব।

সুরেশ ম্লান হইয়া কহিল, এত তাড়াতাড়ি কেন? দুদিন চিন্তা করাও ত উচিত।

কেদারবাবু বলিলেন, এর ভেতরে চিন্তা করব আর কোন্‌খানে?

ওর হাতে মেয়ে দিতে পারব না, সে নিশ্চয়—তখন এই বিশ্রী ব্যাপারটা যত শিঘ্র শেষ হয়, ততই ত মঙ্গল।

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, আমার উল্লেখ করাও কি প্রয়োজন?

কেদারবাবু হাসিয়া বলিলেন, বুড়ো হয়েচি, এটুকু বিবেচনাও কি আমার নেই, মনে কর? তোমার নাম কোন দিনই কেউ তুলবে না।

সুরেশের মুখ দিয়া একটা আরামের নিশ্বাস পড়িল; কিন্তু সে আর কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এই নিশ্বাসটুকু কেদারবাবুর দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি সুরেশের আরও দু-একটা আচরণ ইতিমধ্যে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে একটা অনুমান খাড়া করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার সত্যমিথ্যা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে অন্ধকারে একটা ঢিল ফেলিলেন; কহিলেন, মস্ত উপকার আমাদের যেমন তুমি করলে বাবা, কিন্তু এর চেয়েও বড় উপকার তোমার কাছে আমরা দুজন প্রত্যাশা করচি। আমরা ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু সে রকম ব্রাহ্ম নয়। আর আমার মেয়ে ত তার মায়ের মত মনে মনে হিন্দুই রয়ে গেছে। সে আমাদের ব্রাহ্মগিরি-টিরি একেবারেই পছন্দ করে না।

সুরেশ বিস্ময়াপন্ন হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার এই নীরব ঔৎসুক্য কেদারবাবু বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, তাই, মেয়েকে আমি কিছুতেই চিরকাল আইবুড়ো রাখতে পারি না। এ বিষয়ে আমি তোমাদের মতই সম্পূর্ণ হিন্দুমতাবলম্বী। একটি সম্বন্ধ যেমন তোমা হ'তে ভেঙ্গে গেল সুরেশ, তেমনই আর একটা তোমাকেই গ'ড়ে তুলতে হবে বাবা।

সুরেশ কহিল, যে আজ্ঞে; আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব।

তাহার মুখের ভাব পড়িতে পড়িতে কেদারবাবু সন্দিগ্ধস্বরে কহিলেন, সমাজে এই নিয়ে যথেষ্ট গোলযোগ হবে দেখতে পাচ্চি। কিন্তু যত

শিগ্র পারা যায়, অচলার বিয়ে দিয়ে এই সব আলোচনা থামিয়ে ফেল্‌তে হবে। তবে একটা শক্ত কথা আছে, সুরেশ। বলিয়া একবার দরজার বাহিরে চাহিয়া, আরও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া, গলা খাটো করিয়া বলিলেন, শক্ত হচ্চে এই যে, পাত্র রূপে গুণে ভাল হ'লেই যে হিন্দু-সমাজের মত তাকে ধ'রে এনে দিতে পারব, তা নয়। ও চিরকাল যে শিক্ষা-সংস্কারের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে, তাতে ওর অমতে কিছুই করা যাবে না। কিন্তু মত সে কোনমতেই দেবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দুজনের মধ্যে এমন একটা কিছু—বুঝলে না সুরেশ?

কথাবার্ত্তার মধ্যেই সুরেশ কতকটা যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল, এই প্রণয় ইঙ্গিতটা যেন আর একবার নূতন করিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে অচেতন করিয়া দিল। দুপুর-বেলায় তাহার নিজের সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রণয়-নিবেদনের বীভৎস, উৎকট আচরণ স্মরণ হওয়ায়, নিদারুণ লজ্জায় সমস্ত মুখখানা রাঙ্গা না হইয়া একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল; এবং সকালের যে খবরের কাগজখানা এতক্ষণ পায়ের কাছে মেজেতে পড়িয়া ছিল, সেইখানা তুলিয়া লইয়া তাহার বিজ্ঞাপনের পাতাটার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

কেদারবাবু ইহা দেখিতে পাইলেন, এবং এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া, মনে মনে অত্যন্ত পুলকিত হইলেন; এবং সুযোগ বুঝিয়া একটা বড়রকম চাল চালিয়া দিলেন; কহিলেন, আমি বরাবর এই বড় একটা আশ্চর্য্য জিনিস দেখে আসছি সুরেশ, যে, কেন জানি নে, একটা লোককে আজন্ম কাছে পেয়েও এক তিল বিশ্বাস হয় না, আর, একটা মানুষকে হয় ত দুঘণ্টা মাত্র কাছে পেয়েই মনে হয়, এর হাতে নিজের প্রাণটা পর্য্যন্ত স'পে দিতে পারি। মনে হয়, যেন জন্মজন্মান্তরের আলাপ—শুধু দু ঘণ্টার নয়। এই যেমন তুমি। কতক্ষণেরই বা পরিচয় বল দেখি?

ঠিক এমনি সময়ে অচলা ঘরে প্রবেশ করিল। সুরেশ মুহূর্তের জন্য চোখ তুলিয়াই আবার সংবাদপত্রের প্রতি মনঃসংযোগ করিল।

বাবা, তুমি এ-বেলা চা, না কোকো খাবে?

আমি কোকোই খাব মা।

সুরেশবাবু, আপনি চা খাবেন ত?

সুরেশ কাগজের দিকে চোখ রাখিয়াই অস্ফুটস্বরে বলিল, আমাকে চা-ই দেবেন।

আপনার পেয়ালায় চিনি কম দিতে হবে না ত।

না, আর পাঁচ জন যেমন খায়, আমিও তেমনি খাই।

অচলা চলিয়া গেল। কেদারবাবু তাঁহার ছিন্ন প্রসঙ্গের সূত্রযোজনা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এই দেখ না সুরেশ, আমার এই মা-টির জন্যেই যে এই বুড়োবয়সে আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে পড়েচি, সে কথা তোমার কাছে ত গোপন রাখতে পারলুম না। নইলে, নিজের দুর্দ্দশা-দুরবস্থার কাহিনী সহজে কি কেউ অপরের কানে তুল্‌তে পারে? কখনো যা পারি নি, এত বন্ধু-বান্ধব থাক্‌তে সে কথা শুধু তোমার কাছেই বল্‌তে কেন সঙ্কোচ বোধ হচ্চে না? এর কি কোন গূঢ় কারণ নেই মনে কর?

সুরেশ বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল। কেদারবাবু বলিতে লাগিলেন, এ ভগবানের নির্দ্দেশ—সাধ্য কি গোপন করি? আমাকে বলতেই হবে যে! বলিয়া চৌকীর হাতলের উপর তিনি একটা চাপড় মারিলেন।

কিন্তু তাঁহার এই বিস্তৃত ভূমিকা সত্বেও তাঁহার দুর্দ্দশা দুরবস্থাটা যে মেয়ের জন্য কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা সুরেশ আন্দাজ করিতে পারিল না। কেদারবাবু তখন সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া তাঁহার অমন অর্ডারসাপ্লায়ের ব্যবসাটা নিছক প্রবঞ্চনা ও কৃতঘ্নতার

আগুনে পুড়িয়া খাক হইয়া গেলেও, তিনি অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং ঋণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া গেলেও একমাত্র কন্যার শিক্ষা-সম্বন্ধে কিছুমাত্র ব্যয়সঙ্কোচ করেন নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন, গুটি পাঁচ-ছয় ডিক্রীজারির ভয়ে তাঁহার আহার বিহার বিষময় এবং খুচরা ঋণের তাগাদায় জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিলেও, তিনি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন না। অথচ এই কলিকাতা সহরেই এমন অনেক বন্ধু আছেন, যাঁহারা টাকাটা অনায়াসেই ফেলিয়া দিতে পারেন।

একটুখানি থামিয়া কি যেন চিন্তা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু তোমাকে যে জানালুম—এতটুকু দ্বিধা সঙ্কোচ হ'ল না—এ কি শ্রীভগবানের সুস্পষ্ট আদেশ নয়? বলিয়া পরম ভক্তিভরে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিলেন।

সুরেশের ভগবানে বিশ্বাস ছিল না—সে বৃদ্ধের উচ্ছ্বাসে যোগ দিল না, বরঞ্চ, তাহার মনটা কেমন যেন ছোট হইয়া গেল। ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ঋণ কত?

কেদারবাবু বলিলেন, ঋণ? আমার ব্যবসাটা বজায় থাক্‌লে কি এ আবার একটা ঋণ! বড় জোর হাজার তিন-চার। তিনি আরও কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু এমনি সময়ে অচলা বেয়ারার হাতে চায়ের সরঞ্জাম এবং নিজের হাতে জল-খাবারের থালা লইয়া প্রবেশ করিল।

কেদারবাবু গরম কোকো এক চুমুকে খানিকটা খাইয়া, হর্ষসূচক একটা অব্যক্ত নিনাদ করিয়া পেয়ালাটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, দেখ সুরেশ, আমার ওপর ভগবানের এই একটা আশ্চর্য্য কৃপা আমি বরাবর দেখে আসচি যে, তিনি কখনো আমাকে অপ্রস্তুত করেন না। মহিমকে কথাটা বলি বলি ক'রেও যে কেন বল্‌তে পার্‌তুম

না—তিনি বরাবর আমায় যেন মুখ চেপে ধর্‌তেন—এতদিনে সেটা বোঝা গেল! বলিয়া আর একবার কপালে হাত ঠেকাইয়া তাঁহার অসীম দয়ার জন্য নমস্কার করিলেন।

সুরেশ তাহার [illegible] করিয়া কহিল, টাকাটা কবে আপনার প্রয়োজন?

কেদারবাবু মুখ হইতে কোকোর পেয়ালাটা পুনরায় নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, প্রয়োজন আমার ত নয় সুরেশ, প্রয়োজন তোমাদের। বলিয়া একটুখানি উচ্চ অঙ্গের হাস্য করিলেন। হেঁয়ালিটা বুঝিতে না পারিয়া সুরেশ মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল, অচলা জিজ্ঞাসুমুখে পিতার মুখের পানে চাহিয়া আছে। তিনি একবার কন্যার মুখে, একবার সুরেশের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, এর মানে বোঝা ত শক্ত নয়। বাড়িটা আমি ত সঙ্গে নিয়ে যাব না। যায় তোমাদেরই যাবে, আর থাকে তোমাদেরই দুজনের থাক্‌বে। বলিয়া মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

দুজনের চোখাচোখি হইল, এবং চক্ষের পলকে উভয়েই আরক্ত-মুখে মাথা হেঁট করিয়া ফেলিল।

পেয়ালা-দুই কোকো নিঃশেষ করিয়া কেদারবাবুর একখানা জরুরী চিঠি লেখার কথা স্মরণ হইল। অবিলম্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আজ তোমার খাওয়ার ভারি কষ্ট হ'ল সুরেশ, কাল দুপুর-বেলা এখানে খাবে, বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পশ্চিমদিকের দরজা খুলিয়া তাঁহার নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

খোলা দরজা দিয়া অস্তোন্মুখ সূর্য্যের এক ঝলক রাঙা আলো সুরেশের মুখের উপর আসিয়া পড়িল। সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, অচলা তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—সেও দৃষ্টি অবনত করিল। মিনিট-দুই বড় ঘড়িটার খট্ খট্ শব্দ ছাড়া সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঘরে নীরবতা ভঙ্গ করিল সুরেশ, কহিল, হঠাৎ আচ্ছা একটা কাণ্ড ক'রে বসলুম।

অচলা কথা কহিল না।

সুরেশ পুনরায় কহিল, আপনার নিশ্চয়ই আমাকে একটা রাক্ষস ব'লে মনে হচ্চে। একলা ব'সে থাকতে বোধ করি আপনার সাহস হচ্ছে না। না? বলিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। অচলা এখনও মুখ তুলিল না। কিন্তু তুলিলে দেখিতে পাইত, সুরেশের ওই একান্ত চেষ্টার নিষ্ফল হাসিটা শুধু তাহার নিজের মুখখানাকেই বারংবার অপমানিত করিয়া লজ্জায় বিকৃত হইয়া উঠিতেছে।

আবার সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; এবং সেই দেওয়ালের গায়ের ঘড়িটাই শুধু খট্ খট্ করিয়া স্তব্ধতার পরিমাণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণে এই কঠিন নীরবতা যখন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন সুরেশ তাহার সমস্ত দেহটাকে ঋজু এবং শক্ত করিয়া লইয়া কহিল, দেখুন, যা হয়ে গেছে, তার পরে আমাদের মধ্যে চক্ষুলজ্জার স্থান নেই। বেলা গেল—আমি এবার যাব। কিন্তু তার আগে গোটা-দুই কথার জবাব শুনে যেতে চাই, দেবেন?

অচলা মুখ তুলিল। তাহার চোখ দুটি ব্যথার ভরা। কহিল, বলুন।

সুরেশ ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, আপনার বাবার দেনাটা পরিশোধ ক'রে দিতে কাল-পরশু একবার আস্‌ব; কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হবার প্রয়োজন নাই। আমি জানতে চাই, আমাদের দু-জনের সম্বন্ধে তাঁর অভিপ্রায় কি আপনি জানেন?

অচলা কহিল, আমাকে তিনি স্পষ্ট ক'রে কিছুই বলেন নি।

সুরেশ বলিল, আমাকেও না। তবুও বিশ্বাস, তিনি আমাকেই—কিন্তু আপনি বোধ করি রাজি হবেন না?

অচলা কহিল, না।

কোন দিন না?

অচলা দৃষ্টি অবনত করিয়া কহিল, না।

কিন্তু, মহিমের আশা যদি না থাকে?

অচলা অবিচলিত স্বরে কহিল, সে আশা ত নেই-ই।

সুরেশ প্রশ্ন করিল, বোধ করি, তবুও না?

অচলা মুখ তুলিল না, কিন্তু তেমনি শান্তদৃঢ় স্বরে কহিল, না, তবুও না।

সুরেশ কোচের পিঠে ঢলিয়া পড়িয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল যাক্, এ দিক্টা পরিষ্কার হয়ে গেল! বাঁচা গেল! বলিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, কিন্তু আমি এই একটা মুস্কিলের কথা ভাবচি যে, আপনার বাবার দেনাটা তা হ'লে শোধ হবে কি ক'রে?

অচলা ভয়ে ভয়ে একটুখানি মুখ তুলিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত কহিল, আর ত আপনি দিতে পারবেন না?

পারব না? কেন? প্রশ্ন করিয়া সুরেশ তীক্ষ্ণ-ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে চাহনির সম্মুখে অচলা পুনরায় মাথা হেঁট করিয়া ফেলিল। কয়েক মুহূর্ত উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া সুরেশ হাসিল। কিন্তু এবার তাহার হাসিতে আনন্দ না থাক্, কৃত্রিমতাও ছিল না। কহিল, দেখুন, আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়া পর্য্যন্ত আমার কোন আচরণকেই যে ভদ্র বলা যেতে পারে না, সে আমি নিজেও জানি; কিন্তু আমি অত ছোটও নই। আপনার বাবাকে আমি এই টাকাটা ঘুষ দিতে চাই নি, তাঁর বিপদে সাহায্য করতেই চেয়েছিলাম। সুতরাং আপনার মতামতের ওপর আমার দেওয়াটা নির্ভর করচে না। নির্ভর করচে তাঁর নেওয়াটা। এখন কি ক'রে যে তিনি নেবেন, আমি তাই ভাবছি! বরং আসুন, এ সম্বন্ধে আমরা একটা পরামর্শ করি।

অচলা মুখ তুলিয়া কহিল, বলুন।

সুরেশ বলিতে লাগিল, দৈবাৎ অনেক টাকার মালিক আমি। অথচ টাকা-কড়ির উপর কোন দিন কোন মায়াই আমার নেই। হাজার-চারেক টাকা আমি স্বচ্ছন্দে হাতছাড়া করতে পারি। আর আপনার সুখের জন্য ত আরও ঢের বেশি পারি। তা যাক্। এখন কথা এই যে, আপনার বাবার ধারণা, এ টাকাটা শোধ দেবার আর আবশ্যক হবে না, অথচ সে এক রকম শোধ দেওয়াই হবে! বুঝলেন না?

অচলা মাথা নাড়িয়া অস্ফুটে কহিল, হাঁ।

সুরেশ বলিতে লাগিল, কথাটা স্পষ্ট বলছি ব'লে মনে কিছু করবেন না! বুঝতে পারচি, টাকাটা তাঁর চাই-ই, অথচ এত টাকা ধার নিয়ে শোধ করবার অবস্থা তাঁর নেই! যদিচ, আমার নিজের তরফ থেকে তার আবশ্যকও কিছুমাত্র নেই—আচ্ছা, এ ত সহজেই হ'তে পারে। পরন্তু পর্য্যন্ত আপনার মনের ভাব তাঁকে না জানালেই ত আর কোন গোল থাকে না। কেমন, পারবেন ত?

অচলা তেমনি অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। সুরেশ কহিল, টাকার লোভে আপনি যে মত দিলেন না, এতে আমার ঢের বেশি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। বরঞ্চ মত দিলেই হয় ত আমি শেষে ভয়ে পেছিয়ে দাঁড়াতুম। আমার দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়। আমি চললুম। বলিয়া সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু হাসিয়া বলিল, আমার বলবার আর মুখ নেই—তবু যাবার সময় একটা ভিক্ষা চেয়ে যাচ্ছি যে, আমার দোষ-অপরাধগুলো মনে ক'রে রাখবেন না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, নমস্কার। খারাপ কাজের জাহাজ বোঝাই ক'রে নিয়ে বিদায় হলুম—কিন্তু বাস্তবিক, পিশাচও আমি নই। যাক্—বিশ্বাস করবার যখন এতটুকু পথ রাখি নি, তখন বলা বৃথা। বলিয়াই দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া সুরেশ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ধীরে ধীরে তাহার পদশব্দ সিঁড়িতে মিলাইয়া গেল, অচলা শুনিতে পাইল; এবং তাহার পরেই নিতান্ত অকারণে তাহার দুই চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

কেদারবাবু ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, সুরেশ?

অচলা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, এইমাত্র চ'লে গেলেন।

কেদারবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, সে কি, আমার সঙ্গে দেখা না করেই চ'লে গেল? কাল এখানে খাবার কথাটা তুমি যাবার সময় স্মরণ ক'রে দিয়েছিলে ত?

অচলা অপ্রতিভ হইয়া কহিল, আমার মনে ছিল না বাবা।

মনে ছিল না! বেশ! বলিয়া কেদারবাবু নিকটস্থ চৌকিটার উপর নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া পড়িলেন। মেয়ের চাপা কণ্ঠস্বরে তাঁর মনের মধ্যে একবার একটা খট্‌কা বাজিল বটে, কিন্তু সন্ধ্যার আঁধারে মুখের চেহারাটা দেখিতে না পাইয়া, সেটা স্থায়ী হইতে পারিল না। বলিলেন, এ বুড়ো বয়সে যা নিজে না করব, যে দিকে না চাইব, তাতেই একটা-না-একটা গলদ থেকে যাবে—তাই হবে না। যাই বেয়ারাটাকে দিয়ে এখ্‌খুনি একটা চিঠি পাঠিয়ে দিই গে। সুরেশের বাড়ির ঠিকানাটা কি? বলিয়া উঠিতে উদ্যত হইলেন।

আমি ত জানি নে বাবা।

তাও জান না? বল কি! বলিয়া বৃদ্ধ চেয়ারের উপর পুনরায় হেলান দিয়া পড়িলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠিয়া বসিয়া রুক্ষভাবে বলিতে লাগিলেন, তোমরা নিজের হাত-পা যদি নিজেই কেটে ফেলতে চাও, ত কাট গে মা, আমার ঠেকাবার দরকার নেই। ভাল, এটা ত একবার ভাবতে হয়, যে এক কথায় এতগুলো টাকা দিতে চায়, সে লোকটা কি দরের? তার বাড়ির ঠিকানাটাও কি জিজ্ঞাসা ক'রে রাখতে

নেই? তুমি যত বড় হ'চ্ছ, ততই যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছ অচলা। বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন।

ঋণ-জাল-বিজড়িত, বিপন্ন পিতা তাঁহার যে সকল অসত্য ও হীনতার মধ্য দিয়া সম্প্রতি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেন, সে সমস্তই অচলা দেখিতে পাইত। এ সকল তাহার মর্ম্মভেদ করিত, কিন্তু নীরবে সহ্য করিত। এখনও সে কথা কহিয়া তাঁহার অকারণ বিরক্তির প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু সে যে মনে মনে অতিশয় লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হইয়াছে, কেদারবাবু ইহাই নিশ্চিত অনুমান করিয়া প্রীত হইলেন।

বেয়ারা আলোক জ্বালিয়া দিয়া গেল। তিনি সস্নেহ তিরস্কারের স্বরে বলিতে লাগিলেন, মহিমের সম্বন্ধে কোন খোঁজ কোন দিনই তুমি নিলে না। আচ্ছা, সে না হয় ভালই হয়েছে। ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। কিন্তু সুরেশের সম্বন্ধে ত এ সব খাটতে পারে না। দেখলে না—ঈশ্বর স্বয়ং যেন হাত ধ'রে এঁকে দিয়ে গেলেন!

অচলা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সুরেশবাবুর কাছ থেকে কি তুমি টাকা ধার নেবে বাবা?

কেদারবাবুর ভগবদ্ভক্তি হঠাৎ বাধা পাইয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হাঁ—না, ঠিক ধার নয়। কি জান মা, সুরেশ না কি বড় ভাল ছেলে—এ কালে অমন একটি সৎ ছেলে লক্ষর মধ্যে একটি মেলে। তার মনের ইচ্ছে যে, বাড়িটা ধারের জন্য না নষ্ট হয়। থাকলে তোমাদেরই থাকবে—আমি আর কত দিন—বুঝলে না মা?

অচলা চুপ করিয়া রহিল। কেদারবাবু উৎসাহভরে বলিতে লাগিলেন, জান ত, আমি চিরকাল স্পষ্ট কথা ভালবাসি। মুখে এক, ভিতরে আর আমার দ্বারা হবার নয়। কাজেই খুলে ব'লে দিলাম যে, এখন সমস্ত জেনে শুনে মহিমের হাতে মেয়ে দেবার চেয়ে তাকে জলে ফেলে দেওয়া ভাল। সুরেশেরও যখন তাই মত, তখন বলতেই হ'ল যে, তার

বন্ধুর সঙ্গে বিয়ের কথাটা যখন অনেক দূর জানাজানি হয়ে গেছে, তখন সম্বন্ধ ভাঙলেই চলবে না—একটা গ'ড়ে তুলতেও হবে; না হ'লে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। কিন্তু যাই বল, ছেলে বটে এই সুরেশ! আমি মঙ্গলময়কে তাই বার বার প্রণাম জানাচ্ছি।

পিতার প্রণাম জানানো আর একবার নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইবার পর অচলা ধীরে ধীরে কহিল, এর কাছ থেকে এত টাকা না নিলেই কি নয় বাবা?

কেদারবাবু শঙ্কায় চকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, না নিলেই যে নয় মা! বেশ!

কিন্তু আমরা ত শোধ দিতে পারব না।

শোধ দেবার কথা কি সুরেশ—কথাটা উদ্বিগ্ন-সংশয়ে বৃদ্ধ শেষ করিতেই পারিলেন না। তাঁহার সমস্ত মুখ শাদা হইয়া গেল। অচলা সে চেহারা দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা পাইল। তাড়াতাড়ি বলিল, তিনি বলছিলেন, পরশু এসে টাকা দিয়ে যাবেন।

শোধ দেবার কথা—

না, তা, তিনি বলেন নি।

লেখাপড়া-টড়া—

না, সে ইচ্ছে বোধ হয় তাঁর একেবারে নেই।

ঠিক তাই! বলিয়া পরিতৃপ্তির রুদ্ধশ্বাস বৃদ্ধ ফোঁস করিয়া ত্যাগ করিলেন এবং চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া পা দুটা সুমুখের টেবিলের উপর তুলিয়া দিলেন। আনন্দে এবং আরামে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন ক্ষণকালের জন্য শিথিল হইয়া গেল। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া পা নামাইয়া উদ্দীপ্ত-স্বরে কহিলেন, একবার ভেবে দেখ দিকি মা, কোথেকে কি হ'ল? সেই সর্ব্বশক্তিমানের হাত কি এতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ না? অচলা নীরবে পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিল। তিনি

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই বলিতে লাগিলেন, আমি চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি, এ শুধু তাঁর দয়া। তোমাকে বলব কি মা, এই দুটো বৎসর একটা রাত্রিও আমি ভাল ক'রে ঘুমোতে পারি নি—শুধু তাঁকে ডেকেচি। আর সুরেশকে দেখবামাত্রই মনে হয়েছে, সে যেন পূর্ব্বজন্মে আমার সন্তান ছিল!

অচলা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পিতার সাংসারিক দুরবস্থার কথা সে জানিত বেশ, কিন্তু তাহা এতটা দূর পর্য্যন্ত ভিতরে ভিতরে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাই জানিত না। আজ দুই বৎসরের একাগ্র আরাধনায় তাঁহার দুঃখের সমস্যা যদি বা মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে অকস্মাৎ লঘু হইয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার নিজের সমস্যা একেবারে ভীষণ জটিল হইয়া দেখা দিল। সুরেশের কাছে টাকা লওয়া সম্বন্ধে সে এই মাত্র মনে মনে যে সকল সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা আবার তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। লেশমাত্র বাধা দিবার কথা সে আর মনে করিতেই পারিল না। যাই হোক, টাকাটা তাদের গ্রহণ করিতেই হইবে।

সান্ধ্য-উপাসনার জন্য কেদারবাবু উঠিয়া গেলেন। অচলা সমস্ত ব্যাপারটা গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত মনের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

যে দুই বন্ধু আজ অকস্মাৎ তাহার জীবনের এই সন্ধিস্থলে এমন পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের এক জনকে যে আজ 'যাও' বলিয়া বিদায় দিতেই হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু কাহাকে? কে সে? যে মহিম তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসে, কে জানে কোন্ কর্ত্তব্যের আকর্ষণে, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগে বসিয়া আছে, তাহার শান্ত স্থির মুখখানা মনে করিতেই একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে অচলার দুই চক্ষু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কোন দিন যে কোন অপরাধ করে নাই, অথচ

'যাও' বলিতেই সে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবে। এ জীবনে, কোন সূত্রে, কোন ছলেই আর তাহাদের পথে আসিবে না। অচলা স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, সেই অভাবনীয় চির-বিদায়ের ক্ষণেও তাহার অটল গাম্ভীর্য্য এক তিল বিচলিত হইবে না, কাহাকেও দোষ দিবে না, হয় ত কারণ পর্য্যন্তও জানিতে চাহিবে না—নিগূঢ় বিস্ময় ও তীব্র বেদনার একটা অস্পষ্ট রেখা হয় ত বা মুখের উপর দেখা দিবে, কিন্তু সে ছাড়া আর কাহারো তাহা চোখেও পড়িবে না।

তাহার পরে একদিন সুরেশের সঙ্গে বিবাহের কথা তার কানে উঠিবে। সেই মুহূর্তের অসতর্ক অবসরে হয় ত বা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িবে, না হয়, একটু মুচকিয়া হাসিয়াই নিজের কাজে মন দিবে! ব্যাপারটা কল্পনা করিয়াও এই নির্জ্জন ঘরের মধ্যে তাহার চোখ-মুখ লজ্জায়, ঘৃণায় রাঙা হইয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

দিন দশ-বার কাটিয়া গিয়াছে। কেদারবাবুর ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয়, এত স্ফূর্ত্তি বুঝি তাহার যুবা বয়সেও ছিল না, আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বায়স্কোপ দেখিয়া ফিরিবার পথে গোলদীঘির কাছাকাছি আসিয়া তিনি হঠাৎ গাড়ী হইতে নামিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, সুরেশ, আমি এইটুকু হেঁটে সমাজে যাব, বাবা, তোমরা বাড়ি যাও; বলিয়া হাতের ছড়িটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বেগে চলিয়া গেলেন। সুরেশ কহিল, তোমার বাবার শরীরটা আজকাল বেশ ভাল ব'লে মনে হয়।

অচলা সেই দিকেই চাহিয়াছিল, বলিল, হাঁ, সে আপনার দয়ায়।

গাড়ী মোড় ফিরিতে আর তাঁহাকে দেখা গেল না। সুরেশ

অচলার ডান-হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, তুমি জানো এ কথায় আমি কত ব্যথা পাই। সেই জন্যেই কি তুমি বারবার বল অচলা ?

অচলা একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, এত বড় দয়া পাছে ভুলে যাই ব'লেই যখন তখন স্মরণ করি। আপনাকে ব্যথা দেবার জন্য বলি নে।

সুরেশ তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়া বলিল, সেই জন্যেই ব্যথা আমার বেশি বাজে।

কেন ?

আমি বেশ বুঝতে পারি, শুধু এই দয়াটা স্মরণ ক'রেই তুমি মনের মধ্যে জোর পাও। এ ছাড়া তোমার আর এতটুকু সম্বল নেই, সত্যি কি না বল দিকি ?

যদি না বলি ?

ইচ্ছে না হয়, ব'ল না। কিন্তু আমাকে 'তুমি' বলতেও কি কোন দিন পারবে না ?

অচলার মুখ মলিন হইয়া গেল। আনত মুখে ধীরে ধীরে বলিল, একদিন বলতেই হবে, সে ত আপনি জানেন।

তাহার ম্লান মুখ লক্ষ্য করিয়া সুরেশ নিশ্বাস ফেলিল। কহিল, তাই যদি হয়, দুদিন আগে বলতেই বা দোষ কি ?

অচলা জবাব দিল না। অন্যমনস্কের মত পথের দিকে চাহিয়া রহিল। মিনিট-খানেক নিঃশব্দে থাকিয়া সুরেশ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আমার মনে হয়, মহিম সমস্তই জানতে পেরেছে।

অচলা চমকাইয়া মুখ ফিরাইল। তাহার একটা হাত এতক্ষণ পর্যন্ত সুরেশের হাতের মধ্যেই ধরা ছিল, সেটা টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ক'রে জানলেন ?

তাহার ব্যগ্র কণ্ঠ সুরেশের কানে খট্ করিয়া বাজিল। কহিল, নইলে এত দিনে সে আস্ত। পোনর-ষোল দিন কেটে গেল ত!

অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, আজ নিয়ে উনিশ দিন। আচ্ছা, বাবা কি তাঁকে কোন চিঠিপত্র লিখেছেন, আপনি জানেন?

সুরেশ সংক্ষেপে কহিল, না, জানি নে।

তিনি বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন কি না, জানেন?

না, তাও জানি নে।

অচলা গাড়ীর বাহিরে পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, তা হ'লে খোঁজ নিয়ে একখানা চিঠিতে তাঁকে সমস্ত কথা জানানো বাবার উচিত। হঠাৎ কোন দিন আবার না এসে উপস্থিত হন।

আবার কিছুক্ষণের জন্য উভয়ে নীরব হইয়া রহিল। সুরেশ আর একবার তাহার শিথিল হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, আমার সব চেয়ে কষ্ট হয় অচলা, যখন মনে হয়, আমাকে কোন দিন শ্রদ্ধা পর্য্যন্ত করতে পারবে না। তোমার চিরকাল মনে হবে, শুধু টাকার জোরেই তোমাকে ছিঁড়ে এনেচি। আমার দোষ।

অচলা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া বাধা দিয়া বলিল, এমন কথা আপনি বলবেন না—আপনার কোন দোষ আমি দিতে পারি নে। একটু থামিয়া বলিল, টাকার জোর সংসারে সর্ব্বত্রই আছে, এ ত জানা কথা; কিন্তু সে জোরে আপনি ত জোর খাটান নি। বাবা না জানতে পারেন, কিন্তু আমি সমস্ত জেনেশুনে যদি আপনাকে অশ্রদ্ধা করি, ত আমার নরকেও স্থান হবে না।

চিরদিন সামান্য একটু করুণ কথাতেই সুরেশ বিগলিত হইয়া যায়। অচলার এইটুকু প্রিয়-বাক্যেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে জল, সে অচলার হাত দুখানি তুলিয়া ধরিয়া তাহাতেই মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, মনে ক'রো না, এ অপরাধ, এ অন্যায়ের পরিমাণ আমি বুঝতে

পারি নে। কিন্তু আমি বড় দুর্ব্বল। বড় দুর্ব্বল! এ আঘাত মহিম সইতে পারবে—কিন্তু আমার বুক ফেটে যাবে। বলিয়া একটা কঠিন ধাক্কা যেন সামলাইয়া ফেলিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, তুমি যে আমার নও, আর একজনের, এ কথা আমি ভাবতেই পারি নে। তোমাকে পাব না মনে হ'লেই আমার পায়ের নিচে মাটি পর্য্যন্ত যেন টলতে থাকে।

সেইমাত্র পথের ধারে গ্যাস জ্বালা হইতেছিল। গাড়ী তাহাদের গলিতে ঢুকিতেই একটা উজ্জ্বল আলো সুরেশের মুখের উপর পড়িয়া তাহার দুই চক্ষের টলটলে জল অচলার চোখে পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তের করুণায় সে কোনদিন যাহা করে নাই, আজ তাহাই করিয়া বসিল। সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিয়া ফেলিল, আমি কোনদিনই বাবার অবাধ্য নই। তিনি আমাকে ত তোমার হাতেই দিয়েছেন।

সুরেশ অচলার সেই হাতটি নিজের মুখের উপর টানিয়া লইয়া বারংবার চুম্বন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, এই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার অচলা, এর বেশি আর চাই নে। কিন্তু, এটুকু থেকে যেন আমাকে বঞ্চিত ক'রো না।

গাড়ী বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সহিস দ্বার খুলিয়া সরিয়া গেল, সুরেশ নিজে নামিয়া সযত্নে সাবধানে অচলার হাত ধরিয়া তাহাকে নিচে নামাইয়া উভয়েই একসঙ্গে চাহিয়া দেখিল, ঠিক সম্মুখে মহিম দাঁড়াইয়া এবং সেই নিমিষের দৃষ্টিপাতেই এই দুটি নর-নারী একেবারে যেন পাথরে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

পরক্ষণেই অচলা অব্যক্ত আর্ত্তস্বরে কি একটা শব্দ করিয়া সজোরে হাত টানিয়া লইয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল।

মহিম বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, সুরেশ, তুমি যে এখানে? সুরেশের গলা দিয়া প্রথমে কথা ফুটিল না। তার পরে সে একটা ঢোক

গিলিয়া পাংশু মুখে শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, বাঃ—মহিম যে! আর দেখাই নেই। ব্যাপার কি হে? কবে এলে? চল চল, ওপরে চল। বলিয়া কাছে আসিয়া তাহার হাতটা নাড়িয়া দিয়া হাসির ভঙ্গিতে কহিল, আচ্ছা মজা করলেন কিন্তু আপনার বাবা। তিনি গেলেন সমাজে, আর পৌঁছে দেবার ভার পড়ল এই গরীবের ওপরে। তা একরকম ভালই হয়েচে—নইলে মহিমের সঙ্গে হয় ত দেখাই হ'ত না। বাড়িতে এত দিন ধ'রে কর্‌ছিলে কি বল ত শুনি?

মহিম কহিল, কাজ ছিল। বিস্ময়ের প্রভাবে তাহার অচলাকে একটা নমস্কার করিবার কথাও মনে হইল না।

সুরেশ তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, আচ্ছা লোক যাহোক! আমরা ভেবে মরি, একটা চিঠি পর্য্যন্ত দিতে নেই? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ওপরে চল। বলিয়া তাহাকে এক রকম জোর করিয়াই উপরে ঠেলিয়া লইয়া গেল। কিন্তু বসিবার ঘরে আসিয়া যখন সকলে উপবেশন করিল, তখন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাহার অস্বাভাবিক প্রগল্‌ভতা একেবারে থামিয়া গেল। গ্যাসের তীব্র আলোকে মুখখানা তাহার কালি-বর্ণ হইয়া উঠিল। মিনিট দুই-তিন কেহই কোন কথা কহিল না। মহিম একবার বন্ধুর প্রতি একবার অচলার প্রতি শূন্য দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সব ভাল?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিল না। মহিম কহিল, আমি ভয়ানক আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি—কিন্তু সুরেশের সঙ্গে তোমাদের আলাপ হ'ল কি ক'রে?

অচলা মুখ তুলিয়া ঠিক যেন মরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিল, উনি বাবার চার হাজার টাকা দেনা শোধ ক'রে দিয়েছেন। তাহার মুখ দেখিয়া মহিমের নিজের মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—তার পরে?

তার পরে তুমি বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'রো, বলিয়া অচলা ত্বরিতপদে

উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। মহিম কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অবশেষে বন্ধুর প্রতি চাহিয়া কহিল, ব্যাপার কি সুরেশ ?

সুরেশ উদ্ধতভাবে জবাব দিল, তোমার মত আমার টাকাটাই প্রাণ নয়! ভদ্রলোক বিপদে প'ড়ে সাহায্য চাইলে আমি দিই—ব্যস্ এই পর্য্যন্ত। তিনি শোধ দিতে না পারেন ত আশা করি, সে দোষ আমার নয়। তবু যদি আমাকেই দোষী মনে কর ত একশবার কর্‌তে পার, আমার কোন আপত্তি নেই।

বন্ধুর এই অসংলগ্ন কৈফিয়ৎ এবং তাহা প্রকাশ করিবার অপরূপ ভঙ্গি দেখিয়া মহিম যথার্থই মূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিয়া, শেষে বলিল, হঠাৎ তোমাকেই বা দোষী ভাবতে যাব কেন, তার কোন তাৎপর্য্যই ত ভেবে পেলুম না সুরেশ। দয়া ক'রে আর একটু খুলে না বল্‌লে ত বুঝতে পার্‌ব না।

সুরেশ তেমনি রুক্ষস্বরে কহিল, খুলে আবার বল্‌ব কি! বল্‌বার আছেই বা কি!

মহিম কহিল, তা আছে। আমি সে দিন যখন বাড়ি যাই, তখন এদের তুমি চিন্‌তে না। এর মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলই বা কি ক'রে, আর একটা ব্রাহ্ম-পরিবারের বিপদে চার হাজার টাকা দেবার মত তোমার মনের এতখানি উদারতা এল কোথা থেকে, আপাততঃ এইটুকুই বুঝিয়ে দিলেই আমি কৃতার্থ হব সুরেশ।

সুরেশ বলিল, তা হ'তে পারে। কিন্তু আমার গল্প কর্‌বার এখন সময় নেই—এখুনি উঠতে হবে। তা ছাড়া, কেদারবাবুকেই জিজ্ঞাসা ক'রো না, তিনি সমস্ত বল্‌বার জন্যেই ত অপেক্ষা ক'রে আছেন।

তাই ভাল, বলিয়া মহিম উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, শোন্‌বার ভারি কৌতূহল ছিল, কিন্তু তবু এখন তাঁর অপেক্ষায় ব'সে থাক্‌বার সময় নেই। আমি চল্‌লুম—

সুরেশ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল—কোন কথা কহিল না।

মহিম বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইল, সুমুখের রেলিঙ ধরিয়া, এই দিকে চাহিয়াই অন্ধকারে অচলা দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু সে কাছে আসিবার বা কথা কহিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিল না, দেখিয়া সে-ও নীরবে সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে নিচে নামিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

কয়েকটা অত্যন্ত জরুরি ঔষধ কিনিতে মহিম কলিকাতায় আসিয়াছিল, সুতরাং রাত্রের গাড়ীতেই বাড়ি ফিরিয়া গেল। সুরেশ সন্ধান লইয়া জানিল, মহিম তাহার বাসায় আসে নাই, দিন-চারেক পরে বিকাল-বেলায় কেদারবাবুর বসিবার ঘরে বসিয়া এই আলোচনাই বোধ করি চলিতেছিল। কেদারবাবু বায়স্কোপে নূতন মাতিয়াছিলেন; কথা ছিল, চা খাওয়ার পরেই তাঁহারা আজও বাহির হইয়া পড়িবেন। সুরেশের গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল—এমনি সময়ে দুর্গ্রহের মত ধীরে ধীরে মহিম আসিয়া অকস্মাৎ দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।

সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল এবং সকলের মুখের ভাবেই একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল।

কেদারবাবু বিরস মুখে, জোর করিয়া একটু হাসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, এস মহিম। সব খবর ভাল?

মহিম নমস্কার করিয়া ভিতরে আসিয়া বসিল। বাড়িতে এতদিন বিলম্ব হইবার কারণ জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে শুধু জানাইল যে, বিশেষ কাজ ছিল। সুরেশ টেবিলের উপর হইতে সে দিনের খবরের কাগজটা হাতে লইয়া পড়িতে লাগিল এবং অচলা পাশের চৌকি হইতে তাহার সেলাইটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিল। সুতরাং কথাবার্ত্তা একা কেদারবাবুর সঙ্গেই চলিতে লাগিল।

হঠাৎ এক সময়ে অচলা বাহিরে উঠিয়া গিয়া মিনিট-খানেক পরেই ফিরিয়া আসিয়া বসিল এবং ক্ষণেক পরেই মাথার উপরে টানা-পাখাটা নড়িয়া ভুলিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। হঠাৎ বাতাস পাইয়া কেদারবাবু খুশী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তবু ভাল। পাখাওয়ালা ব্যাটার এতক্ষণে দয়া হ'ল।

সুরেশ তীক্ষ্ণ, বক্র দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল, মহিমের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়াছে। কেন অচলা উঠিয়া গিয়াছিল, কেন পাখাওয়ালার অকারণে দয়া প্রকাশ পাইল, সমস্ত ইতিহাসটা তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে খেলিয়া গিয়া, যে বাতাসে কেদারবাবু খুশী হইলেন, সেই বাতাসেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতে লাগিল। সে হঠাৎ ঘড়ি খুলিয়া তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, পাঁচটা বেজে গেছে—আর দেরি করলে চল্‌বে না কেদারবাবু।

কেদারবাবু আলাপ বন্ধ করিয়া চায়ের জন্য হাঁকা-হাঁকি করিতেই বেয়ারা সমস্ত সরঞ্জাম আনিয়া হাজির করিয়া দিল। সেলাই রাখিয়া দিয়া অচলা পেয়ালা-দুই চা তৈরী করিয়া সুরেশ ও পিতার সম্মুখে আগাইয়া দিতেই, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি খাবে না মা?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না বাবা, বড় গরম।

হঠাৎ তাঁহার মহিমের প্রতি দৃষ্টি পড়ায়, ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ও কি, মহিমকে দিলে না যে! তুমি কি চা খাবে না মহিম?

সে জবাব দিবার পূর্ব্বেই অচলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, এত গরমে তোমার খেয়ে কাজ নেই। তা ছাড়া এ বেলা ত তোমার চা সহ্য হয় না।

মহিমের বুকের উপর হইতে কে যেন অসহ্য গুরুভার পাষাণের বোঝা মায়ামন্ত্রে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। সে কথা কহিতে পারিল না, শুধু অব্যক্ত বিস্ময়ে নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিল। অচলা কহিল, একটুখানি সবুর

কর, আমি লাইম-জুস দিয়ে সরবৎ তৈরী ক'রে আন্‌চি। বলিয়া সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সুরেশ আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া কলের পুতুলের মত ধীরে ধীরে চা খাইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার প্রতি বিন্দু তখন তাহার মুখে বিস্বাদ ও তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

চা-পান শেষ করিয়া কেদারবাবু তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া তৈরী হইয়া আসিয়া দেখিলেন, অচলা নিজের জায়গায় বসিয়া একমনে সেলাই করিতেছে। ব্যস্ত এবং আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, এখনো ব'সে কাপড় সেলাই করচ, তৈরী হয়ে নাও নি যে?

অচলা মুখ তুলিয়া শ্রান্তভাবে কহিল, আমি যাব না বাবা।

যাবে না! সে কি কথা?

না বাবা, আজ তোমরা যাও—আমার ভাল লাগচে না। বলিয়া একটুখানি হাসিল।

সুরেশ অভিমান ও গূঢ় ক্রোধ দমন করিয়া কহিল, চলুন কেদারবাবু, আজ আমরাই যাই। ওঁর হয় ত শরীর ভাল নেই, কাজ কি পীড়াপীড়ি ক'রে?

কেদারবাবু তাহার প্রতি চাহিয়াই তাহার ভিতরের ক্রোধ টের পাইলেন। মেয়েকে কহিলেন, তোমার কি কোন রকম অসুখ করচে?

অচলা কহিল, না বাবা, অসুখ করবে কেন, আমি ভাল আছি।

সুরেশ মহিমের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিল না; বলিল, আমরা যাই চলুন কেদারবাবু! ওঁর বাড়িতে কোন রকম আবশ্যক থাকতে পারে—জোর ক'রে নিয়ে যাবার দরকার কি?

কেদারবাবু কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়িতে তোমার কাজ আছে?

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

কেদারবাবু অকস্মাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন, বল্‌চি চল! অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়ে!

অচলার হাতের সেলাই স্খলিত হইয়া নিচে পড়িয়া গেল। সে স্তম্ভিত-মুখে দুই চক্ষু ডাগর করিয়া প্রথমে সুরেশের, পরে তাহার পিতার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া, অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া দ্রুতবেগে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সুরেশ মুখ কালি করিয়া কহিল, আপনার সবতাতেই জবরদস্তি। কিন্তু আমি আর দেরি করতে পারি নে—অনুমতি করেন ত যাই।

কেদারবাবু নিজের অভদ্র-আচরণে মনে মনে লজ্জিত হইতে-ছিলেন—সুরেশের কথায় রাগিয়া উঠিলেন। কিন্তু রাগটা পড়িল মহিমের উপর। সে নিরতিশয় ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠি উঠি করিতেছিল। কেদারবাবু বলিলেন, তোমার কি কোন আবশ্যক আছে মহিম?

মহিম আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না।

কেদারবাবু চলিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, তা হ'লে আজ আমরা একটু ব্যস্ত আছি, আর একদিন এলে—

মহিম কহিল, যে আজ্ঞে, আস্‌ব। কিন্তু আসার কি বিশেষ প্রয়োজন আছে?

কেদারবাবু সুরেশকে শুনাইয়া কহিলেন, আমার নিজের কোন প্রয়োজন নাই। তবে যদি দরকার মনে কর, এসো—দু-একটা বিষয় আলোচনা করা যাবে।

তিন জনেই বাহির হইয়া পড়িলেন। নিচে আসিয়া মহিমকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া সুরেশ কেদারবাবুকে লইয়া তাহার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। কোচম্যান গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

মহিম খানিকটা পথ আসিয়াই পিছনে তাহার নাম শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, কেদারবাবুর বেহারা। সে বেচারা হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাছে আসিয়া এক টুক্‌রা কাগজ হাতে দিল। তাহাতে

পেন্সিল দিয়া 'শুধু লেখা ছিল, অচলা। বেহারা কহিল, একবার ফিরে যেতে বল্‌লেন।

ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়িতে পা দিয়াই দেখিতে পাইল—অচলা সুমুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার আরক্ত চক্ষুর পাতা তখনও আর্দ্র রহিয়াছে। কাছে আসিতেই বলিল, তুমি কি তোমার কসাই বন্ধুর হাতে আমাকে জবাই কর্‌বার জন্যে রেখে গেলে? যে তোমার ওপর এত বড় কৃতঘ্নতা কর্‌তে পারলে, তার হাতে আমাকে ফেলে যাচ্চো কি ব'লে? বলিয়াই ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মহিম স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিনিট্-দুই পরে আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, আমার লজ্জা করবার আর সময় নেই। দেখি তোমার ডানহাতটি। বলিয়া নিজেই মহিমের দক্ষিণ হস্ত টানিয়া লইয়া নিজের আঙ্গুল হইতে সোনার আঙটীটি খুলিয়া তাহার আঙ্গুলে পরাইয়া দিতে-দিতে কহিল, আমি আর ভাবতে পারি নে। এইবার যা কর্‌বার তুমি ক'রো। বলিয়া গড় হইয়া পায়ের কাছে একটা নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল।

মহিম ভাল-মন্দ কোন কথা কহিল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রেলিঙটার উপর ভর দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, পুনরায় ধীরে ধীরে নামিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর নত-মস্তকে ধীরে ধীরে মহিম যখন তাহার বাসার-দিকে পথ চলিতেছিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া কাহারও বলিবার সাধ্য ছিল না যে, ঠিক সেই সময়ে তাহার সমস্ত প্রাণটা যন্ত্রণায় বাহিরে আসিবার জন্য তাহারই হৃদয়ের দেয়ালে প্রাণপণে গহ্বর খনন করিতেছিল।

কি করিয়া সুরেশ এখানে আসিল, কেমন করিয়া এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিল—এই সব ছোটখাটো ইতিহাস এখনো সে জানিতে পারে নাই বটে, কিন্তু আসল জিনিসটা আর তাহার অবিদিত ছিল না। কেদারবাবুকে সে চিনিত। যেখানে টাকার গন্ধ একবার তিনি পাইয়াছেন, সেখান হইতে সহজে কোনমতেই যে তিনি মুখ ফিরাইয়া লইবেন না, ইহাতে তাহার কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। সুরেশকেও সে ছেলেবেলা হইতে নানারূপেই দেখিয়া আসিয়াছে। দৈবাৎ যাহাকে সে ভালবাসে, তাহাকে পাইবার জন্য সে কি যে দিতে না পারে, তাহাও কল্পনা করা কঠিন। টাকা ত কিছুই নয়—এ ত চিরদিনই তাহার কাছে অতি তুচ্ছ বস্তু। একদিন তাহারই জন্য যে, মুঙ্গেরের গঙ্গায় নিজের প্রাণটার দিকেও চাহে নাই, আজ যদি সে আর একজনের ভালবাসার প্রবলতর মোহে সেই মহিমের প্রতি দৃক্‌পাত না করে ত তাহাকে দোষ দিবে সে কি করিয়া? সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা একটা মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করা ব্যতীত, কাহারও উপর সে বিশেষ কোন দোষারোপ করিল না। কিন্তু এই যে এতগুলা বিরুদ্ধ ও প্রচণ্ড শক্তি সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, এতগুলিকে প্রতিহত করিয়া অচলা যে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিবে, এ বিশ্বাস তাহার ছিল না; তাই তাহার শেষ কথা, তাহার শেষ আচরণ ক্ষণকালের নিমিত্ত চঞ্চল করা ভিন্ন মহিমকে সত্যকার ভরসা কিছুই দেয় নাই। আঙটীটার পানে বারংবার চাহিয়াও সে কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিল না। অথচ, শেষ-নিষ্পত্তি হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। এমন করিয়া নিজেকে ভুলাইয়া আর একটা মুহূর্ত্তও কাটানো চলে না। যা হবার, তা হোক্, চরম একটা মীমাংসা করিয়া সে লইবেই। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়াই আজ সে তাহার দীন-দরিদ্র ছাত্রাবাসে গিয়া রাত্রি আটটার পর হাজির হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন অপরাহ্নকালে কেদারবাবুর বাটীতে গিয়া খবর পাইল, তাঁহারা এইমাত্র বাহির হইয়া গিয়াছেন—কোথায় নিমন্ত্রণ আছে। তাহার পরদিন গিয়াও দেখা হইল না। বেহারা জানাইল, সকলে বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছেন, ফিরিতে রাত্রি হইবে। সকলে যে কে তাহা প্রশ্ন না করিয়াও মহিম অনুমান করিতে পারিল। অপমান এবং অভিমান যত বড়ই হোক, উপর্য্যুপরি দুই দিন ফিরিয়া আসাই তাহার মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারিত; কিন্তু হাতের আঙটীটা তাহাকে তাহার বাসায় টিকিতে দিল না, পরদিন পুনরায় তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিল। আজ শুনিতে পাইল, বাবু বাড়ি আছেন—উপরের ঘরে বসিয়া চা পান করিতেছেন। মহিমকে দ্বারের কাছে দেখিয়া কেদারবাবু মুখ তুলিয়া গম্ভীর স্বরে শুধু বলিলেন, এসো মহিম। মহিম হাত তুলিয়া নিঃশব্দে নমস্কার করিল।

দূরে খোলা জানালার ধারে একটা সোফার উপর পাশা-পাশি বসিয়া অচলা এবং সুরেশ। অচলার কোলের উপর একটা ভারি ছবির বই। দুজনে মিলিয়া ছবি দেখিতেছিল। সুরেশ পলকের জন্য চোখ তুলিয়াই, পুনরায় ছবি দেখায় মনঃসংযোগ করিল; কিন্তু অচলা চাহিয়াও দেখিল না। তাহার অবনত মুখখানি দেখা গেল না বটে, কিন্তু সে যেরূপ একান্ত আগ্রহভরে তাহার বইয়ের পাতার দিকে ঝুঁকিয়া রহিল, তাহাতে এমন মনে করা একেবারেই অসঙ্গত হইত না, যে পিতার কণ্ঠস্বর, আগন্তুকের পদশব্দ—কিছুই তাহার কানে যায় নাই।

মহিম ঘরে ঢুকিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। কেদারবাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন কথা কহিলেন না—একটু একটু করিয়া চা পান করিতে লাগিলেন। বাটিটা যখন নিঃশেষ হইয়া গেল এবং আর চুপ করিয়া থাকা নিতান্তই অসম্ভব

হইয়া উঠিল, তখন সেটা মুখ হইতে নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, তা হ'লে এখন কি কর্‌চ? তোমাদের আইনের খবর বার হ'তে এখনো ত মাস-খানেক দেরি আছ ব'লে মনে হচ্চে।

মহিম শুধু কহিল, আজ্ঞে হাঁ।

কেদারবাবু বলিলেন, না হয় পাশই হ'লে—তা পাশ তুমি হবে, আমার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কিছুদিন প্র্যাক্‌টিস্ ক'রে হাতে টাকা কিছু না জমিয়ে ত আর কোন দিকে মন দিতে পার্‌বে না? কি বল সুরেশ, মহিমের সাংসারিক অবস্থা ত শুন্‌তে পাই তেমন ভাল নয়।

সুরেশ কথা কহিল না। মহিম একটু হাসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, প্র্যাকটিস্ কর্‌লেই যে হাতে টাকা জমবে, তারও ত কোন নিশ্চয়তা নাই।

কেদারবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না, তা নেই—ঈশ্বরের হাত, কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, 'পুরুষসিংহ'; তোমাকে সেই পুরুষসিংহ হ'তে হবে। আর কোন দিকে নজর থাক্‌বে না—শুধু উন্নতি আর উন্নতি। তার পরে সংসারধর্ম্ম কর—যা ইচ্ছা কর, কোন দোষ নেই—তা নইলে যে মহাপাপ! বলিয়া সুরেশের পানে একবার চাহিয়া কহিলেন, কি বল সুরেশ—তাদের খাওয়াতে পরাতে পারব না, সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতে পারব না—এম্‌নি ক'রেই ত হিন্দুরা উচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাও যদি সৎদৃষ্টান্ত না দেখাই, তা হ'লে সভ্য-জগতের কোন মতে কারো কাছে মুখ দেখাতে পর্য্যন্ত পারব না, ঠিক কি না? কি বল সুরেশ?

সুরেশ পূর্ব্ববৎ মৌন হইয়া রহিল; মহিম ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, আপনার উপদেশ আমি মনে রাখব। কিন্তু আপনি কি এই আলোচনা কর্‌বার জন্যই আমাকে আস্‌তে বলেছিলেন?

কেদারবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিলেন; বলিলেন, না, শুধু এই নয়, আরও কথা আছে, কিন্তু—, বলিয়া তিনি সোফার দিকে চাহিলেন।

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা তা হ'লে ও ঘরে গিয়ে একটু বসি, বলিয়া হেঁট হইয়া অচলার ক্রোড়ের উপর হইতে ছবির বইখানা তুলিয়া লইল। তাহার এই ইঙ্গিতটুকু কিন্তু অচলার কাছে একেবারে নিষ্ফল হইয়া গেল। সে যেমন বসিয়া ছিল, তেমনি রহিল, উঠিবার লেশমাত্র উদ্যোগ করিল না। কেদারবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা দুজনে একটুখানি ও-ঘরে গিয়ে ব'সো গে মা, মহিমের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

অচলা মুখ তুলিয়া পিতার মুখের পানে চাহিয়া শুধু কহিল, আমি থাকি বাবা।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা, বেশ, আমিই না হয় যাচ্ছি, বলিয়া একরকম রাগ করিয়াই হাতের বইটা অচলার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া সশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কন্যার অবাধ্যতায় কেদারবাবু যে খুসী হইলেন না, তাহা তিনি তাঁহার মুখের ভাবে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন; কিন্তু জিদ্‌ও করিলেন না। খানিকক্ষণ রুষ্ট মুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, মহিম, তুমি মনে ক'রো না, আমি তোমার উপর বিরক্ত; বরঞ্চ তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধাই আছে। তাই বন্ধুর মত উপদেশ দিচ্ছি যে, এখন কোন প্রকার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে নিজেকে অকর্ম্মণ্য ক'রে তুলো না। নিজের উন্নতি কর, কৃতী হও, তার পরে দায়িত্ব নেবার যথেষ্ট সময় পাবে।

মহিম মুখ ফিরাইয়া একবার অচলার পানে চাহিল। সে চক্ষের পলকে চোখ নামাইয়া ফেলিল। তখন তাহার পিতার পানে চাহিয়া

কহিল, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য; কিন্তু আপনার কন্যারও কি তাই ইচ্ছা?

কেদারবাবু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়! নিশ্চয়! মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন, অন্ততঃ এটা ত নিশ্চয় যে, সমস্ত জেনে-শুনে তোমার হাতে আমি মেয়েকে বিসর্জ্জন দিতে পারব না।

মহিম শান্তস্বরে কহিল, ইংরেজদের একটা প্রথা আছে, এ রকম অবস্থায় তারা পরস্পরের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকে। আপনার সেই অভিপ্রায়ই কি আমি বুঝব?

কেদারবাবু হঠাৎ আগুন হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, দেখ মহিম, আমি তোমার কাছে হলফ নেবার জন্য তোমাকে ডাকি নি। তুমি যে রকম ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করেচ, তাতে আর কোন বাপ হ'লে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হয়ে যেত। কিন্তু আমি নিতান্ত শান্তিপ্রিয় লোক, কোন রকমের গোলমাল, হাঙ্গামা ভালবাসি নে ব'লেই, যতটা সম্ভব মিষ্টি কথায় আমাদের মনের ভাব তোমাকে জানিয়ে দিলুম। তাতে তুমি অপেক্ষা ক'রে থাকবে, কি থাকবে না, সাহেবেরা কি করে, এত কৈফিয়তে ত আমাদের প্রয়োজন দেখি নে। তা ছাড়া, আমরা ইংরাজ নই, বাঙ্গালী; মেয়ে আমাদের বড় হয়ে উঠলেই বাপ-মায়ের চোখে ঘুম আসে না, মুখে অন্ন-জল রোচে না, এ কথা তুমি নিজেই কোন্ না জান?

মহিমের চোখ-মুখ পলকের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে বলিল, আমি কি ব্যবহার করেচি, যার জন্যে অন্যত্র এত বড় কাণ্ড হ'তে পারত—এ প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চাই নে। শুধু আপনার কন্যার নিজের মুখে একবার শুনতে চাই, তাঁরও এই অভিপ্রায় কি না! বলিয়া নিজেই উঠিয়া গিয়া অচলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, কেমন, এই ত?

অচলা মুখ তুলিল না, কথা কহিল না।

একটা উচ্ছ্বসিত বাষ্প মহিম সবলে নিরোধ করিয়া পুনরায় কহিল, তোমার মনের কথা নিভৃতে জান্‌বার, জিজ্ঞেস ক'রে জান্‌বার অবকাশ আমি পেলুম না—সে জন্যে আমি মাপ চাচ্চি। সে দিন সন্ধ্যা-বেলায় ঝোঁকের উপর যে কাজ ক'রে ফেলেছিলে, তার জন্যেও তোমাকে কোন জবাব-দিহি করতে হবে না। শুধু একবার বল, সেই আংটীটা ফিরে চাও কি না!

সুরেশ ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া কহিল, আমাকে মাপ কর্‌তে হবে কেদারবাবু, আমার আর এক মিনিট অপেক্ষা কর্‌বার যো নেই।

উপস্থিত সকলেই মৌন-বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া চাহিল। কেদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

সুরেশ অভিনয়ের ভঙ্গিতে হাত দুটো বাড়াইয়া দিয়া বলিল, না, না—এ ভুলের মার্জ্জনা নেই। আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ আজ প্লেগে মৃতকল্প, আর আমি কি না সমস্ত ভুলে গিয়ে, এখানে ব'সে বৃথা সময় নষ্ট কর্‌চি!

কেদারবাবু শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, বল কি সুরেশ, প্লেগ? যাবে না কি সেখানে?

সুরেশ একটু হাসিয়া বলিল, নিশ্চয়! অনেক পূর্ব্বেই আমার সেখানে যাওয়া উচিত ছিল।

কেদারবাবু অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, কিন্তু প্লেগ যে! তিনি কি তোমার এমন বিশেষ কোন আত্মীয়—

সুরেশ কহিল, আত্মীয়! আত্মীয়ের অনেক বড়, কেদারবাবু! মহিমের প্রতি কটাক্ষ করিয়া এই প্রথম কথা কহিল, বুলিলু, মহিম, আমাদের নিশীথের কাল রাত্রি থেকেই প্লেগ হয়েছে, বাঁচে যে, এ আশা নেই। আমার তোমাকেও একবার বলা উচিত—যাবে দেখতে?

মহিম নিশীথ লোকটিকে চিনিতে পারিল না। কহিল, কোন্ নিশীথ?

কোন্ নিশীথ? বল কি মহিম? এরই মধ্যে আমাদের নিশীথকে ভুলে গেলে? যার সঙ্গে সমস্ত সেকেণ্ড-ইয়ারটা পড়লে, তাকে তার এত বড় বিপদের দিনে আর মনে পড়ছে না? বলিয়া ঘাড় ফিরাইয়া, একবার অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া লইয়া শ্লেষের স্বরে বলিল, তা মনে পড়বে না বটে! প্লেগ কি না!

এই খোঁচাটুকু মহিম নীরবে সহ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি ভবানীপুর থেকে আস্তেন?

সুরেশ ব্যঙ্গ করিয়া জবাব দিল, হাঁ, তাই। কিন্তু নিশীথ ত আমাদের দু-চার জন ছিল না মহিম, যে, এতক্ষণ তোমার মনে পড়ে নি। বলি যাবে কি?

মহিম চিনিতে পারিয়া কহিল, নিশীথ কোথায় থাকে এখন?

সুরেশ কহিল, আর কোথায়? নিজের বাড়িতে ভবানীপুরে। এ সময়ে তাকে একবার দেখা দেওয়া কি কর্ত্তব্য ব'লে মনে হয় না? আমি ডাক্তার, আমাকে ত যেতেই হবে; আর অত বড় বন্ধুত্ব ভুলে গিয়ে না থাক ত তুমিও আমার সঙ্গে যেতে পার। কেদারবাবু, আপনাদের কথা বোধ করি, শেষ হয়ে গেছে। আশা করি, অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যেও ওকে একবার ছুটী দিতে পারবেন?

এ বিদ্রূপটা যে আবার কাহার উপর হইল, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া, কেদারবাবু উদ্বিগ্নমুখে একবার মহিমের, একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার এই বড়লোক ভাবী জামাতাটির মান-অভিমান যে কিসে এবং কতটুকুতে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, আজও বৃদ্ধ তাহার কূলকিনারা ঠাহর করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, মহিমও হতবুদ্ধির মত নীরবে চাহিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে অচলার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া, হাতের বইখানা সুমুখের টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া

এতক্ষণ পরে কথা কহিল ; বলিল, তুমি ডাক্তার, তোমার ত যাওয়াই উচিত ; কিন্তু ওঁর ওকালতির কেতাবের মধ্যে ত প্লেগের চিকিৎসা লেখা নেই ? উনি যাবেন কি জন্যে শুনি ?

এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত জবাবে সুরেশ অবাক্ হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, আমি সেখানে ডাক্তারি করতে যাচ্ছি নে, তার ডাক্তারের অভাব নেই। আমি যাচ্ছি বন্ধুর সেবা করতে। বন্ধুত্বটা আমার প্রাণটার চেয়েও বড় ব'লে মনে করি।

একটা নিষ্ঠুর হাসির আভাস অচলার ওষ্ঠাধরে খেলিয়া গেল ; কহিল, সকলেই যে তোমার মত মহৎ হবে, এমন ত কোন কথা নেই। অতবড় বন্ধুত্বজ্ঞান যদি ওঁর না থাকে ত আমি লজ্জার মনে করি নে। সে যাই হোক, ও জায়গায় ওঁর কিছুতেই যাওয়া হবে না।

সুরেশের মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল। কেদারবাবু সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। সভয়ে বলিতে লাগিলেন, ও সব তুই কি বল্‌চিস্ অচলা ? সুরেশের মত—সত্যই ত—নিশীথবাবুর মত—

অচলা বাধা দিয়া কহিল, নিশীথবাবুকে ত প্রথমে চিন্‌তেই পার্‌লেন না। তা ছাড়া উনি ডাক্তার—উনি যেতে পারেন। কিন্তু আর একজনকে বিপদের মধ্যে অনর্থক টেনে নিয়ে যাওয়া কেন ?

আহত হইলে সুরেশের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সে টেবিলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া, যা মুখে আসিল, উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি ভীরু নই—প্রাণের ভয় করি নে। মহিমকে দেখাইয়া বলিল, ঐ নেমকহারামটাকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, আমি ওকে মর্‌তে মর্‌তে বাঁচিয়েছিলুম কি না।

অচলা দৃপ্তস্বরে কহিল, নেমকহারাম উনি ! তাই বটে ! কিন্তু যাকে এক সময়ে বাঁচানো যায়, আর এক সময়ে ইচ্ছে কর্‌লে বুঝি তাকে খুন করা যায় ?

কেদারবাবু হতবুদ্ধির মত বলিতে লাগিলেন, থাম্ না অচলা, থাম না সুরেশ! এ সব কি কাণ্ড বল দেখি!

সুরেশ রক্ত-চক্ষে কেদারবাবুর প্রতি চাহিয়া বলিল, আমি প্লেগের মধ্যে যেতে পারি—তাতে দোষ নেই! মহিমের প্রাণটাই প্রাণ, আর আমারটা কিছু নয়! দেখলেন ত আপনি!

লজ্জায়, ক্ষোভে অচলা কাঁদিয়া ফেলিল। রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, ওঁর প্রাণ উনি দিতে পারেন, আমি নিষেধ করতে পারি নে; কিন্তু যেখানে বাধা দেবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার, সেখানে আমি বাধা দেবই। আমি কোনমতেই অমন জায়গায় ওঁকে যেতে দিতে পারব না। বলিয়া সে প্রস্থানের উপক্রম করিতেই, কেদারবাবু চেঁচাইয়া উঠিলেন, কোথায় যাস্ অচলা!

অচলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না বাবা, দিন-রাত্রি এত পীড়ন আর সহ্য করতে পারি নে। যা একেবারে অসম্ভব, যা প্রাণ থাকতে স্বীকার করবার আমার একেবারে যো নেই, তাই নিয়ে তোমরা আমাকে অহর্নিশ বিঁধচ। বলিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন চাপিতে চাপিতে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধ কেদারবাবু বুদ্ধিভ্রষ্টের মত খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, শেষে বার বার বলিতে লাগিলেন, যত সব ছেলেমানুষ—কি সব কাণ্ড বল ত!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মাস-খানেক গত হইয়াছে। কেদারবাবু রাজী হইয়াছেন—মহিমের সহিত অচলার বিবাহ আগামী রবিবারে স্থির হইয়া গিয়াছে। সেদিন যে কাণ্ড করিয়া সুরেশ গিয়াছিল, তাহা সত্যই কেদারবাবুর বুকে বিঁধিয়াছিল। কিন্তু সেই অপমানের গুরুত্ব ওজন করিয়াই যে তিনি

মহিমের প্রতি অবশেষে প্রসন্ন হইয়া সম্মতি দিয়াছেন, তাহা নয়। সুরেশ নিজেই যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে—এতদিনের মধ্যে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শুনা যায়, সেই রাত্রেই সে না কি পশ্চিমে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কবে ফিরিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

সেদিন কান্না চাপিতে অচলা ঘর ছাড়িয়া যখন চলিয়া গেল, তখন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিন জনেই মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু কথা কহিল প্রথমে সুরেশ নিজে। কেদারবাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, যদি আপত্তি না থাকে, আমি আপনার সাক্ষাতেই আপনার কন্যাকে গোটা-কয়েক কথা বল্‌তে চাই।

কেদারবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, বিলক্ষণ! তুমি কথা বল্‌বে, তার আবার আপত্তি কি সুরেশ? যত সব ছেলে মানুষের—

তা হ'লে একবার ডেকে পাঠান—আমার বেশি সময় নেই।

তাহার মুখের ও কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া কেদার-বাবু মনে মনে শঙ্কা অনুভব করিলেন। কিন্তু জোর করিয়া একটু হাস্য করিয়া, আবার সেই ধুয়া তুলিয়াই বলিতে লাগিলেন, যত সব ছেলে-মানুষের কাণ্ড! কিন্তু একটুখানি সামলাতে না দিলে—বুঝলে না সুরেশ, ও সব প্লেগ-ফ্লেগের জায়গার নাম কর্‌লেই—মেয়েমানুষের মন কি না। একবার শুন্‌লেই ভয়ে অজ্ঞান—বুঝলে না বাবা—

কোনপ্রকার কৈফিয়তের প্রতি মনোযোগ দিবার মত সুরেশের মনের অবস্থা নয়—সে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, বাস্তবিক কেদার-বাবু, আমার অপেক্ষা করবার সময় নেই।

তা ত বটেই। তা ত বটেই। কে আছিস রে ওখানে? বলিয়া ডাক দিয়া কেদারবাবু মহিমের প্রতি একটা বক্র কটাক্ষ করিলেন। মহিম উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা নমস্কার করিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল।

কেদারবাবু নিজে গিয়া অচলাকে যখন ডাকিয়া আনিলেন, তখন অপরাহ্ণ-সূর্য্যের রক্তিম-রশ্মি পশ্চিমের জানালা-দরজা দিয়া ঘরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই আলোকে উদ্ভাসিত এই তরুণীর ঈষদ্দীর্ঘ কৃশ দেহের পানে চাহিয়া, পলকের জন্য সুরেশের বিক্ষুব্ধ মনের উপর একটা মোহ ও পুলকের স্পর্শ খেলিয়া গেল, কিন্তু স্থায়ী হইতে পারিল না। তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রেই সে ভাব তাহার চক্ষের নিমেষে নির্ব্বাপিত হইল। কিন্তু, তবুও সে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিল না, নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অচলার মুখের উপর আকাশের আলো পড়ে নাই বটে, কিন্তু সুমুখের দেওয়াল হইতে প্রতিফলিত আরক্ত আভায় সমস্ত মুখখানা সুরেশের চোখে কঠিন ব্রোঞ্জের তৈরী মূর্ত্তির মত বোধ হইল। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কি যেন একটা নিবিড় বিতৃষ্ণায় এই নারীর সমস্ত মাধুর্য্য, সমস্ত কোমলতা, নিঃশেষে শুষিয়া ফেলিয়া মুখের প্রত্যেক রেখাটিকে পর্য্যন্ত অবিচলিত দৃঢ়তায় একেবারে ধাতুর মত শক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সহসা কেদারবাবুর প্রবল নিশ্বাসের চোটে সুরেশের চমক ভাঙ্গিতেই সে সোজা হইয়া বসিল।

কেদারবাবু আর একবার তাঁহার পুরাতন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, যত সব পাগলামি কাণ্ড—কাকে যে কি বলি, আমি ভেবে পাই নে—

সুরেশ অচলাকে উদ্দেশ করিয়া নিরতিশয় গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আপনি যা বলে গেলেন, তাই ঠিক?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ।

এর আর কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়?

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

রক্তের উচ্ছ্বাস এক ঝলক আগুনের মত সুরেশের চোখ-মুখ প্রদীপ্ত করিয়া দিল; কিন্তু সে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়াই কহিল, আমার প্রাণটার

পর্য্যন্ত যখন কোন দাম নেই, তখনি আমি জানতুম্। তাহার বুকের ভিতরটা তখন পুড়িয়া যাইতেছিল। একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, আমিই কি আপনাদের প্রথম শিকার, না, এমন আরও অনেকে এই ফাঁদে প'ড়ে নিজেদের মাথা মুড়িয়ে গেছে?

অসহ্য বিস্ময়ে অচলা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল। সুরেশ কেদারবাবুর প্রতি চাহিয়া কহিল, বাপ-মেয়েতে ষড়যন্ত্র ক'রে শিকার ধরার ব্যবসা বিলাতে নতুন নয় শুনতে পাই; কিন্তু এ-ও বলছি আপনাকে, কেদারবাবু, একদিন আপনাদের জেলে যেতে হবে।

কেদারবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এ সব তুমি কি বল্‌চ সুরেশ?

সুরেশ অবিচলিত-স্বরে জবাব দিল, চুপ করুন কেদারবাবু; থিয়েটারের অভিনয় অনেক দিন ধ'রে চল্‌চে। পুরানো হয়ে গেছে—আর এতে আমি ভুল্‌ব না। টাকা আমার যা গেছে, তা যাক—তার বদলে শিক্ষাও কম পেলুম না; কিন্তু এই যেন শেষ হয়!

অচলা কাঁদিয়া উঠিল—তুমি কেন এঁর টাকা নিলে বাবা?

কেদারবাবু পাগলের মত একখণ্ড শাদা কাগজের সন্ধানে এদিকে-ওদিকে হাত বাড়াইয়া, শেষে একখানা পুরাতন খবরের কাগজ সবেগে টানিয়া লইয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, আমি এখ্‌খুনি হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছি—

সুরেশ বলিল, থাক্—থাক্, লেখালিখিতে আর কাজ নেই! আপনি ফিরিয়ে যা দেবেন, সে আমি জানি। কিন্তু আমিও ঐ কটা টাকার জন্যে নালিশ ক'রে আপনার সঙ্গে আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।

জবাব দিবার জন্য কেদারবাবু দুই ঠোঁট ঘন ঘন নাড়িতে লাগিলেন, কিন্তু গলা দিয়া একটাও কথা ফুটিল না।

সুরেশ অচলার প্রতি ফিরিয়া চাহিল। তাহার একান্ত পাংশু মুখে

ও সজল চক্ষের পানে চাহিয়া তাহার এক বিন্দু দয়া হইল না, বরঞ্চ ভিতরের জ্বালা শতগুণে বাড়িয়া গেল। সে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সহিত বলিয়া উঠিল, কি তোমার গর্ব্ব কর্‌বার আছে অচলা, ঐ ত মুখের শ্রী, ঐ ত কাঠের মত দেহ, ঐ ত গায়ের রঙ! তবু যে আমি ভুলেছিলাম—সে কি তোমার রূপে? মনেও ক'রো না।

পিতার সমক্ষে এই নির্লজ্জ অপমানে অচলা দুঃখে ঘৃণায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কোচের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ব্রাহ্মদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে। যাদের ছায়া মাড়াতেও আমার ঘৃণা বোধ হ'ত, তাদের বাড়িতে ঢোক্‌বামাত্রই যখন আমার আজন্মের সংস্কার—চিরদিনের বিদ্বেষ এক মুহূর্ত্তে ধুয়ে মুছে গেল, তখনি আমার সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল—এ যাদুবিদ্যা! আমার যা হয়েছে, তা হোক, কিন্তু যাবার সময় আপনাদের আমি সহস্রকোটি ধন্যবাদ না দিয়ে যেতে পার্‌চি নে। ধন্যবাদ অচলা!

অচলা মুখ না তুলিয়াই, অবরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বাবা, ওঁকে তুমি চুপ করতে বল। আমরা গাছতলায় থাকি, সে-ও ঢের ভাল, কিন্তু ওঁর যা নিয়েছ, তুমি ফিরিয়ে দাও—

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, গাছতলায়? এক দিন তাও তোমাদের জুটবে না, তা ব'লে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সে দিন আমাকে স্মরণ ক'রো, বলিয়া প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

কেদারবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, উঃ, কি ভয়ানক লোক। এমন জানলে আমি কি ওকে বাড়ি ঢুকতে দিতুম!

পিতার কথা অচলার কানে গেল, কিন্তু সে কিছুই বলিল না, উপুড়

হইয়া পড়িয়া যেমন করিয়া কাঁদিতেছিল, তেমনি একভাবে পড়িয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে লাগিল। অদূরে চৌকির উপর বসিয়া কেদারবাবু সমস্ত দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু সান্ত্বনার একটা কথা উচ্চারণ করিতেও আর তাঁহার সাহস হইল না। সন্ধ্যা হইয়া গেল। বেহারা আসিয়া গ্যাস জ্বালাইবার উপক্রম করিতেই অচলা নিঃশব্দে উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

কিন্তু, মহিম ইহার কিছুই জানিল না। শুধু যে দিন কেদারবাবু অত্যন্ত অবলীলাক্রমে কন্যার সহিত তাহার বিবাহের সম্মতি দিলেন, সেই দিনটায় সে কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বলের মত স্তব্ধ হইয়া রহিল। অনেক প্রকারের অনেক কথা, অনেক সংশয় তাহার মনে উদয় হইল বটে, কিন্তু তাহার এই সৌভাগ্যের সুরেশ নিজেই যে মূল কারণ, ইহা তাহার সুদূর কল্পনায়ও উদয় হইল না। অচলার প্রতি স্নেহে, প্রেমে, কৃতজ্ঞতায় তাহার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু চিরদিনই সে নিঃশব্দ প্রকৃতির লোক; আবেগ উচ্ছ্বাস কোন দিন প্রকাশ করিতে পারিত না, পারিলেও হয় ত তাহার মুখে নিতান্তই তাহা একটা অপ্রত্যাশিত, অসংলগ্ন আচরণ বলিয়া লোকের চোখে ঠেকিত। বরঞ্চ, আজ সন্ধ্যার সময় যখন সে একাকী কেদারবাবুর সহিত দুই-চারিটা কথাবার্ত্তার পর বাসায় ফিরিয়া গেল, তখন অন্যান্য দিনের মত অচলার সহিত দেখা করিয়া তাহাকে একটা ছোট্ট নমস্কার পর্য্যন্ত করিয়া যাইতে পারিল না। কথাটা কেদারবাবু নিজেই পাড়িয়াছিলেন। প্রসঙ্গ উত্থাপন হইতে সুরু করিয়া, সম্মতি দেওয়া—মায় দিনস্থির পর্য্যন্ত, একাই সব করিলেন। কিন্তু সমস্তটাই যেন অনন্যোপায় হইয়াই করিলেন; মুখে তাঁহার স্ফূর্ত্তি বা উৎসাহের লেশমাত্র চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। তথাপি দিন কাটিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ বিবাহের দিন আসিল।

পরশু বিবাহ। কিন্তু মেয়ের বিবাহে তিনি কোনরূপ ধূমধাম হৈচৈ

করিবেন না—স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া, আগামী শুভকর্ম্মের আয়োজন যতটা নিঃশব্দে হইতে পারে, তাহার ত্রুটি করেন নাই।

আজও বিকাল-বেলা তিনি যথাসময়ে চা খাইতে বসিয়াছিলেন। একটা সেলাই লইয়া অচলা অনতিদূরে কোচের উপর বসিয়াছিল। অনেক দিন অনেক দুঃখের মধ্যে দিনযাপন করিয়া আজ কয়েকদিন হইতে তাহার মনের উপর যে শান্তিটুকু স্থিতিলাভ করিয়াছিল, তাহারই ঈষৎ আভাসে তাহার পাণ্ডুর মুখখানি ম্লান জ্যোৎস্নার মতই স্নিগ্ধ বোধ হইতেছিল। চা খাইতে খাইতে মাঝে মাঝে কেদারবাবু ইহাই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে-ছিলেন। কলহ করিয়া সুরেশ চলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত, এতদিন তিনি মন-মরাভাবেই দিন-যাপন করিতেছিলেন। সে ফিরিয়া আসিয়া কি করিবে, না করিবে—এই এক দুশ্চিন্তা; তা ছাড়া, তাঁহার নিজের কর্ত্তব্যই বা এ সম্বন্ধে কি—হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দেওয়া বা টাকাটা পরিশোধ করিতে আর কোথাও ঋণের চেষ্টা করা, কিম্বা মহিমের উপর দায়িত্ব তুলিয়া দেওয়া—কি যে করা যায়, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া, কোন কূল-কিনারাই দেখিতে-ছিলেন না। অথচ একটা কিছু করা নিতান্তই আবশ্যক—সুরেশের নিরুদ্দেশ অবস্থার উপর বরাত দিয়া যে চিরদিন চলিবে না, অথবা মেয়ের মত নিজের খেয়ালে মগ্ন হইয়া, চোখ বুজিয়া থাকিলেই যে বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারা যাইবে না, তাহাও হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছিলেন। হতাশ-প্রেমিক একদিন যে চাঙ্গা হইয়া উঠিবে এবং সে দিন ফিরিয়া আসিয়া কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র করিয়া মস্ত হাঙ্গামা বাধাইয়া দিবে এবং যে টাকাটা চেকের দ্বারা তাঁহাকে দিয়াছে—তাহা আর কোন লেখাপড়া না থাকা সত্ত্বেও যে আদালতে উড়াইতে পারা যাইবে না, ভাবিয়া ভাবিয়া এ বিষয়ে এক প্রকার তিনি নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু, মেয়ের সহিত এ বিষয়ে একটা পরামর্শ করিবার পর্য্যন্ত যো ছিল না। সুরেশের নামোল্লেখ করিতেও তাঁহার ভয় করিত। এখন

অচলার ওই শান্ত স্থির মুখচ্ছবির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার ভারি একটা চিত্তজ্বালার সহিত কেবল মনে হইতে লাগিল, এই মেয়েটাই তাঁহার সকল দুঃখের মূল। অথচ, কি সুবিধাই না হইয়াছিল, এবং অদূর-ভবিষ্যতে আরও কি না হইতে পারিত!

যে নিষ্ঠুর কন্যা বৃদ্ধ পিতার বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও, তাঁহার সুখ-দুঃখের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র করিল না, সমস্ত পণ্ড করিয়া দিল, সেই স্বার্থপর সন্তানের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রচ্ছন্ন ক্রোধ অভিশাপের মত যখন তখন প্রায় এই কামনাই করিত—সে যেন ইহার ফল ভোগ করে, একদিন যেন তাহাকে কাঁদিয়া বলিতে হয়, "বাবা, তোমার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি আমি পাইতেছি।" পাত্র হিসাবে সুরেশ যে মহিমের অপেক্ষা অসংখ্য গুণে অধিক বাঞ্ছনীয়, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার সম্পর্ক হইতে বিচ্যুত হওয়াটাকে তিনি গভীর ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতেছিলেন। মনে মনে তাহার উপর তাঁহার ক্রোধ ছিল না। এত কাণ্ডের পরেও যদি আজ আবার তাহাকে ফিরিয়া পাইবার পথ থাকিত, উপস্থিত বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে বোধ করি লেশমাত্র ইতস্তত: করিতেন না। কিন্তু কোন উপায় নাই—কোন উপায় নাই! অচলার কাছে তাহার আভাসমাত্র উত্থাপন করাও অসাধ্য।

সেলাই করিতে করিতে অচলা সহসা মুখ তুলিয়া বলিল, বাবা, সুরেশ বাবুর ব্যাপারটা পড়লে?

অচলার মুখে সুরেশের নাম! কেদারবাবু চমকিয়া চাহিলেন! নিজের কানকে তাঁহার বিশ্বাস হইল না। সকালের খবরের কাগজটা টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল; অচলা সেটা তুলিয়া লইয়া পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল। কাগজখানার স্থানে স্থানে তিনি সকাল-বেলায় চোখ বুলাইয়া গিয়াছেন; কিন্তু অপরের সংবাদ খুঁটিয়া জানিবার মত

আগ্রহাতিশয্য তাঁহার মনের মধ্যে এখন আর ছিল না। কহিলেন, কোন্ সুরেশ?

অচলা সংবাদপত্রের সেই স্থানটা খুঁজিতে খুঁজিতে বলিল, বোধ করি, ইনি আমাদেরই সুরেশবাবু।

কেদারবাবু বিস্ময়ে দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমাদের সুরেশবাবু? কি করেছেন তিনি? কোথায় তিনি?

অচলা উঠিয়া আসিয়া সংবাদপত্রের সেই স্থানটা পিতার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, প'ড়ে দেখ না বাবা!

কেদারবাবু চস্‌মার জন্য পকেট হাতড়াইয়া বলিলেন, চস্‌মাটা হয় ত আমার ঘরেই ফেলে এসেছি। তুমিই পড় না মা, ব্যাপারটা কি শুনি?

অচলা পড়িয়া শুনাইল, ফয়জাবাদ সহরের জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন, সে দিন সহরের দরিদ্র-পল্লীতে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। একে প্লেগ, তাহাতে এই দুর্ঘটনায় দুঃখী লোকের দুঃখের আর পরিসীমা নাই। কিছুদিন হইতে সুরেশ নামে একটী ভদ্র যুবক এখানে আসিয়া অর্থ দিয়া, ঔষধ-পথ্য দিয়া, নিজের দেহ দিয়া রোগীর সেবা করিতেছিলেন। বিপদের সময় তিনি উপস্থিত হইয়া শুনিতে পান, রোগশয্যায় পড়িয়া কোন স্ত্রীলোক একটি প্রজ্বলিত গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে—তাহাকে উদ্ধার করিবার আর কেহ নাই।

সংবাদদাতা অতঃপর লিখিয়াছেন, ইহার প্রাণরক্ষা করিতে কি করিয়া এই অসমসাহসী বাঙালী যুবক নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি—

পড়া শেষ হইয়া গেল। কেদারবাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কিন্তু এ কি আমাদের সুরেশ বলেই তোমার মনে হয়?

অচলা শান্তভাবে বলিল, হাঁ বাবা, ইনি আমাদেরই সুরেশবাবু।

কেদারবাবু আর একবার চমকিয়া উঠিলেন! বোধ করি, নিজের অজ্ঞাতসারেই অচলার মুখ দিয়া এই 'আমাদেরই' কথাটার উপর এবার একটা অতিরিক্ত জোর প্রকাশ পাইয়াছিল। হয় ত সে শুধু একটা নিশ্চিত বিশ্বাস জানাইবার জন্যই কিন্তু কেদারবাবুর বুকের মধ্যে তাহা আর এক ভাবে বাজিয়া উঠিল; এবং মজ্জমান ব্যক্তি যে ভাবে তৃণ অবলম্বন করিতে দুই বাহু বাড়াইয়া দেয়, ঠিক তেমনি করিয়া বৃদ্ধ পিতা কন্যার মুখের এই একটিমাত্র কথাকেই নিবিড় আগ্রহে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। এই একটি কথাই তাঁহার কানে কানে, চক্ষের নিমিষে কত কি অসম্ভব সম্ভাবনার দ্বারোদ্ঘাটনের সংবাদ শুনাইয়া গেল, তাহার সীমা রহিল না। তাঁহার মুখখানা আজ এতদিন পরে অকস্মাৎ আশার আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, আচ্ছা মা, তোমার কি মনে হয় না যে—

পিতাকে সহসা থামিতে দেখিয়া অচলা মুখপানে চাহিয়া কহিল, কি মনে হয় না বাবা?

কেদারবাবু সাবধানে অগ্রসর হইবার জন্য মুখের কথাটা চাপিয়া গিয়া বলিলেন, তোমার কি মনে হয় না যে, সুরেশ যে ব্যবহার আমাদের সঙ্গে ক'রে গেল, তার জন্য সে বিশেষ অনুতপ্ত?

অচলা তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল, আমার তা নিশ্চয় মনে হয় বাবা।

কেদারবাবু প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, নিশ্চয়! নিশ্চয়! একশ'বার। তা না হ'লে, সে এ ভাবে পালাত না—কোথাকার একটা তুচ্ছ স্ত্রী-লোককে বাঁচাতে আগুনের মধ্যে ঢুকত না! আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, সে শুধু অনুতাপে দগ্ধ হয়েই নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে গিয়েছিল! সত্য কি না বল দেখি মা!

অচলা পিতার ঠিক জবাবটা এড়াইয়া গিয়া ধীরে ধীরে কহিল, শুনেচি, পরকে বাঁচাতে এই রকম আরও দু'একবার তিনি নিজের প্রাণ বিপদাপন্ন করেছিলেন।

কথাটা কেদারবাবুর তেমন ভাল লাগিল না। বলিলেন, সে আলাদা কথা অচলা! কিন্তু এ যে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া! এ যে নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা! দুটোর প্রভেদ দেখতে পাচ্চ না?

অচলা আর প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, তা বটে। কিন্তু যাঁরা মহৎপ্রাণ, তাঁদের যে কোন অবস্থাতেই, পরের বিপদে নিজের বিপদ মনে থাকে না—

কেদারবাবু উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলেন। দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, ঠিক, ঠিক! তাই ত তোকে বল্‌চি অচলা—সে একটা মহৎপ্রাণ। একেবারে মহৎপ্রাণ! তার সঙ্গে কি আর কারো তুলনা চলে! এত লোক ত আছে, কিন্তু কে কারে পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা একটা কথায় ফেলে দিতে পারে, বল দেখি! সে যাই কেন না ক'রে থাক বড় দুঃখেই ক'রে ফেলেচে—এ আমি তোমাকে শপথ ক'রে বল্‌তে পারি।

কিন্তু শপথের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। এ সত্য অচলা নিজে যত জানিত, তিনি তাহার শতাংশের একাংশও জানিতেন না। কিন্তু জবাব দিতে পারিল না—নিমেষের লজ্জা পাছে তাহার মুখে ধরা পড়ে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘাড় হেঁট করিয়া মৌন হইয়া রহিল। কিন্তু বৃদ্ধের সতৃষ্ণ-দৃষ্টির কাছে তাহা ফাঁকি পড়িল না। তিনি পুলকিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন, মানুষ ত দেবতা নয়—সে যে মানুষ! তার দেহ দোষে-গুণে জড়ানো; কিন্তু তাই ব'লে ত তার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের উত্তেজনাকে তার স্বভাব ব'লে নেওয়া চলে না! বাইরের লোক যে যা ইচ্ছে বলুক অচলা, কিন্তু আমরাও যদি এইটেকেই তার দোষ ব'লে বিচার করি, তাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ থাকে কোন্‌খানে বল্‌ দেখি? বড়লোক ত ঢের আছে, কিন্তু এমন ক'রে দিতে জানে কে? কি লিখেচে ওইখানটায় আর একবার পড় দেখি মা! আগুনের ভেতর থেকে তাকে নিরাপদে

বার ক'রে নিয়ে এল। উঃ কি মহৎপ্রাণ! দেবতা আর বলে কাকে! বলিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন।

অচলা তেম্নি নিরুত্তর অধোমুখে বসিয়া রহিল।

কেদারবাবু ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, আমাদের একখানা টেলিগ্রাফ ক'রে কি তার খবর নেওয়া উচিত নয়? তার এ বিপদের দিনেও কি আমাদের অভিমান করা সাজে?

এবার অচলা মুখ তুলিয়া কহিল, কিন্তু আমরা ত তাঁর ঠিকানা জানি নে বাবা।

কেদারবাবু বলিলেন, ঠিকানা! ফয়জাবাদ সহরে এমন কেউ কি আছে যে আমাদের সুরেশকে আজ চেনে না? তার ওপর আমার রাগ খুবই হয়েছিল, কিন্তু এখন আর আমার কিছু মনে নেই। একখানা টেলিগ্রাম লিখে এখ্খুনি পাঠিয়ে দাও মা; আমি তার সংবাদ জান্‌বার জন্যে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছি।

এখুনি দিচ্চি বাবা, বলিয়া সে একখানা টেলিগ্রাফের কাগজ আনিতে ঘরের বাহির হইয়া, একেবারে সুরেশের সম্মুখেই পড়িয়া গেল।

অন্তরে গভীর দুঃখ বহন করার ক্লান্তি এত শিঘ্র মানুষের মুখকে যে এমন শুষ্ক, এমন শ্রীহীন করিয়া দিতে পারে, জীবনে আজ অচলা এই প্রথম দেখিতে পাইয়া চমকাইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তার পরে সেই কথা কহিল। বলিল, বাবা ব'সে আছেন; আসুন, ঘরে আসুন। ফয়জাবাদ থেকে কবে এলেন? ভাল আছেন আপনি?

অজ্ঞাতসারে তাহার কণ্ঠস্বরে যে কতখানি স্নেহের বেদনা প্রকাশ পাইল, তাহা সে নিজে টের পাইল না; কিন্তু সুরেশ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল; কিন্তু তবুও আজ সে তাহার বিগত দিনের কঠোর শিক্ষাকে নিষ্ফল হইতে দিল না। সেই দুটি আরক্ত

পদতলে তৎক্ষণাৎ জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া, তাহার অগাধ দুষ্কৃতির সমস্তটুকু নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিবার দুর্জ্জয় স্পৃহাকে আজ সে প্রাণপণ বলে নিবারণ করিয়া লইয়া, সসম্ভ্রমে কহিল, আমার ফয়জাবাদে থাক্‌বার কথা আপনি কি ক'রে জান্‌লেন?

অচলা তেম্‌নি স্নেহার্দ্র স্বরে বলিল, খবরের কাগজে এইমাত্র দেখে বাবা আমাকে টেলিগ্রাফ কর্‌তে বল্‌ছিলেন। আপনার জন্যে তিনি বড় উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন—আসুন একবার তাঁকে দেখা দেবেন, বলিয়া সে ফিরিবার উপক্রম করিতেই, সুরেশ বলিয়া উঠিল, তিনি হয় ত পারেন; কিন্তু তুমি আমাকে কি ক'রে মাপ কর্‌লে অচলা?

অচলার ওষ্ঠাধরে একটুখানি হাসির আভা দেখা দিল। কহিল, সে প্রয়োজনই আমার হয় নি। আমি একটি দিনের জন্যেও আপনার ওপর রাগ করি নি—আসুন, ঘরে আসুন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সুরেশ যখন জানাইল, সে মহিমের পত্রে বিবাহের সংবাদ পাইয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছে, তখন কেদারবাবু লজ্জায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু অচলার মুখের ভাবে কিছুই প্রকাশ পাইল না।

সুরেশ বলিল, মহিমের বিবাহে আমি না এলেই ত নয়,নইলে আরও কিছুদিন হাসপাতালে থেকে গেলেই ভাল হ'ত।

কেদারবাবু উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হাসপাতালে কেন সুরেশ, সে রকম ত কিছু—

সুরেশ বলিল, আজ্ঞে না, সে রকম কিছু নয়—তবে, দেহটা ভাল ছিল না।

কেদারবাবু সুস্থির হইয়া বলিলেন, ভগবানকে সে জন্য শতকোটি

প্রণাম করি। অচলা যখন খবরের কাগজ থেকে তোমার অলৌকিক কাহিনী শোনালে সুরেশ, তোমাকে বল্‌ব কি—আনন্দে, গর্ব্বে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। মনে মনে বল্‌লুম, ঈশ্বর! আমি ধন্য যে—আমি এমন লোকেরও বন্ধু! বলিয়া দুহাত জোড় করিয়া কপালে স্পর্শ করিলেন। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, কিন্তু, তাও বলি বাবা, নিজের প্রাণ বারংবার এমন বিপদাপন্ন করাই কি উচিত? একটা সামান্য প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে এত বড় একটা মহৎ প্রাণই যদি চ'লে যেত, তাতে কি সংসারের ঢের বেশি ক্ষতি হ'ত না?

ক্ষতি আর কি হ'ত! বলিয়া সুরেশ সলজ্জভাবে মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইল, অচলা নির্নিমেষ চক্ষে এতক্ষণ তাহারই মুখের পানে চাহিয়াছিল—এখন দৃষ্টি আনত করিল।

কেদারবাবু বারংবার বলিতে লাগিলেন, এমন কথা মুখে আনাও উচিত নয়; কারণ আপনার লোকেদের এতে যে কতবড় ব্যথা বুকে বাজে, তার সীমা নেই।

সুরেশ হাসিতে লাগিল, কহিল, আপনার লোক আমার ত কেউ নেই কেদারবাবু! থাক্‌বার মধ্যে আছেন শুধু পিসিমা—আমি গেলে সংসারে তাঁরই যা কিছু কষ্ট হবে।

তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও তাহার কেহ নাই শুনিয়া কেদারবাবুর শুষ্ক চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন, শুধু কি পিসিমাই দুঃখ পাবেন সুরেশ? তা নয় বাবা, এ বুড়োও বড় কম শোক পাবে না। তা সে যাক, অন্ততঃ আমি যে ক'টা দিন বেঁচে আছি, সে ক'টা দিন নিজের শরীরে একটু যত্ন রেখো সুরেশ, এই আমার একান্ত অনুরোধ।

ঘড়ীতে রাত্রি দশটা বাজিল। বাড়ি ফিরিবার উদ্যোগ করিয়া সুরেশ হঠাৎ হাত জোড় করিয়া বলিল, আমার একটা প্রার্থনা আছে কেদারবাবু, মহিমের বিয়ে ত আমার ওখান থেকেই হবে, স্থির হয়েছে; কিন্তু সে ত

পরশু। কাল রাত্রেও এই অধমের বাড়িতেই একবার পায়ের ধূলো দিতে হবে—নইলে বিশ্বাস হবে না যে, আমি ক্ষমা পেয়েচি। বলুন, এ ভিক্ষে দেবেন? বলিয়া সে অকস্মাৎ নিচু হইয়া কেদারবাবুর পায়ের ধূলো লইতে গেল।

কেদারবাবু শশব্যস্ত হইয়া বোধ করি বা তাহাকে জোর করিয়াই নিরস্ত করিতে গিয়াছিলেন—অকস্মাৎ তাহার অস্ফুট কাতরোক্তিতে লাফাইয়া উঠিলেন। পিঠের খানিকটা দগ্ধ হওয়ায় ব্যাণ্ডেজ করা ছিল, একটা শাল গায়ে দিয়া এতক্ষণ সুরেশ ইহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। না জানিয়া টানাটানি করিতে গিয়া, তিনি ব্যাণ্ডেজটাই সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এখন অনাবৃত ক্ষতের পানে চাহিয়া বৃদ্ধ সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত উঠিয়া আসিয়া অচলা ব্যাণ্ডেজ ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, ভয় কি, আমি ঠিক ক'রে বেঁধে দিচ্চি। বলিয়া তাহাকে ওধারের সোফার উপর বসাইয়া দিয়া, সযত্নে সাবধানে ব্যাণ্ডেজটা যথাস্থানে বাঁধিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল।

কেদারবাবু তাঁহার চৌকির উপর ধপ্ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া পড়িলেন—বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আর তাঁহার কোনরূপ সাড়া-শব্দ রহিল না। কোচের পিঠের উপর দুই কুনুয়ের ভর দিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া অচলা নিঃশব্দে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অনতিকাল পরেই মুক্তার আকারে একটির পর একটি নীরবে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সুরেশ ইহার কিছুই দেখিতে পাইল না; এদিকে তাহার খেয়ালই ছিল না। সে শুধু নিমীলিত-চক্ষে স্থির হইয়া বসিয়া, তাহার অসীম প্রেমাস্পদের কোমল হাত দুখানির করুণস্পর্শ বুকের ভিতর অনুভব করিতে লাগিল।

কোনমতে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া অচলা এক সময়ে চুপি চুপি বলিল, আজ আমার কাছে আপনাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

সুরেশ ধ্যান ভাঙিয়া চকিত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে-ও তেম্‌নি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, কি প্রতিজ্ঞা?

এমন ক'রে নিজের প্রাণ আপনি নষ্ট কর্‌তে পার্‌বেন না।

কিন্তু প্রাণ ত আমি ইচ্ছে ক'রে নষ্ট করতে চাই নে! শুধু পরের বিপদে আমার কাণ্ড-জ্ঞান থাকে না—এ যে আমার ছেলে-বেলার স্বভাব অচলা!

অচলা তাহার প্রতিবাদ করিল না; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল, সুরেশ তাহা টের পাইল। বাঁধা শেষ হইয়া গেলে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল, কাল কিন্তু এ দীনের বাড়িতে একবার পায়ের ধূলো দিতে হবে—তাহার দুচক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল; কিন্তু কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইল না।

অচলা অধোমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

সুরেশ কেদারবাবুকে নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিল, দেখবেন, আমাকে নিরাশ করবেন না যেন। বলিয়া অচলার মুখের পানে চাহিয়া, আর একবার তাহার আবেদন নিঃশব্দে জানাইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন যথাসময়ে সুরেশের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। কেদার-বাবু প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন, কন্যাকে লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাত্রা করিলেন।

সুরেশের বাটীর গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেদারবাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। সে বড় লোক, ইহা ত জানা কথা; কিন্তু তাহা যে কতখানি—শুধু আন্দাজের দ্বারা নিশ্চয় করা এত দিন কঠিন হইতেছিল; আজ একেবারে সে বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া বাঁচিলেন!

সুরেশ আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া উভয়কে গ্রহণ করিল; হাসিয়া বলিল, মহিমের গোঁ আজও ভাঙতে পারা গেল না কেদারবাবু।

কাল দুপুরের আগে এ বাড়িতে ঢুকতে সে কিছুতেই রাজী হ'লো না।

কেদারবাবু সে কথার কোন জবাবও দিলেন না। তিন জনে বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেই, একজন প্রৌঢ় রমণী দ্বারের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া অচলার হাত ধরিয়া তাহাকে বাড়ির ভিতরে লইয়া গেলেন। তাঁহার নিজের ঘরের মেজের উপর একখানি কার্পেট বিছানো ছিল, তাহারই উপর অচলাকে সযত্নে বসাইয়া আপনার পরিচয় দিলেন। বলিলেন, আমি সম্পর্কে তোমার শাশুড়ী হই বৌমা। আমি মহিমের পিসি।

অচলা প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া সবিস্ময়ে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, আপনি এখানে কবে এলেন ?

মহিমের যে পিসি ছিলেন, তাহা সে জানিত না। প্রৌঢ়া তাহার বিস্ময়ের কারণ অনুমান করিয়া, হাসিয়া কহিলেন, আমি এইখানেই থাকি মা, আমি সুরেশের পিসি ; কিন্তু মহিমও ত পর নয়, তাই তারও আমি পিসি হই মা !

তাঁহার স্বভাব-কোমল কণ্ঠস্বরে এমনই একটা স্নেহ ও আন্তরিকতা প্রকাশ পাইল যে, এক মুহূর্ত্তেই অচলার বুকের ভিতরটা আলোড়িত হইয়া উঠিল। তাহার মা নাই, সে অভাব এতটুকু পূর্ণ করে, বাড়িতে এমন কোন আত্মীয় স্ত্রীলোক কোন দিন নাই। তাহার জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত এতদিন সে পিতার স্নেহেই মানুষ হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু সে স্নেহ যে তাহার হৃদয়ের কতখানি খালি ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা এক মুহূর্ত্তেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল—আজ পরের বাড়ির পরের পিসিমা যখন 'বৌমা' বলিয়া ডাকিয়া তাহাকে আদর করিয়া কাছে বসাইলেন। প্রথমটা সে অভিনব সম্বোধনে একটুখানি লজ্জিত হইয়া পড়িল ; কিন্তু ইহার মাধুর্য্য, ইহার গৌরব তাহার নারী-হৃদয়ের গভীর অন্তস্থলে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে দু'জনের কথা জমিয়া উঠিল। অচলা লজ্জিতমুখে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা পিসিমা, আমাকে যে আপনি কাছে ব[illegible] কে ব্রাহ্মমেয়ে ব'লে ত ঘৃণা করলেন না[illegible]

পিসিমা তাড়াতাড়ি আপনার অঙ্গুলির [illegible] তাহার [illegible] চুম্বন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তোমাকে ঘৃণা করব কেন মা? একটু হাসিয়া কহিলেন, আমরা হিন্দুর মেয়ে ব'লে কি এমন নির্ব্বোধ, এত হীন বৌমা, যে, শুধু ধর্ম্মমত আলাদা ব'লে তোমার মত মেয়েকেও কাছে বসাতে সঙ্কোচ বোধ করব? ঘৃণা করা ত অনেক দূরের কথা মা।

অচলা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া বলিল, আমাকে মাপ করুন পিসিমা, আমি জান্‌তুম না। আমাদের সমাজের বাইরে কোন মেয়েমানুষের সঙ্গেই কোনদিন আমি মিশতে পাই নি; শুধু শুনেছিলুম যে, তাঁরা আমাদের বড় ঘৃণা করেন; এমন কি, একসঙ্গে বস্‌লে দাঁড়ালেও তাঁদের স্নান করতে হয়।

পিসিমা বলিলেন, সেটা ঘৃণা নয় মা, সে একটা আচার। আমাদের বাইরের আচরণ দেখে হয় ত তোমাদের অনেক সময় এই কথাই মনে হবে, কিন্তু সত্যি বল্‌চি মা, সত্যিকারের ঘৃণা—আমরা কাউকে করি নে। আমাদের দেশের বাড়িতে আজও আমার বাগ্দী-জ্যেঠাইমা বেঁচে আছে—তাকে কত যে ভালবাসি, তা বল্‌তে পারি নে।

একটুখানি থামিয়া বলিলেন, আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেসা করি মা, তোমাকে—এ কি সুরেশের মুখ থেকে শুনে, না, আজ তোমার আমাকে দেখে এ কথা মনে পড়ল?

সুরেশের উল্লেখে অচলা ধীরে ধীরে বলিল, অনেকদিন আগে একবার তিনিও বলেছিলেন বটে।

পিসিমা বলিলেন, ঐ ওর স্বভাব। একটা মনে হ'লে আর রক্ষে নেই—ও তাই চারিদিকে ব'লে বেড়াবে। কোন দিন ব্রাহ্মদের সঙ্গে না

মিশেই ও ভেবে নিলে, তাদের ও ভারি ঘৃণা করে। এই নিয়ে মহিমের সঙ্গে ওর কত দিন ঝগড়া হবার উপক্রম হয়ে গেছে। কিন্তু আমি ত তাকে একরকম মানুষ করেচি, আমি জানি সে কাউকে ঘৃণা করে না— করবার সাধ্যও ওর নেই। এই দেখ না মা, যে দিন থেকে সে তোমাদের দেখ্‌লে, সে দিন থেকে—

কিন্তু কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না, অচলার মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় হঠাৎ মাঝখানেই থামিয়া গেলেন। তিনি তাহাদের সম্বন্ধে কত দূর জানিয়াছেন, তাহা বুঝিতে না পারিলেও অচলার সন্দেহ হইল যে, অন্ততঃ কতকটা পিসিমার অবিদিত নাই। ক্ষণকালের জন্য উভয়েই মৌন হইয়া রহিল; অচলা নিজের জন্য লজ্জাটাকে কোনমতে দমন করিয়া অন্য কথা পাড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, পিসিমা, আপনিই কি তবে সুরেশবাবুকে মানুষ করেছিলেন?

পিসিমা আবেগে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন, হাঁ মা, আমিই তাকে মানুষ করেছি। দুবছর বয়সে ও মা-বাপ হারিয়েছিল। আজও আমার সে কাজ সারা হয় নি—আজও সে বোঝা মাথা থেকে নামে নি, কারুর দুঃখ-কষ্ট কারুর আপদ-বিপদ ও সহ্য করতে পারে না, প্রাণের আশা-ভরসা ত্যাগ ক'রে, তার বিপদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কত ভয়ে ভয়ে দিন-রাত থাকি বৌমা, সে তোমাকে আর বল্‌তে পারি নে।

অচলা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, ক্ষজাবাদের ঘটমাটা শুনেছেন?

পিসিমা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, শুনেছি বৈ কি মা! ভগবানকে তাই সদাই বলি, ঠাকুর, আমি বেঁচে থাক্‌তে যেন আমাকে আর সে দেখা দেখিয়ো না—মাথায় পা দিয়ে একেবারে আমাকে রসাতলে ডুবিয়ে দিয়ো না। এ আমি কোনমতে সহ্য করতে পারব না। বলিতে বলিতেই তাঁহার গলা ধরিয়া গেল। তাঁহার সেই মাতৃস্নেহ-মণ্ডিত

মুখের সকাতর প্রার্থনা শুনিয়া অচলার নিজের চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল ; করুণকণ্ঠে কহিল, আপনি নিষেধ ক'রে দেন না কেন পিসিমা ?

পিসিমা চোখের জলের ভিতর দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, নিষেধ ! আমার নিষেধে কি হবে মা ? যার নিষেধে সত্যি সত্যি কাজ হবে, আমি তাকেই ত আজ কত বছর থেকে খুঁজে বেড়াচ্চি। কিন্তু সে ত যে সে মেয়ের কাজ নয়। ওকে বাঁচাতে পারে, তেমন মেয়ে ভগবান না দিলে আমি কোথায় পাব মা ?

অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার মনের মত মেয়ে কি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না ?

পিসিমা কহিলেন, ঐ যে তোমাকে বল্লুম মা, ভগবান না দিলে কোন দিন কেউ পায় না। যে সুরেশ কখ্খনো এ কথায় কান দেয় না, সে নিজে এসে যে দিন বল্লে, পিসিমা, এইবার তোমার একটি দাসী এনে হাজির ক'রে দেব, সে দিন আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল, তা মুখে জানানো যায় না। মনে মনে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্লুম, তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক বাবা। সে দিন আমার কবে হবে যে, বৌ-ব্যাটা বরণ ক'রে ঘরে তুল্ব। কত বল্লুম, সুরেশ, আমাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে আয়, কিন্তু কিছুতেই রাজী হ'ল না, হেসে বল্লে পিসিমা, আশীর্ব্বাদের দিন একেবারে গিয়ে দিনস্থির ক'রে এসো। তার পর হঠাৎ একদিন শুধু এসে বল্লে, সুবিধে হ'ল না পিসিমা, আমি রাত্রির গাড়ীতে পশ্চিমে চল্লুম। কত জিজ্ঞাসা করলুম, কিসের অসুবিধে আমাকে খুলে বল্, কিন্তু কোন কথাই বল্লে না, সেই রাত্রেই চ'লে গেল। মনে মনে ভাবলুম, শুধু আমার ছেলের ইচ্ছেতেই ত আর হতে পারে না—সে মেয়েরও ত জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা থাকা চাই ? কি বল মা ?

অচলা নীরবে ঘাড় নাড়িল। এতক্ষণে সে টের পাইল—মেয়েটি যে

কে, পিসিমা তাহা জানেন না। তাহার একবার মনে হইল বটে— তাহার বুকের উপর হইতে একটা পাথর নামিয়া গেল—কিন্তু পাথরখানা যে সহজে যায় নাই, বুকের অনেকখানি স্থান ছিঁড়িয়া পিষিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহা পরক্ষণেই আবার যেন স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিল।

আহারের আয়োজন হইলে পিসিমা অচলাকে আলাদা বসাইয়া খাওয়াইলেন এবং সঙ্গে করিয়া বাড়ির প্রত্যেক কক্ষ, প্রতি জিনিসপত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইয়া আনিয়া, সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মা, ভগবানের আশীর্ব্বাদে অভাব কিছুরই নেই—কিন্তু এ যেন সেই লক্ষ্মী-হীন বৈকুণ্ঠ! মাঝে মাঝে চোখে জল রাখতে পারি নে বৌমা!

চাকর আসিয়া খবর দিয়া গেল, বাহিরে কেদারবাবু যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। অচলা প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইতেই পিসিমা তাহার একটা হাত ধরিয়া একবার একটু দ্বিধা করিয়া চুপি চুপি বলিলেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি কিছু না মনে কর মা!

অচলা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া শুধু একটুখানি হাসিল।

পিসিমা বলিলেন, সুরেশের কাছে তোমার আর মহিমের সমস্ত কথা আমি শুনতে পেয়েচি মা! তার মুখেই শুনতে পেলুম, সে গরীব ব'লে নাকি তোমার বাবার ইচ্ছে ছিল না। শুধু তোমার জন্যেই—

অচলা ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, সত্যি পিসিমা।

পিসিমা অকস্মাৎ যেন উচ্ছ্বসিত আবেগে অচলার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, এই ত চাই মা! যাঁকে ভালবেসেচ, তাঁর কাছে টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত কতটুকু! মনে কোন ক্ষোভ রেখো না মা! আমি মহিমকে খুব জানি, সে এমনি ছেলে, যত কেন না দুঃখ তার জন্যে পাও—একদিন ভগবানের আশীর্ব্বাদে সমস্ত সার্থক হবে। তিনি এত বড় ভালবাসার কিছুতেই অমর্য্যাদা করতে পারবেন না, এ আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি।

অচলা আর একবার হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

তিনি তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, আহা, এমনি একটি বৌ নিয়ে যদি আমি ঘর কর্‌তে পেতুম।

সুরেশ আসিয়া উভয়কে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া ফিরিয়া গেল। যাবার সময় লণ্ঠনের আলোকে পলকের জন্য তাহার মুখখানা অচলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে মুখে যে কি ছিল, তাহা জগদীশ্বর জানেন, কিন্তু অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল, জুড়ী-গাড়ী দ্রুতবেগে পথে আসিয়া পড়িল। রাস্তার জনস্রোত তখন মন্দীভূত হইয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া তাহার হঠাৎ মনে হইল, এতক্ষণ সে যেন একটা মস্ত স্বপ্ন দেখিতেছিল। তাহা সুখের কিম্বা দুঃখের তাহা বলা শক্ত। কেদারবাবু এতক্ষণ মৌন হইয়াই ছিলেন—বোধ করি সুরেশের ঐশ্বর্য্যের চেহারাটা তাঁহার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছিল; সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হাঁ, বড়লোক বটে!

মেয়ের তরফ হইতে কিন্তু এতটুকু সাড়া পাওয়া গেল না। উৎসাহের অভাবে বাকি পথটা তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন।

গাড়ী আসিয়া যখন তাঁহার দ্বারে লাগিল এবং সহিস কবাট খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, তখন আর একবার যেন তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের মনে মনেই বলিলেন, সুরেশকে আমরা কেউ চিনতে পারি নি! একটা দেবতা!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আজ অচলার বিবাহ। বিবাহ-সভার পথে পলকের জন্য সুরেশকে দেখা গিয়াছিল। তাহার পরে সে যে কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল,

সারা রাত্রির মধ্যে কেদারবাবুর বাটীতে আর তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

বিবাহ হইয়া গেল। দুই-একটা দিন অচলার মনের মধ্যে বিপ্লব বহিতেছিল। সেই নিমন্ত্রণের রাত্রে সুরেশের পিসিমার কথা সে কোনমতেই ভুলিতে পারিতেছিল না ; আজ তাহার নিবৃত্তি হইল।

মহিমের অটল গাম্ভীর্য্য আজও অক্ষুণ্ণ রহিল। আনন্দ-নিরানন্দের লেশমাত্র বাহ্য-প্রকাশ তাহার মুখের উপর দেখা দিল না। তবুও শুভদৃষ্টির সময় এই মুখ দেখিয়াই অচলার সমস্ত বক্ষ আনন্দে, মাধুর্য্যে, পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অন্তরের মধ্যে স্বামীর পদতলে মাথা পাতিয়া মনে মনে বলিল, প্রভু, আর আমি ভয় করি নে। তোমার সঙ্গে যেখানে যে অবস্থায় থাকি নে কেন, সেই আমার স্বর্গ ; আজ থেকে চিরদিন তোমার কুটীরই আমার রাজপ্রাসাদ।

শ্বশুরবাটী যাত্রার দিন কেদারবাবু জামার হাতায় চোখ মুছিয়া কহিলেন, মা, আশীর্ব্বাদ করি, স্বামীর সঙ্গে দুঃখদারিদ্র্য বরণ ক'রে জীবনের পথে, কর্ত্তব্যের পথে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হও। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন। বলিয়া তেমনি চোখ মুছিতে মুছিতে পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পরে, শ্রাবণের এক স্বল্পালোকিত দ্বিপ্রহরে মাথার উপর ক্ষান্ত-বর্ষণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও নিচে সঙ্কীর্ণ, কর্দ্দমাচ্ছন্ন, পিচ্ছিল গ্রাম্য পথ দিয়া পাল্কী চড়িয়া অচলা একদিন স্বামীগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এই পথটুকুর মধ্যেই যেন তাহার নব-বিবাহের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য তিরোহিত হইয়া গেল।

পল্লীগ্রামের সহিত তাহার ছাপার অক্ষরের ভিতর দিয়াই পরিচয় ছিল। সে পরিচয়ে দুঃখ-দারিদ্র্যের সহস্র ইঙ্গিতের মধ্যেও ছত্রে ছত্রে কবিতা ছিল, কল্পনার সৌরভ ছিল। পাল্কী হইতে নামিয়া সে বাড়ির

ভিতরে আসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—কোথাও কোন দিক্ হইতে কবিত্বের এতটুকু তাহার হৃদয়ে আঘাত করিল না। তাহার কল্পনার পল্লীগ্রাম সাক্ষাৎ দৃষ্টিতে যে এমনি নিরানন্দ, নির্জ্জন—মেটেবাড়ির ঘরগুলা যে এরূপ স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার, জানালা দরজা যে এতই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র—উপরে বাঁশের আড়া ও মাচা এত কদাকার—ইহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। এই কদর্য্য গৃহে জীবন যাপন করিতে হইবে—উপলব্ধি করিয়া তাহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। স্বামিসুখ, বিবাহের আনন্দ সমস্তই এক মুহূর্ত্তে মায়ামরীচিকার মত তাহার হৃদয় হইতে বিলীন হইয়া গেল। বাটীতে শ্বশুর-শাশুড়ী জা-ননদ কেহই ছিল না, দূর-সম্পর্কের এক ঠানদিদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বর-বধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিবার জন্য ওপাড়া হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি বিবাহের আজন্ম-পরিচিত সাজ-সজ্জার একান্ত অভাব লক্ষ্য করিয় অব্যক্ত বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; অবশেষে বধূর হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরে আনিয়া বসাইয়া দিলেন। পাড়ার যাহারা বধূ দেখিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারা অচলার বয়স অনুমান করিয়া মুখ-চাওয়া-চাওয়ি, গা-টেপা-টেপি করিল এবং প্রত্যাগমনকালে তাহাদের অস্ফুট-কলরবের মধ্যে 'বেম্ম' 'মেলেচ্ছ' প্রভৃতি দুই-একটা মিষ্ট কথা আসিয়াও অচলার কানে পৌঁছিল।

অনতিবিলম্বেই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, কথাটা সত্য যে, মহিম ম্লেচ্ছ-কন্যা বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বেই এই প্রকার একটা জনশ্রুতির কিছু কিছু আন্দোলন ও আলোচনা হইয়া গিয়াছিল; এখন বৌ দেখিয়া কাহারও বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না যে, যাহা রটিয়াছিল, তাহা ষোল আনাই খাঁটি।

প্রতিবেশিনীরা প্রস্থান করিলে, ঠানদিদি আসিয়া কহিলেন, নাতবৌ, আজ তা হ'লে আসি দিদি! অনেকটা দূর যেতে হবে, আর

ঘরে না গেলেও নয় কি না—ছোট নাতিটি—ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি অনুরোধ-উপরোধের অবকাশমাত্র না দিয়াই চলিয়া গেলেন। তিনি যে এতক্ষণ শুধু একটা সম্বন্ধ স্মরণ করিয়াই যাইতে পারেন নাই এবং সে জন্য মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন, অচলা তাহা বুঝিয়াছিল। বস্তুতঃ ঠান্‌দিদির অপরাধ ছিল না। ব্যাপারটা যথার্থই এরূপ দাঁড়াইবে তাহা জানিলে হয় ত তিনি এদিক মাড়াইতেন না। কারণ পাড়াগাঁয়ে বাস করিয়া এ সকল জিনিসকে ভয় করে না, এত বড় বুকের পাটা পল্লী-ইতিহাসে সুদুর্লভ।

ঠান্‌দিদি অন্তর্দ্ধান করিলে, বাড়ির যদু চাকর ও উড়ে বামুন এবং কলিকাতা হইতে সদ্য আগত অচলার বাপের বাড়ির দাসী হরির মা ভিন্ন সমস্ত বিবাহের বাড়িটা শূন্য খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টির বিরাম হইয়াছিল, পুনরায় ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়িতে সুরু করিল। হরির মা কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে কহিল, এমন বাড়ি ত দেখি নি দিদি, কেউ যে কোথাও নেই—

অচলা অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, অন্যমনস্কের মত শুধু কহিল, হুঁ—

হরির মা পুনরপি কহিল, জামাইবাবুকেও ত দেখচি নে? সেই যে একটিবার দেখা দিয়ে কোথায় গেলেন—

অচলা এ কথার জবাবও দিল না।

কিন্তু এই বনজঙ্গলপরিবৃত শূন্য পুরীর মধ্যে হরির মার নিজের চিত্ত যত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠুক, অচলাকে ছেলে-বেলা হইতে মানুষ করিয়াছে; তাহাকে একটুখানি সচেতন করিবার জন্য কহিল, ভয় কি! সত্যই ত আর জলে এসে পড়ি নি! জামাইবাবু এসে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ততক্ষণ এ সব ছেড়ে ফেল দিদি, আমি তোরঙ্গ খুলে কাপড় জামা বার ক'রে দি--

এখন থাক্ হরির মা, বলিয়া অচলা তেমনি অধোমুখে কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। জীবনের সমস্ত স্বাদ-গন্ধ তাহার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

বৃষ্টি চাপিয়া আসিল। সেই বর্দ্ধিত-বেগ বারিধারার মধ্যে কখন যে দিন শেষে অত্যল্প আলোক নিবিয়া গেল, কখন শ্রাবণের গাঢ় মেঘাস্তীর্ণ আকাশ ভেদ করিয়া মলিন পল্লীগৃহে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, কিছুই ঠাহর হইল না। শুধু আনন্দলেশহীন আঁধার ঘরের কোণে কোণে আর্দ্র অন্ধকার নিঃশব্দে গাঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল। যদু চাকর আসিয়া হ্যারিকেন লণ্ঠন ঘরের মাঝখানে রাখিয়া দিল। হরির মা প্রশ্ন করিল, জামাইবাবু কোথায় গো?

কি জানি, বলিয়া যদু ফিরিতে উদ্যত হইল। তাহার সংক্ষিপ্ত ও বিশ্রী উত্তরে হরির মা শঙ্কিত হইয়া কহিল, কি জানি কি রকম? বাইরে তিনি নেই না কি?

না, বলিয়া যদু প্রস্থান করিল। সে যে আগন্তুকদিগের প্রতি প্রসন্ন নয়, তাহা বেশ বুঝা গেল। হরির মা অত্যন্ত ভীত হইয়া অচলার কাছে সরিয়া আসিয়া ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, রকম সকম আমার ত ভাল ঠেকছে না দিদি! দোরে খিল দিয়ে দেব?

অচলা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, খিল দিবি কেন?

হরির মা ছেলে-বেলায় দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়াছে, আর কখনও যায় নাই। পল্লীগ্রামের চোর ডাকাত, ঠ্যাঙাড়ে প্রভৃতি গল্পের স্মৃতি ছাড়া আর সমস্তই তাহার কাছে ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছে। সে বাহিরের অন্ধকারে একটা চকিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অচলার গা ঘেঁষিয়া, চুপি চুপি কহিল, পাড়াগাঁ—বলা যায় না দিদি। বলিতে বলিতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।

ঠিক্ এম্নি সময়ে প্রাঙ্গণের মাঝখান হইতে ডাক আসিল, ঠান্‌দি

কোথায় গো? বলিতে বলিতেই একটী কুড়ি-একুশ বৎসরের পাতলা ছিপছিপে মেয়ে জলে ভিজিতে ভিজিতে দোরগোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল; কহিল, আগে একটা নমস্কার ক'রে নিই ঠান্‌দি, তারপরে কাপড় ছাড়ব এখন, বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া অচলার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল; এবং লণ্ঠনটা অচলার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া চীৎকার করিয়া ডাক দিল, সেজদা, ও সেজদা—

মহিম বাটী পৌঁছিয়াই এই মেয়েটিকে নিজে আনিতে গিয়াছিল। ও-ঘর হইতে সাড়া দিল, কে রে মৃণাল?

এদিকে এসো না, বল্‌চি—

মহিম দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল, কি রে?

মৃণাল লণ্ঠনের আলোকে আর একবার ভাল করিয়া অচলার মুখখানি দেখিয়া লইয়া বলিল, নাঃ—তুমিই জিতেচ সেজদা। আমাকে বিয়ে করলে ঠকে মরতে ভাই।

মহিম বাহির হইতে তাড়া দিয়া কহিল, কিছুতেই আমার কথা শুন্‌বি নে মৃণাল! আবার এই সব ঠাট্টা? তুই কি আমার কথা শুন্‌বি নে?

বাঃ, ঠাট্টা বৈ কি, অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, ঠান্‌দি, মাইরি বল্‌চি ভাই, তামাসা নয়। আচ্ছা, তোমায় বরকেই জিজ্ঞাসা কর—আমাকে এক সময় উনি পছন্দ করেছিলেন কি না!

মহিম কহিল, তবে তুই ব'কে মর, আমি বাইরে চল্‌লুম।

মৃণাল কহিল, তা যাও না, তোমাকে কি ধ'রে রেখেচি? অচলার চিবুকটা একবার পরম স্নেহে নাড়িয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা, ভাই ঠান্‌দি, হিংসে হয় না কি? এ সংসারে আমারই ত গিন্নী হবার কথা! কিন্তু আমার মা পোড়ারমুখী কি যে মন্তর সেজদার কানে ঢুকিয়ে দিলে—

আমি সেজদার দুচক্ষের বিষ হয়ে গেলুম। নইলে—ওরে যদু, ঘোষালমশাই গেলেন কোথায়?

যদু কহিল, পুকুরে হাত পা ধুতে গেছেন!

অ্যাঁ, এই অন্ধকারে পুকুরে? মৃণালের হাসিমুখ এক মুহূর্ত্তে দুশ্চিন্তায় ম্লান হইয়া গেল। ব্যস্ত হইয়া কহিল, যদু, যা বাবা, আলো নিয়ে একবার পুকুরে। বুড়োমানুষ, এখুনি কোথায় অন্ধকারে পিছলে প'ড়ে হাত-পা ভাঙবে।

পরক্ষণেই অচলার মুখের পানে চাহিয়া লজ্জিতভাবে হাসিয়া কহিল, কি কপাল করেছিলুম ভাই ঠান্‌দি, কোথাকার এক বাহাত্তুরে বুড়ো ধ'রে আমাকে দিলে—তার সেবা কর্‌তে করতে আর তাকে সাম্‌লাতে সাম্‌লাতেই প্রাণটা গেল! আচ্ছা ভাই, আগে ও-ঘর থেকে ভিজে কাপড়টা ছেড়ে আসি তার পরে কথা হবে। কিন্তু সতীন ব'লে রাগ কর্‌তে পাবে না, তা বলে দিচ্চি—আর বল ত, না হয়, আমার বুড়োটাকেও তোমাকে ভাগ দেব। বলিয়া হাসির ছটায় সমস্ত ঘরটা যেন আলো করিয়া দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

এই শ্রেণীর ঠাট্টা তামাসার সহিত অচলার কোন দিন পরিচয় ঘটে নাই। সমস্ত পরিহাসই তাহার কাছে এমনি কুরুচিপূর্ণ ও বিশ্রী ঠেকিতেছিল যে, লজ্জায় সে একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। এত বড় নির্লজ্জ প্রগল্‌ভতা যে কোন স্ত্রীলোকের মধ্যে থাকিতে পারে, তাহা সে ভাবিতে পারিত না। সুতরাং সমস্ত রসিকতাই তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কারের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিতেছিল। কিন্তু তবুও তাহার মনে হইতে লাগিল, ইহার আগমনে তাহার নির্ব্বাসনের অর্দ্ধেক বেদনা যেন তিরোহিত হইয়া গেল; এবং এ কে, কোথা হইতে আসিল, তাহার সহিত কি সম্বন্ধ—সমস্ত জানিবার জন্য অচলা উৎসুক হইয়া উঠিল।

হরির মা কহিল, এ মেয়েটি কে দিদি? খুব আমুদে মানুষ।

অচলা ঘাড় নাড়িয়া শুধু বলিল, হাঁ।

ভিজে কাপড় ছাড়িয়া মৃণাল এ ঘরে আসিয়া কহিল, কেবল ঠাট্টা তামাসা ক'রেই গেলুম ঠান্‌দি, আমার আসল পরিচয়টা এখনো দেওয়া হয় নি। আর পরিচয় এমন কি-ই বা আছে? তোমার বর যিনি, তিনি হচ্চেন আমার মায়ের বাপ। আমি তাই ছেলে-বেলা থেকে সেজদা, মশাই ব'লে ডাকি,বলিয়া একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিল, আমার বাবা আর তোমার শ্বশুর—দুজনে ভারি বন্ধু ছিলেন। হঠাৎ একদিন গাড়ী চাপা প'ড়ে, ডান হাতটা ভেঙ্গে গিয়ে বাবার যখন চাকরী গেল, তখন তোমার শ্বশুর এই বাড়িতে তাঁদের আশ্রয় দিলেন। তার অনেক পরে আমার জন্ম হয়। সেজদা তখন আট বছরের ছেলে। তাঁর মা ত তাঁর জন্ম দিয়েই মারা যান; বড় দুছেলে আগে ডিপথিরিয়া রোগে মারা গিয়েছিল। তাই আমার মা আসা পর্য্যন্তই হলেন এ বাড়ির গিন্নী। তার পরে বাবা মারা গেলেন, আমরা এ বাড়িতেই রইলুম। তার অনেক পরে তোমার শ্বশুর মারা গেলেন, আমরা কিন্তু রয়েই গেলুম। এই সবে পাঁচ বছর হ'ল পলাশীর ঘোষাল বাড়িতে আমার বিয়ে দিয়ে সেজদা আমাকে দূর ক'রে দিয়েছেন! মা বেঁচে থাকলেও যা হোক্ একটু জোর থাকত।

বড়বৌ এই ঘরে নাকি? বলিয়া একটী বৃদ্ধ-গোছের বেঁটে-খাটো গৌরবর্ণ ভদ্রলোক দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মৃণাল কহিল, এসো, এসো। অচলার পানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, ঐটি আমার কর্ত্তা ঠান্‌দি। আচ্ছা, তুমিই বল ত ভাই, ওই বাহাত্তুরে বুড়োর সঙ্গে আমাকে মানায়? এ জন্মের রূপ-যৌবন কি সব মাটী হয়ে গেল না ভাই?

অচলা জবাব দিবে কি, লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

ভদ্রলোকটীর নাম ভবানী ঘোষাল। তিনি হাসিয়া কহিলেন, বিশ্বাস কর্‌বেন না ঠান্‌দি—সব মিছে কথা। ওর কেবল চেষ্টা—আমাকে খেলো ক'রে দেয়। নইলে, বয়স ত আমার এই সবে বায়ান্ন কি তি—

মৃণাল কহিল, চুপ করো, চুপ করো। এই সেজদাটি যে আমার কি শত্রু, তা ভগবানই জানেন। আমাকে সব দিকে মাটী করেছেন—আচ্ছা এই বুড়োর হাতে দেওয়ার চেয়ে, হাত-পা বেঁধে কি আমায় জলে ফেলে দেওয়া ভাল হ'ত না ঠান্‌দি ? সত্যি ব'লো ভাই।

অচলা তেম্‌নি আরক্তমুখে নীরব হইয়াই রহিল।

ঘোষাল ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া অচলার লজ্জানত মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সহসা একটা মস্ত আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাঁচালেন ঠান্‌দি, এ ছুঁড়ীর অহঙ্কার এতদিনে ভাঙল। রূপের দেমাকে এ চোখে কানে দেখতেই পেত না।

স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া করিয়া কহিলেন, কেমন, এই বার হ'ল ত ? বনদেশে এতদিন শিয়াল-রাজা ছিলে, সহরের রূপ কারে বলে, এইবার চেয়ে দেখো !

মৃণাল কহিল, তাই বৈ কি ! আমার যেখানে অহঙ্কার সেখানে ভাঙতে যায়—সাধ্যি কার ? বলিয়া স্বামীর প্রতি সে যে গোপন কটাক্ষ করিল, অচলার চোখে সহসা তাহা পড়িয়া গেল।

ঘোষাল হাসিয়া বলিলেন, শুন্‌লেন ত ঠান্‌দি—একটু সাবধানে থাকবেন, দুজনের যে ভাব, যে আসা-যাওয়া, বলা যায় না—আর আমি ত বায়াত্তুরে বুড়ো, মাঝে থাক্‌লেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি ! নিজেরটি সাম্‌লে চল্‌বেন—হিতৈষী বুড়োর এই অনুরোধ।

মৃণাল, তোরা কি সারারাত্রি এই নিয়েই থাকবি ?

কি কর্‌ব সেজদা ?

একবার রান্নাঘরের দিকেও যাবি নে ?

মৃণাল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, কি ভুল হয়েই গেছে সেজদা, উড়ে বামুনটাকে আমার আগে দেখে আসা উচিত ছিল। আচ্ছা, তোমরা বাইরে যাও, আমরা যাচ্চি।

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কে?

মৃণাল কহিল, আমি আর ঠান্‌দি। অচলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আমি যখন এসেচি, তখন এ সংসারের সমস্ত চার্জ্জ তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তবে যাবো সেজদি।

মহিম এবং ভবানী বাহিরে চলিয়া গেল। মৃণাল অচলাকে পুনরায় কহিল, আমার দুদিন আগে আসাই উচিত ছিল। কিন্তু শাশুড়ীর হাঁপানীর জ্বালায় কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে বেরুতে পারলুম না। আচ্ছা, তুমি কাপড় ছেড়ে প্রস্তুত হও সেজদি, আমি এখখুনি ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো। বলিয়া মৃণাল রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

তখন বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছিল এবং গাঢ় মেঘ কাটিয়া গিয়া নবমীর জ্যোৎস্নায় আকাশ অনেকটা স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছিল।

রান্নার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া মৃণাল অচলার কাছে আসিয়া বসিল। তাহার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কহিল, ঠান্‌দিদির চেয়ে সেজদি ডাকটা ভালো, কি বল সেজদি?

অচলা মৃদুস্বরে কহিল, হাঁ।

মৃণাল কহিল, সম্পর্কে তুমি বড় হ'লেও বয়সে আমি বড়। তাই ইচ্ছে হয়, আমাকেও তুমি মৃণালদিদি ব'লে ডাক, কেমন?

অচলা কহিল, আচ্ছা।

মৃণাল কহিল, আজ তোমাকে রান্নাঘর দেখিয়ে আনলুম; কিন্তু কাল একেবারে ভাঁড়ারের চাবি আঁচলে বেঁধে দেব কেমন?

অচলা কহিল, চাবিতে আমার কাজ নেই ভাই।

মৃণাল হাসিয়া কহিল, কাজ নেই? বাপ রে, ও কি কথা। ভাঁড়ারটা

কি তুচ্ছ জিনিস সেজদি যে, বল্‌চ—তার চাবীতে কাজ নেই? গিন্নীর রাজত্বের ওই ত হ'ল রাজধানী গো।

অচলা কহিল, হোক্ রাজধানী, তাতে আমার লোভ নেই। কিন্তু তোমার ওপর আমার ভারি লোভ। শিগ্‌গির ছেড়ে দিচ্চি নে মৃণালদিদি।

মৃণাল দুই বাহু বাড়াইয়া অচলাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, সতীনকে ঝাঁটা মেরে বিদায় না ক'রে, ঘরে ধ'রে রাখতে চাও—এ তোমার কি রকম বুদ্ধি সেজদি?

অচলা আস্তে আস্তে বলিল, তোমার এই ঠাট্টাগুলো আমার ভাল লাগলো না ভাই। আচ্ছা, এ দেশে সবাই কি এই রকম ক'রে তামাসা করে?

মৃণাল খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, না গো ঠান্‌দি, করে না। এ শুধু আমিই করি, সবাই এ জিনিস পাবে কোথায় যে করবে?

অচলা কহিল, পেলেও আমরা মুখে আন্‌তে পারি নে ভাই! আমাদের কলকাতার সমাজে অনেকে হয় ত ভাবতে পর্য্যন্ত পারে না যে, কোন ভদ্র মহিলা এ সব মুখে উচ্চারণ কর্‌তে পারে।

মৃণাল কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না। বরঞ্চ জোর করিয়া অচলাকে আর একবার জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তোমাদের সহরের ক'জন ভদ্র-মহিলা আমার মত এমন ক'রে জড়িয়ে ধর্‌তে পারে, বল ত সেজদি? সবাই বুঝি সব কাজ পারে? এই ত তোমাকে কতক্ষণই বা দেখেছি, এর মধ্যেই মনে হচ্ছে, আমার বোন ছিল না, একটি ছোট বোন পেলুম। আর এ শুধু কথার কথা নয়, সারাজীবন ধ'রে আমাকে এর প্রমাণ যোগাতে হবে—তা মনে রেখো। এখানে আর ঠাট্টা-তামাসা চলবে না।

অচলা শিক্ষিতা মেয়ে। এই পল্লীগ্রামের বিরুদ্ধসমাজের মধ্যে তাহার

ভবিষ্যৎ-জীবন যে কি ভাবে কাটিবে, তাহা বাটীতে পা দিয়াই সে বুঝিয়া লইয়াছিল। এ সুযোগ সে সহজে ছাড়িয়া দিল না। পরিহাসকে গাম্ভীর্য্যে পরিণত করিয়া কহিল, মৃণালদিদি, সত্যই কি এর প্রমাণ তুমি সারা জীবন ভোর যোগাতে থাক্‌বে?

মৃণাল বলিল, আমরা ত সহরের মহিলা নই ভাই—যোগাতে হবে বৈ কি! যে সত্যি তোমাকে ছুঁয়ে ক'রে ফেল্‌লুম, সে ত ম'রে গেলেও আর উল্টোতে পার্‌ব না!

অচলা এ কথার আর অধিক নাড়াচাড়া না করিয়া অন্য কথা পাড়িল; হাসিয়া কহিল, শিগ্‌গির পালাবে না, তাও অম্‌নি বল।

মৃণাল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, বোকা পেয়ে বুঝি ক্রমাগত ফাঁস জড়াতে চাও সেজদি? কিন্তু সে ত আগেই বলেচি ভাই, ভাল ক'রে চার্জ্জ বুঝিয়ে না দিয়ে পালাব না।

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, চার্জ্জ বুঝে নেবার আমার এক তিল আগ্রহ নেই।

মৃণাল বলিল, সেইটে আমি ক'রে দিয়ে তবে যাবো, কিন্তু বেশি দিন আমার ত বাড়ি ছেড়ে থাক্‌বার জো নেই ভাই। জান ত, কত বড় সংসারটি আমার মাথার ওপর।

অচলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, জানি নে।

মৃণাল আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সেজদা আমার কথা তোমাকে আগে বলেন নি?

অচলা কহিল, না, কোন দিন নয়। তাঁর বাড়ি-ঘর সম্বন্ধে সব কথাই আমাকে জানিয়েছিলেন; কিন্তু যা সকলের আগে জানানো উচিত ছিল, সেই তোমার কথাই কেন যে কখনো বলেন নি, আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে মৃণালদিদি!

মৃণাল অন্যমনস্কের মত বলিল, তা বটে।

অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সঙ্গে বুঝি ওঁর প্রথম বিয়ের কথা হয় ?

মৃণাল তখনও অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, কহিল, হাঁ।

অচলা কহিল, তবে হ'ল না কেন ? হ'লেই ত বেশ হ'ত।

এতক্ষণে কথাটা মৃণালের কানের ভিতর গিয়া ঘা দিল। সে অচলার মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া বলিল, সে হবার নয় ব'লে হ'ল না।

অচলা তথাপি প্রশ্ন করিল, হবার বাধা কি ছিল ? তুমি ত আর সত্যিই তাঁর কোন আত্মীয়া নও ? তা ছাড়া, ছেলে-বেলা যে ভালবাসা জন্মায়, তাকে উপেক্ষা করাও ত ভালো কাজ নয় ?

তাহার প্রশ্নের ধরণে মৃণাল হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্থির-দৃষ্টিতে অচলার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, এ সব কি তুমি খুঁজে বেড়াচ্চ সেজদি ? তুমি কি মনে কর, ছেলে-বেলার সব ভালবাসারই শেষ ফল এই ? না, মানুষে বিয়ে দেবার মালিক ? এ শুধু এ জন্মের নয় সেজদি, জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ। আমি যাঁর চিরকালের দাসী, তাঁর হাতে তিনি স'পে দিয়েছেন। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কি যায় আসে !

অচলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, সে ঠিক কথা মৃণালদিদি—আমি তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলুম—

কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না, সমস্ত মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। মৃণালের কাছে তাহা অগোচর রহিল না। সে অচলার হাতখানি সস্নেহে মুঠার মধ্যে লইয়া বলিল, সেজদি, তুমি শুধু সে দিন স্বামী পেয়েচ, কিন্তু আমি এই পাঁচ বচ্ছর ধ'রে তাঁর সেবা কর্‌চি ! আমার এই কথাটা শুনো ভাই, স্বামীর এই দিক্‌টা কোন' দিন নিজের বুদ্ধি জোরে আবিষ্কার কর্‌বার চেষ্টা ক'রো না। তাতে বরং ঠকাও [illegible] লাভ নেই।

মহু বাহির হইতে কহিল, দিদি, বাবুদের খাবার জায়গা হয়েছে।

আচ্ছা চল, আমি যাচ্ছি, বলিয়া মৃণাল হঠাৎ দুই হাত বাড়াইয়া অচলার মুখখানা কাছে টানিয়া আনিয়া একটা চুমা খাইয়া দ্রুতপদে উঠিয়া গেল।